রবীন্দ্র-বীক্ষা

সম্পাদনা
নীলরতন সেন

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা—বারো

প্রকাশিকা :

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে :

মৃণাল দত্ত

এশিয়া মুদ্রণী

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

প্রচ্ছদ :

বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

ব্লক :

ক্যালকাটা ফটোটাইপ স্টুডিও

মূল্য—বারো টাকা

বিষয় সূচী

সম্পাদকের নিবেদন :

পূর্বভাগ : দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্র রচনা সংকলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মেঘনাদবধ কাব্য : ৩-৬৬

প্রথম প্রবন্ধ : ৫

দ্বিতীয় প্রবন্ধ : ৫৫

অন্যান্য রচনাংশ : ৬২

ধর্ম বিতর্ক : ৬৭-১৩৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মজিজ্ঞাসা : ৬৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : হিন্দুধর্ম : ৯০

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : নূতন ধর্মমত : ৯৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একটি পুরাতন কথা : ১০২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় : ১১৪ ১২৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কৈফিয়ৎ :

উত্তরভাগ : রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট : ৩

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী : সংগীতে রবীন্দ্রনাথ : ৬

মোহিতলাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য : ১৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ : ৩৭

প্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক : ৫৬

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী : ৭৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রকৃতির প্রতিশোধ : ৮৫

অমিয় চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা : ৯০

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রবন্ধ : ৭৪
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা : ১১১
অন্নদাশংকর রায় : জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : ১৩১
অশোকবিজয় রাহা : রবীন্দ্রকাব্যে শিল্পের ত্রিধারা : ১৩৮
অজিতকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ও নাট্যশিল্প চেতনা : ১৫৬
নীলিমা ইব্রাহীম : রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ : ১৭১
বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা : ১৮৮
রথীন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' : ১৯৯
দেবীপদ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র জননী সারদা দেবী : ২১৪
ভবানী সেন : একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী : ২২০

সম্পাদকের নিবেদন

প্রায় বৎসরাধিককালের প্রচেষ্টায় 'রবীন্দ্র-বীক্ষা' এবারে পাঠকসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। গ্রন্থের রচনাগুলিকে, পূর্বভাগ এবং উত্তর-ভাগ দুটি অংশে পৃথকভাবে সাজানো হল। পূর্বভাগে রবীন্দ্রনাথের এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগৃহীত হয়েছে। উত্তরভাগে রবীন্দ্র সমকালীন ও পরবর্তী সমালোচকদের রচনাকে স্থান দেওয়া হল।

পূর্বভাগের দুটি অংশ: প্রথমাংশে অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'মেঘনাদবধকাব্য' বিষয়ক দুটি প্রাথমিক প্রবন্ধসহ রবীন্দ্রনাথের এ-সম্পর্কিত পরবর্তী সমস্ত মন্তব্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বৎসরটি যেমন রবীন্দ্র শত বার্ষিকী বৎসর তেমনি বাংলাকাব্যে ভাবমুক্তি ও ছন্দোমুক্তির পথিকৃৎ মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদবধকাব্যে'রও শতবার্ষিকী বৎসর।—এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠকবি ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠকবির অমর কাব্যখানিকে কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন কৌতূহলী পাঠকদের সমক্ষে সে তথ্যাদি পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কবিকৃতিকে—বিশেষ করে তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্য'কে কি দৃষ্টিতে দেখতেন বিদগ্ধ পাঠক সমাজেও সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে লক্ষ্য করেছি। এই রচনাসম্ভার সাজাতে বসে আমার মনেও একটি আক্ষেপ জেগেছে। বললে অত্যুক্তি হবে না সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনেরই উত্তরসূরী। ভাব, ভাষা, ও ছন্দের ক্ষেত্রে—কবিতার নব নব রূপাদর্শ (Pattern) সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন দিশারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথ যোগ্যতর ভাবে সে পথে পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হয়েছেন। ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের নবক্লাসিক যুগ থেকে রোমান্টিক যুগে উত্তরণের পদচিহ্ন মধুসূদনের ভাবাদর্শে, ভাষা ও ছন্দে ধরা পড়েছিল।—রোমান্টিক যুগ থেকে ভিক্টোরীয় যুগের পদাঙ্ক ধরে এলিয়টের আধুনিক চেতনার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথই আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছেন। সেজন্যেই

আক্ষেপ থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে সুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পূর্বসূরী বাংলা সাহিত্য সেবীদের প্রতি অকুণ্ঠ ঋণস্বীকৃতি জানিয়েছেন, সেখানে মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় পরিণত জীবনে এসে কেন আর উদ্যোগী হলেন না। 'অবিনয়' এবং 'ঔদ্ধত্য' নিয়েও নবযৌবনে 'মেঘনাদবধকাব্যে'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে মূল্যবান (অবশ্য তার অধিকাংশই বিরূপ ভাবাপন্ন) আলোচনা করেছেন,—পরিণত জীবনে পৌঁছেও প্রাসঙ্গিক টুকরো টুকরো মন্তব্যে মধুসূদনের ভাব ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে যে সকল গভীর ব্যঞ্জনাময় মতামত দিয়েছেন তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয়,—সম্ভবতঃ তাঁর হাত থেকেই মধুসূদন প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সমালোচনাটি প্রত্যাশিত ছিল। আমরা কবির পরিণত বয়সের 'মেঘনাদবধকাব্য' বিষয়ক মন্তব্যগুলিও গ্রথিত করে দিলাম।—তার থেকেই পাঠক উপলব্ধি করবেন মধুসূদনের প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতটা উচ্চাঙ্গের মনোভাব পোষণ করতেন। এ গ্রন্থের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্র মন্তব্যটি পাঠে বলতে ইচ্ছা হয়, এত গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মধুসূদন সাহিত্যমানসের মূল্যায়ন দ্বিতীয় কোনও সমালোচকের হাতে হয়নি।

পূর্বভাগের দ্বিতীয়াংশে বিগত শতাব্দীর বিস্মৃতপ্রায় একটি যুগের ঐতিহাসিক ধর্মবিতর্কের ধারাবাহিক আলোচনা অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদি থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেযুগে যে নতুন হিন্দুধর্মাদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন সেটি পাশ্চাত্য নীতিবোধ এবং প্রাচ্য ধর্মবোধের সমন্বয় বিশেষ। পাশ্চাত্য দার্শনিক কোম্‌তে এবং মিলের 'রিলিজিয়ন' এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ধর্মাদর্শের সংমিশ্রণে তিনি যে হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন 'ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)' গ্রন্থটিতে তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্যযুগে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মজিজ্ঞাসা' এবং 'হিন্দুধর্ম' নামক দুটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম তাঁর এই নবধর্মাদর্শের ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মসমাজ (আদি ও ভারতবর্ষীয়) সে যুগে যে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে চালিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে তার সঙ্গে সংস্রব রাখেননি তাই নয়, অনেকটা বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। আলোচ্য যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথের বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলিতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মজিজ্ঞাসা' এবং 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ দুটি ১২৯১

বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' নামক দুটি নতুন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ভারতী পত্রিকায় যে বছর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম ব্যাখ্যাত রক্ষণশীল এই ধর্মমতের সমালোচনা করলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে (১২৯১ ভাদ্র) ইতিপূর্বেই নূতন ধর্মমত নামে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের (এবং সম্ভবতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এবারে বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ 'রবির পিছনে একটি ছায়া'—অর্থাৎ আদি ব্রাহ্ম সমাজ গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' নামে (প্রচার : ১২৯১ অগ্রহায়ণ) ব্রাহ্মসমাজদর্শের সমালোচনায় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হলেন।—এই ধর্মবিতর্ক বেশীদিন চলেনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই উদারতার গুণে। উভয়ের পূর্ব-সম্প্রীতি অচিরেই পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।—এই ধর্মবিতর্কে ধর্মসম্পর্কে রবীন্দ্র মনোভাব অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে এটি লক্ষণীয়। উত্তর জীবনে যিনি নিজেকে 'ব্রাত্য—মন্ত্রহীন' বলে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বমানবের উদার কল্যাণ ব্রতকে যিনি ধর্ম বলে গণ্য করেছিলেন, এযুগেও তাঁর ধর্মবোধে উদার আধ্যাত্মিকতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'একটি পুরাতন কথায়' তিনি বলেছেন, 'ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায় ; কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না।' ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি বা আপাত প্রয়োজনের গণ্ডীমুক্ত উদার মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এমন উদার মতবাদের সঙ্গে বঙ্কিম আর বিরোধ করতে চাননি মনে হয়। অধুনালুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় সেই ধর্মবিতর্ক অধ্যায়টি পাঠকদের বিশেষ আকর্ষণ এবং ঔৎসুক্য জাগাতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'রবীন্দ্র-বীক্ষা' উত্তরভাগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্রসহ আরও সতেরজন প্রখ্যাত লেখকের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত সতেরটি মূল্যবান প্রবন্ধের রবীন্দ্রার্ঘ্য সাজিয়ে দেওয়া হল।

অবনীন্দ্রনাথের পত্রটি 'রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট' পরিসরে ছোট হলেও

সাধনা পত্রিকার আসরে রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি দেশী চিত্রপরিকল্পনার যে নতুন রীতির পরীক্ষা করেছিলেন সেই পুরোনো ইতিহাসের সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরকালে উভয়েই কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে ভারতীয় চিত্রকলার চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করে সেই পুরোনো ধারাটিই সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর মুখে সে ইতিহাস শুনবার সার্থকতা রয়েছে সকলেই স্বীকার করবেন আশা করি।

যে অল্প কয়েকজন রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞের নাম করা যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁদেরই শীর্ষস্থানীয়া। 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ' নামক রসগ্রাহী রচনাটিতে, ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় কবির কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে, তিনি কবির গানের তান, তাল, দেশী ও বিদেশী সুর প্রভৃতি সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছেন। কবির গীতিনাট্য এবং একক গান সম্পর্কেও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। ভালো গল্প বলিয়ে বলে শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা দেবীর খ্যাতি ছিল।—এই রচনাটিতে পাঠক তাঁর সেই গল্প বলার আমেজটুকু উপভোগ করতে পারবেন।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাসাহিত্য' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র কবিমানস এবং সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপর,—সাহিত্য-পাঠকদের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নির্ভীক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। সমালোচকদের বক্তব্যের সঙ্গে সকল পাঠক একমত হতে না পারলেও তাঁর বক্তব্যের সামগ্রিকতা এবং মৌলিক চিন্তাশীলতা পদে পদে উপলব্ধি করতে পারবেন।

এক নতুন বাংলা গদ্য-শৈলীর রূপকার হতে চেয়েছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে সেই গদ্যরচনারীতির যেমন পরিচয় মিলবে,—তেমনি আর একদিকে রবীন্দ্র মুক্তক এবং গদ্য-কবিতার ছন্দ আঙ্গিকে ছন্দোমুক্তির যে নবীন ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও মনস্বী সমালোচকের মতামত পাওয়া যাবে। দেশী ও বিদেশী কাব্য-আঙ্গিকের পটভূমিকায় স্থাপন করে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দোমুক্তি প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন। মধুসূদনের কাব্য-আঙ্গিকের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লেখক প্রচলিত ধারণার বাইরে কিছু নতুন কথাও বলেছেন। প্রবন্ধটি চিন্তাশীল পাঠককে নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত করবে আশা করা যায়।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন কেবলমাত্র প্রবীণ ছান্দসিক নন, স্বচ্ছ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরূপেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'কে তিনি যে কয়টি মূল্যবান প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক সমক্ষে পরিচিত করতে চেয়েছেন 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অশোক' তাদেরই অন্যতম। ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণের যে নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন এ' প্রবন্ধটিতে পাঠক তার পরিচয় লাভ করবেন।

বাংলা উপন্যাস-গল্পের ধারাবাহিক আলোচনার পথিকৃৎ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী' প্রবন্ধে কবির শেষ জীবনে লিখিত তিনটি বড় গল্পের ('রবিবার', 'শেষ কথা' এবং 'ল্যাবরেটরী') বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র ছোট গল্পের স্বর্ণযুগ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পরে রচিত নব আঙ্গিকের এই গল্প তিনটির সঙ্গে নতুন পরিচয়ের সুযোগ পাবেন এই প্রবন্ধে।

'রবীন্দ্র জীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক' আলোচনাতেও কিছু কম পারদর্শী নন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে লেখা উক্ত নামের বিশিষ্ট নাটকটির সমাজ চেতনা এবং আদর্শবাদ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ট পার্শ্বচর কবি অমিয় চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা'-প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্য-চেতনায় 'সর্বমানবের মিলন তত্ত্বটি' কেমন চমৎকার আত্মপ্রকাশ করেছে তার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য আদর্শবোধ থেকে রবীন্দ্র আদর্শ বোধের পার্থক্য সম্পর্কেও এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। এছাড়া, 'বিশ্বভারতী' যে আনন্দময় মুক্তির কথা ঘোষণা করেছে তারও উল্লেখ করেছেন।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনাটি 'রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রবন্ধ' বিষয়ক। অন্যান্য প্রবন্ধকারের তুলনায় প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায় ডঃ দাশগুপ্ত বিষদভাবে তা আলোচনা করেছেন। নতুন যুক্তি ও তথ্যের বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিকের ওপর নব আলোকপাত করেছে। লেখক তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যকে কতটা সহজ সরসভাবে পরিবেশন করতে জানেন এ রচনাটি তারও স্বাক্ষর বহন করছে।

'রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা' প্রবীণ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর একটি তথ্যনিষ্ঠ মূল্যবান প্রবন্ধ। 'তত্ত্বনাট্য' নামকরণটি স্বয়ং

প্রবন্ধকারের। প্রকৃতির প্রতিশোধ, শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা—এই এগারখানি নাটককে তত্ত্বনাট্যের শ্রেণীভুক্ত করে এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে লেখক তাদের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন।

উপন্যাস গল্প বা ছড়ার তুলনায় অন্নদাশংকর রায়ের প্রবন্ধের পরিমাণ কম। কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক প্রবন্ধেরই ধার ও দীপ্তিতে পাঠক চমৎকৃত না হয়ে পারেন না। কবি, গল্প লেখক, উপন্যাস লেখক, চিত্রশিল্পী, সংগীতকার, শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক—ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পরিচয়। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ কবি-পরিচয়ের মূল সূত্রটি অন্নদাশংকর আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনশিল্পী'। 'কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতি কাব্যের ঐক্য দিয়েছেন।'—'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখক এই তত্ত্বটিকেই অনবদ্য ভাষা ও বাচনভঙ্গিতে পরিস্ফুট করেছেন।

কবি-সমালোচক অশোকবিজয় রাহা 'রবীন্দ্রকাব্যে শিল্পের ত্রিধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-কাব্য আঙ্গিকের ওপর সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে শিল্পের ত্রিধারা বলতে তিনি সংগীত, চিত্র এবং স্থাপত্য-ধর্মের কথা বুঝিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তায় এবং আলোচনার অভিনবত্বে তাঁর প্রবন্ধটি পাঠকদের আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলেই আশা রাখছি।

নাট্যসমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ও নাট্যশিল্প চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার এই উল্লেখযোগ্য দিকটি সম্পর্কে এখনও তেমন আলোচনা হয়নি। অভিনয়-পরিচালক এবং মঞ্চ পরিকল্পনাকার রূপে আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।—তাঁর প্রতিভার এই অনালোচিত দিকটি সম্পর্কে ডঃ ঘোষ বিশদ আলোচনার সূত্রপাত করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম রবীন্দ্রনাথের একটি বহু বিতর্কিত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়ভাবোধ তাঁর আন্তর্জাতিকতা বোধের বিপুল উত্তাপে বাষ্পায়িত

হয়ে গিয়েছিল, তিনি স্বাদেশিক আন্দোলনে পলাতকের ভূমিকা নিয়েছিলেন —এমন নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। লেখিকা তথ্য-নির্ভর যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে কবির উদার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয়তা-বোধের বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ' প্রবন্ধটিতে।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে এক তরুণ কবি সমালোচক ছিলেন আজকের প্রবীণ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। সেদিনকার নবীন চোখে রবীন্দ্র কবিতার প্রেম রোমান্স কি অনুভূতি জাগিয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা' প্রবন্ধে পাঠক তারই পরিচয় পাবেন। চিন্তার সুস্পষ্টতা এবং ভাষার কবিধর্ম এ প্রবন্ধটির বিশেষ আকর্ষণ বলা যেতে পারে।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচক গোষ্ঠীর মধ্যে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ইতি-মধ্যেই স্থায়ী আসন গ্রহণ করে নিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী' প্রবন্ধে তিনি কবির শেষ জীবনে লিখিত একটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী নাটকের মূল্যায়ণ করেছেন।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্র জননী সারদাদেবী' প্রবন্ধটিতে পূর্বে অনালোচিত নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষক এবং রবীন্দ্র-জীবনী লেখকদের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে আশা করি।

গ্রন্থের সব শেষের প্রবন্ধটি লিখেছেন মার্কস্‌বাদী সুপণ্ডিত ভবানী সেন। একদা 'রবীন্দ্রগুপ্ত' ছদ্মনামে রবীন্দ্রমানসের মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি পাঠকসমাজকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চিন্তার প্রবীণতায় দুটি দশক পেরিয়ে এসে আজ তিনি আরও নতুন ভাবে রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়ণ করেছেন। 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' রবীন্দ্রপ্রতিভার মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন রূপে স্বীকৃত হবে বলেই আশারাখি।

পাঠকেরা মূলগ্রন্থের প্রাথমিক পরিচয় ভূমিকার মাধ্যমেই জানতে চান। আমরা এখানে প্রতিটি রচনার এবং লেখকের মূলবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইংগিত মাত্র করছি। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবছর বহু স্মারকগ্রন্থ এবং পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির সমুচিত মূল্যমান স্বীকার করেও বলতে চাই রবীন্দ্র-বীক্ষার পরিবেশনায় আমরা নতুন ব্যঞ্জনের স্বাদ আনতে সযত্ন চেষ্টা করেছি। পূর্বভাগে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর ছাত্র, গবেষক, চিন্তাশীল এবং কৌতূহলী পাঠকদের তৃপ্ত করতে পারবে বলেই আশা

রাখছি। উত্তরভাগের প্রবন্ধগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পূর্বে অনালোচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবি মানসের বিভিন্ন দিকভঙ্গির প্রতি আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি। প্রত্যেক লেখকই এ বিষয়ে যে অকুণ্ঠ সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা এই সুযোগে স্মরণ করছি।

গ্রন্থপরিকল্পনা এবং সম্পাদনায় সবাপেক্ষা সাহায্য পেয়েছি আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের কাছ থেকে। পূর্বভাগের পরিকল্পনায় বিশেষ করে 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিষয়ক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রবীন্দ্র রচনাংশগুলির সন্ধান দিয়ে এবং প্রতি পদক্ষেপে সস্নেহ উপদেশ দিয়ে এ গ্রন্থ তিনি সম্ভব করে তুলেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও স্মরণ না করে পারছি না। 'বঙ্কিম-দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র' ধর্মবিতর্কের বিস্মৃত প্রায় অধ্যায়টি শতবার্ষিকী বৎসরে পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করবার প্রথম পরামর্শ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবক বন্ধুবর শ্রীসনৎগুপ্ত দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি রচনা উদ্ধার করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য যাঁদের সহযোগিতায় এ গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ করে তোলা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অরুণ মজুমদার, অধ্যাপক সন্তোষ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক প্রদীপ দাশগুপ্ত, শ্রীচিত্ত নন্দী, শ্রীমতী প্রীতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহ, শ্রীমতী দিপালী সেন, শ্রীনভেন্দু সেন, শ্রীমতী মীরা সেন, শ্রীমতী গীতা দত্ত ও সাধনা সেনের এখানে নামোল্লেখ করছি। কম বেশী অন্যান্য যাঁরা সাহায্য করেছেন নামোল্লেখ না করেও তাঁদের সকলের কথাই সশ্রদ্ধভাবে এখানে স্মরণ করছি।

এ গ্রন্থে পূর্বে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতি ছাপা হল। প্রথমটি শ্রীসনৎ গুপ্তের চিত্র সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৩৪০ সালে সিউড়ি (বীরভূম) বড়বাগান মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে গৃহীত প্রতিকৃতি।—এটি অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষের সাহায্যে সংগৃহীত হয়েছে।

সবশেষে তরুণ প্রকাশক, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির বর্তমান কর্ণধার শ্রীমৃণাল দত্তের নামোল্লেখ করি। নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, কিছুটা বিলম্বে হলেও, 'রবীন্দ্র-বীক্ষা' পাঠকদের হাতে যে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হলো—সে তাঁরই একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টায়। গ্রন্থটির সম্পাদন ও মুদ্রণে যথাসম্ভব যত্ন নেওয়া হয়েছে। তবু দুএকটি ক্ষুদ্র ত্রুটি হয়তো থেকে গেল। বাঙালী পাঠকসমাজ, রবীন্দ্র-গবেষক এবং রবীন্দ্র জিজ্ঞাসু ছাত্রসম্প্রদায় এ

গ্রন্থদ্বারা কিছুটা উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৮

বিদ্যাসাগর কলেজ

সিউড়ি

—নীলরতন সেন

পূর্বভাগ : দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন

মেঘনাদবধ কাব্য

ধর্ম-বিষয়ক বিতর্ক

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল, প্রথম ঘটনাটি হল, জানুয়ারীতে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের (১ম খণ্ড) প্রকাশ, দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, মে মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সুতরাং বর্তমান বৎসরটি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়,—মেঘনাদবধ কাব্যেরও শতবার্ষিকী বৎসর। উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ঘটনা হল, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ;—বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন,—বাঙালী পাঠকসমাজে দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সেই ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিছুটা দিয়েছেন। ভারতী পত্রিকার প্রকাশ কালে (প্রথম সংখ্যা: শ্রাবণ ১২৮৪) মেঘনাদবধ কাব্য নামে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। ইহাতে লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।—সেটি শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং ফাল্গুন—ভারতীর এই ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদক, মনীষী ও কবির প্রশংসাধন্য মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্য আসরে সর্বাপেক্ষা সমাদর পেয়েছে। ষোল বৎসরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করে নিজেকে অমর করে তুলবার সুলভ পন্থা' গ্রহণ করেছিলেন। আরও পাঁচ বছর পর (ভারতী: ১২৮৯ ভাদ্র) মেঘনাদবধ কাব্য নামে দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরিসরে ছোট হলেও,—এ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখ করে এ কাব্যকে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। এই দুটি প্রবন্ধ মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনোভাব বিষয়ে সাধারণ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে মেঘনাদবধ কাব্যকে কবি যে কারণে বিরূপভাবে গ্রহণ করেছিলেন জীবনস্মৃতিতে তার সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ মূলক স্বীকৃতি রয়েছে। সেখানে কবি মন্তব্য করেছেন, 'যে জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয়, সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার

জন্ত কাব্য পড়াইলে 'কাব্যের মর্যাদাহানি হওয়াই স্বাভাবিক।' বাল্যকালে নর্মাল স্কুলে ছাত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ ভাষা শিক্ষার অজুহাতে মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ;—বোধ হয় সেই বিরূপতা পরিণত বয়সে না পৌঁছান পর্যন্ত আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেখানেই মধুসূদন বা তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যকে স্মরণ করেছেন, বিশেষ সশ্রদ্ধভাবেই উল্লেখ করেছেন। পূর্বজীবনের ত্রুটির কথাও একাধিক প্রসঙ্গে অকপটে স্বীকার করেছেন। তবু একটি অভাববোধের কথা স্বভাবতই পাঠকদের মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের ত্রুটি স্খালন করে পরিণত জীবনে এসে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ মধুসূদন সম্পর্কে, বা মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে কেন লিখলেন না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি যেমন বহু নতুনদিকে আলোকপাত করেছেন, মধুসূদন সম্পর্কে তেমন পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধের অভাব তিনি রেখে গেলেন কেন। নর্মাল স্কুলের পাঠ্যসূচীতে মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্ভুক্তি আমাদের পাঠকসমাজকে যে কতটা বঞ্চিত করেছে আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তবু রবীন্দ্রনাথের এবং মেঘনাদবধ কাব্যের এই শতবার্ষিকী বৎসরে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল, দুই যুগের দুই যুগান্তকারী সাহিত্যিকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পাঠকদের ভ্রান্ত ধারণার যথাসম্ভব নিরসন করা। এই অংশে, সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখে, রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কিত সমস্ত প্রধান প্রধান আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংকলিত করে দিলাম। পাঠকেরাই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর, প্রথম যৌবন এবং পরিণত বয়সের মেঘনাদবধ কাব্য বিষয়ক আলোচনা ও মন্তব্যাদি থেকে তাঁর ক্রম-পরিণত মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিত্র এখানে পাবেন আশা করি।

॥ ১ ॥

মেঘনাদবধ কাব্য

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত]

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে কোন গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই তাহা ন্যায্য হউক আর অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইঁহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক এক জন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরুস্বভাব পাঠক আছেন যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোন দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, "আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরেজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজী গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছন্দের মিলন সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন

শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে, তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে, এত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভাল লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন; সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্প-রসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরের প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না। তাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবশুদ্ধ চিত্র দেখলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও এইরূপ বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী, ইহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কি একটা ভীষণ চিত্রই পাইব, গগন-স্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই নাই। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ কর, সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডব শিবির দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন, পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোট বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজি সমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে

অনুরূপ কি করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজি-সঙ্কুল সভায় কি গাম্ভীর্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন "রাবণের সভা তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর"[১] বাঙ্গলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে, কিন্তু কোন কোন পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি,

ইহা কি রাবণের সভা? ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা! কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? না হয় সুন্দরই হইল, ইহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এক কথায় বলিয়া রাখি যে কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলী, বাঁশরী স্বরলহরী, গোকুল বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভ ভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভাল, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কি ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কি অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা-অপেক্ষা আর শোক কি

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দরাকাণ্ড।

আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক, রাবণের রোদন কি প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন কাঁদিতেছেন কিরূপে।

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে" ইত্যাদি।

রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশান-ভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে;

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে? ইত্যাদি—

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া "সচিব শ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ" সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন

"এ ভব মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।"

রাবণ কহিলেন "কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ অবোধ" ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, ইহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল— "কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্বদুঃখ" এ কথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি

সভাসুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

"অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর,"

একে ত অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার "মন্দোদরী মনোহর"। আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড় বড় কবিরা এক একটি বিশেষণে তাহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের "মন্দোদরী মনোহর" বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোন বর্ণনা করিবেন. তখন "মন্দোদরী মনোহর" রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেন না, ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণি কখনও উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক তারে।

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে।

"তবু বৎস যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী
তুমি হে জগৎ পিতা, একি রীতি তব?

মেঘনাদবধ কাব্য

হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

সুরুচি পাঠকেরা কখনই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর"

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটা মহান, গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোন কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না, সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক, কবি কহিলেন

"বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে"

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এ স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১]

"বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জল-জন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতল স্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়; সাগর বক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

সমুদ্রে মুক্তা স্তবক; আকাশে সমুদ্র এবং সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিশয় ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

> "শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
> মহামতি, পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
> বসিলা চৌদিকে আহা নীরব বিষাদে"

হেনকালে রোদনের "মৃদু নিনাদ" ও কিঙ্কিনীর "ঘোর রোল" তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

> "শূর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
> বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
> নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রু বারিধারা
> অসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।"

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্র নীরসিক্তা কিঙ্করী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্রমিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া "ঘোর কোলাহলে" কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না ত আর সহ্য হয় না, পাত্র মিত্র সভাসদ আদিকে একটা খেলনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিঙ্করী চামর ছুড়িয়া ফেলিল। একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল, এক ত ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভাল লাগিল, রাবণ কহিলেন।

> "বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
> ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
> মজাইছে লঙ্কা মোর।"

এই উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্য দর্পণকার জীবিত

থাকিতেন তবে দোষ পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরু ধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভর্ৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে "ত্যাজি সুকনকাসন উঠিল গর্জিয়া" সুকনকাসন, সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভাল শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণ সজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্ধৃত করিতাম।

যাহা হউক প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় ত কি বুঝিব ? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভুল হইবে না ? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন ! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই ও তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে "এ ভবমণ্ডল মায়াময়" আর তিনি উত্তর দিবেন "তাহা জানি তবু জেনেশুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ !" যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুল সাধ এ শয়নে সদা" তখন মনে করিলাম বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্র সংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

"নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভায়
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমনি সভায়
ভ্রুকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য পদভরে।"

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন তখন রাবণ কহিলেন "একাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার" কিন্তু বৃত্র-পুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ;
পূর্ণ করো যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জলিয়া, দানব তিলক!
তবে সে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ;
কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্বত শৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত॥

ইহার মধ্যে ভব, ভাবনা কিছু নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি "প্রভঞ্জন", "কলম্ব কুল", প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথার সজ্জিত ছত্র সমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারাক্রান্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাব-প্রধান বীরোচিত

বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ণণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কিনা তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গদেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোন কোন পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাঁহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? একজন চিত্রকর একটি কালীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন, পুরাণে কালীর কিরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশান ভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদ-মস্তক স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিনী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোন দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কি দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল ঘটনা ও নামাবলী মুখস্ত করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

'অনন্তর হনুমান কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃ সমাধান পূর্বক শোক সম্বরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন'।[১] মনঃসমাধান পূর্বক শোক সম্বরণ করার মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজী-পুঁথি সর্বস্ব পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজী কবি মিল্টন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। ৪৩ অধ্যায় সুন্দর কাণ্ড

"Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,

Tears, such as angels weep, burst forth :—"

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[২]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[৩]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[৪]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষ বধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[৫]

এই সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

"কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে, হায় দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে"

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গ সম, এই উদাহরণটি ত বেশ হইল, কিন্তু আবার "কিম্বা তরু" দিয়া কমাইবার কি প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ড ভাব বুঝাইতে না পারিয়া "কিম্বা তরু" দিয়া আরো উচ্চ করিয়াছেন।

২। যুদ্ধকাণ্ড ২৯ অধ্যায়
৩। " ৩১ "
৪। " ৫৭ "
৫। " ৭৭ "

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে"

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটা গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণ সমীপে প্রেরণ করিলেন।

"চলিলা আকাশ পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশি পতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষপুরে ; পদচাপে থরথর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।"

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই "সন্দেশবহ" ইন্দ্রজিতের নিধন-বার্তা নিবেদন করিল,—অমনি রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ; রুদ্রতেজে বীরভদ্র বলী রাবণের মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন।

"প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বনমাঝে প্রভঞ্জন বলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।"

'বায়ুবলছিন্ন কিংশুক ফুলটির মত মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহাতে সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ঐরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্মস্পর্শী হইয়াছে। পরে দূত উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এইবার রাবণ গর্জিয়া উঠিলেন।

"এ কনকপুরে,
ধনুর্দ্ধর আছে যত সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!"

পাঠকেরা বলিবেন এইবার ত হইয়াছে; এইবার ত রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন, কিন্তু পাঠক হয়ত দেখেন নাই "তেজস্বী আজি মহা রুদ্রতেজে" রাবণ স্বভাবতঃ এত তেজস্বী নন, তিনি মহা রুদ্রতেজ পাইয়াছেন সেইজন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে, রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধন বার্ত্তা শুনিলে বাঁচিবেন কিরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাব-গুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রী-প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রি সদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু "কোমল সে ফুলসম" করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

"এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান্ রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাহার অনুচরগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল। *

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির

* People here grumble and say that heart of the poet in 'মেঘনাদ' is with the Rakshasas! And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of 'রাবণ' elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.

কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভ-ভাগে "মধুকরী কল্পনা দেবীর" যে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি হইল? এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম। আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বাভাবিক ইহা বুঝাইতে বড় একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না, কিন্তু এখন দেখিলাম বড় গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন "রাবণ পুত্রশোকে কাঁদিয়াছে তবেই ত তাহার বড় অপরাধ!" পুত্রশোকে বীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা আপনাকেই তাহার আদর্শ স্বরূপ করিয়াছেন। ইহাদের একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যুঝা-যুঝি করা আমাদের কর্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্ আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্মুখ ভাগেইত তিনি আহত হইয়াছিলেন?"

রস: "হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।"

সিউয়ার্ড: "তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।"

ম্যালকম।—"তাঁহার জন্য আরো অধিক শোক করা উচিত।"

সিউয়ার্ড।—"না তাহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মত মরিয়াছেন, ভালই, তিনি তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহার ভাল করুন।"—ম্যাকবেথ।

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এইস্থলে তিনি বলিতেন যে,

"হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড, বীর চূড়ামণি
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!"

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে ত ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই।

স্পার্টার বীর মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

"এ কাল সমরে,
নাহ চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!"

তাঁহারা বলিতেন "হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!"

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয় লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি ত তখন ক্রন্দমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

"ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,"

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা চিত্রিত রাবণকে ত স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন, "অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?" আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে, সকল বিষয়েরই ত একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই ত আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্রশোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, আর একজনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক, যদি ম্যাকবেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত। যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি ত বলিতেছি না যে বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ কষ্ট পায় বীর তেমনিই পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মত, বীরের মত, তাহা সহ্য করিতে পারেন, শরীরের বল লইয়া ত বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন "ঐ প্রকার মত পূর্বকার স্টোয়িক্‌দিগেরই সাজিত, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে ওকথা শোভা পায় না। স্টোয়িক্‌ দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থির ভাবে দহন-জ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।" শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে কি করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীর পুরুষের উপযুক্ত। তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা ত এইরূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! স্টোয়িক্‌দের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তাহা অস্বীকার কে করিবে?

যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয়। সেইরূপ এক একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেই প্রকার বিরোধী গুণ। যাক—এ সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচন করা যাউক। *

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মীদেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মত হয় নাই, তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্র চিত্রের দোষ এই যে, তাহার চরিত্র কিরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদবধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি

* আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ু-বল-ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া "কিংশুক" শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম্র বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয়ে সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক ঃ

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মী কহিলেন,

—"হায়লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!"

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বারবার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন "ইন্দ্রজিৎ কোথায়?" লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসল বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন

"... বহু কালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্মদোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হোতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।"

আর এক স্থলে—

"না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে।"

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখ, রাবণকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভাল করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে, লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমখারামী করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনই তাহাকে পূজা করিতেন না।

"বহু কালাবধি

বহুবিধ রত্ন দানে বহু যত্ন করি"

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

"মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।"

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন; ইহা আমাদের কানে ভাল শুনায় না। ঐ ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদুহাস্য-বিষ মাখা একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই; তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ঐরূপ আর এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন;

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হোতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।"

এখানে "বিজ্ঞ জটাধর" কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সম্বরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,

"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার?"

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায়

ভক্তগৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কিরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনও যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই, ইন্দ্রাদির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কি হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপল রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কি বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণে লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধহয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পর বিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শত্রুতা সাধন করাতে কপটতা এবং কখন ভক্ত বৎসলতা দেখান ও কখন তাহার বিপরীতাচরণ করাতে পরস্পর বিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্বোক্তরূপ হীন চরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও বা পুরাণে ঐরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

> "ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
> মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
> দূরে, পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
> যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
> আভাময়! "ধিক মোরে" কহিলা গম্ভীরে
> কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে

স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল-মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখন •

"উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রামে ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব অগ্নি।"

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভাল লাগিল।

"সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,......

* * *

মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

পূর্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেইরূপ রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মেঘ, বিদ্যুত ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভাল লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই ত বর্ণনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কি বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদ বধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময় ; কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !

সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত-ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপু!"

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে; কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না "শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে"!' মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখি পুচ্ছ, পীত ধড়া, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

"শরশিন্দু পুত্র, বধূ শাবদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনি নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।"

এই সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম ভূমি পথে বাধাপ্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

"গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী তুরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি।
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর'
পট্টিশ, নারাচ কৌন্ত,—শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।"

পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্য-জনক হইয়া পড়ে কিনা?

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছিলেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে

এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি !
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?"

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্যকৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই "রঙ্গরসের" কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্য চাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব কবি রচিত সহজ হৃদয়-ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখ, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

"রাধার চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে ?
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, শুনহে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রেয়সী।
ঘোরতর নিশি যথা বাজে বাঁশী
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?
শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,

আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে ?" —হরু ঠাকুর।

ইহার মধ্যে বাঁক চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে, কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়াজড়িতে প্রমীলা হয়ত ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতাময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার ত একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন,

"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ?" ইত্যাদি।

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের কটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকটে আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন

"রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে" ইত্যাদি
প্রমীলা কহিলেন
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ;" ইত্যাদি—

যেন স্ত্রীপুরুষে ছড়া কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষ ভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

"কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে,
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।

জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর-স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য-কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখি-কুল। মিল-প্রিয়ে! কমল-লোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর। সূর্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি কেমনে ফুটছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম।" ইত্যাদি

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাকচাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি কথা আসিয়াছে

যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর চলিলা কুক্ষণে
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান ; হায়রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া-রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—

* * *

বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী ॥ ইত্যাদি।

বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায়

প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন; মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর কাঁদিয়াছিলেন, রতি-রূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন তবে ত রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন,—

"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্‌রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাঝা তোররে কে বলে,
রাক্ষস-কুল হর্যক্ষে হেরে যার আঁখি।
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্‌ রাবণে তুই, এ বীর কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে," ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন "বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশভাব তাহাতে কই?" সত্য ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়; ভাবময় নহে, কিন্তু "জানি আমি কেন তুই" ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষণের চরিত্র-সমালোচনা স্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষ-রূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতি-বিরহে রোদন করিতেছেন।

"উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদুকল স্বরে।
বাসন্তি নামেতে সখী বসন্ত সৌরভা

তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা,
"ওই দেখ আইল লো, তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃকুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?" ইত্যাদি—

পূর্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কি হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না। কবির অনুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতিতরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চির-পরিচিত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ-উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না ত, কাল ভুজঙ্গিনী স্বরূপ তিমির যামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণ ও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

"চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
বাসন্তী কহিল—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?"
"রুষিলা দানব বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ।
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আমি নিজ ভুজ বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধ যাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধ-সজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু "বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল" ভাবচ্ছটা কই? সকলগুলিতেই "মন্দুরায় হ্রেসে অশ্ব" "নাদে গজ বারী মাঝে" "কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা" ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি……
হেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!"

শেষ দুই পংক্তিটি আমার বড় ভাল লাগিল না; এক ত কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন একথা কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়তঃ কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়তঃ "নাদেন" শব্দটি আমাদের কানে ভাল লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

"—লঙ্কাপুরে শুনলো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে:—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব কুল সম্ভবা আমরা; দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে;
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।

মেঘনাদবধ কাব্য

দেখিব যে রূপ দেখি স্মুর্পনখা পিসী

মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে ;" ইত্যাদি।

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু স্মুর্পনখা পিসীর মদন মদের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ারকি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন

"কি কহিলি বাসন্তি ? পর্বত গৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে

কা'র হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

যখন কবি বলিয়াছেন—"রোষে লাজ ভয় ত্যজি সাজে, তেজস্বিনী প্রমীলা।"

তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোন মতে ভাল লাগে না!

"একবারে শত শঙ্খ ধরি

ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু

স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল

মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে

সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে

কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;

পর্বত গহ্বরে সিংহ ; বনহস্তী বনে ;

ডুবিল অতল জলে জলচর যত।......

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি "নৃমুণ্ড মালিনী সখী" (উগ্রচণ্ডা ধনী) রোষে হুঙ্কারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল—

"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে

লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে ;

প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।

দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি

রাবণের প্রণয়িণী, দেখিনু তা সবে।•
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষ কুল বধূ
(শশি কলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ঙ্করী ভীমা প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালা দল শশি-কলা সমরূপে, অশোকবনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না, কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ঙ্করী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশীকলা সম রূপবতী রক্ষঃ কুলবালা এবং রঘুকুল কমলকে ত্যাগ করিলেই ভাল হইত। কিম্বা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিৎ ছিল।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

"চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে;
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে চলে নিতম্বিনী
জরজরি সবজনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।"

আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

"নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিনী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি;
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে।"

নৃমুণ্ড মালিনী-আকৃতি উগ্রচণ্ডা ধনীও বিমল-কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল-কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল।

"হেনকালে হনুসহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলী পুটে,
(ছত্রিশ রাগিনী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা—

উগ্রচণ্ডাধ্বনি কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিনী বাজে, মন্দ নহে!

"উত্তরিলা ভীমারূপী ; বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,......
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ
যুঝিবে সে একাকিনী. ধনুর্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।"

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভাল লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর একটি কথা আসিতেছে, মহাকাব্যে যে সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ নহে ; এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র স্বর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কি? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মত সে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কি? সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কি একটা কাণ্ডকারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল,

"কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,
পর্বত গহ্বরে সিংহ বণ হস্তী বনে ;

নৃমুণ্ড মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রঙ্গে জড় হইয়া গেল; দোর্দণ্ড-টঙ্কার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কি? না প্রমীলা প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন। একটা সমস্ত সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় কিনা, যে, ইন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎ বধ নামক ঘটনার সহিত উপরি উক্ত উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

> কহিলেন স্বরীশ্বর, "এ ঘোর বিপদে
> বিশ্বনাথ বিনা; মাতঃ কে আর রাখিবে
> রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
> পন্নগ অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
> ততোধিক ডরি তারে আমি।"

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি।

> "পন্নগ অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
> ততোধিক ডরি তারে আমি,"

একথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না।

ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা অন্যায় হইয়াছে; প্রতি নায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চতা প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায়? পৃথিবীর বীরের। সহস্রবার অকৃত-কার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলেনা? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ বলিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড় সুকবি-সঙ্গত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড় অসন্তুষ্ট

হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে—

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠ পুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা, দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে!"

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

"সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তিশ্বরী।"

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত না হইয়া যদি অস্ফুট-অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভাল হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই।

"কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌনভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন সিংহাসনে,—
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।"

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভাল হইত, যদি বা রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভাল হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন;

"পাইয়াছে অস্ত্র কান্ত" কহিলা পৌলোমী
অনন্ত যৌবনা "যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি ; তব ভাগ্যবলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ হবে
মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধর বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তব এ ভাবনা নাথ কহ কি কারণে ?"

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব অস্ত্র পাইয়াছেন সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না,—

"সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণী ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কার দেবী আঁটে মৃগরাজে ;
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থর থরি হিয়া কাঁপে, দেবী, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ।"

পাঠক দেখিলেন ত, ইন্দ্র কোন মতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না :

"বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতীপ্রাণ কাঁদেরে সতত)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।"

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারির উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।

উর্বশী, মেনকা, রম্ভা চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষন্ন ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

"সরসে যেমতি
সুধাকর কর রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।"

বিষণ্ণ সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল সেখানেই কিম্বা আনেন, সেখানেই আমাদের বড় ভয় হয়,

"কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।"

পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদয়গুলিই উল্লাস-সূচক। এমন সময় মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

"যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণি-কৌশলে।"

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয়ত বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিত হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহলাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

"দেহ পদধূলি,
জননী; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।"

বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন, যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড় সাহসী করে নাই, এক একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান, তবে মাইকেলের কি অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোন কার্যেরই নহে। মেঘনাদবধে যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথভাবে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কতস্থানে তিনি অকারণে তিনি পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের

স্বতন্ত্র করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,—

"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চল ত্বরা করি।"

"বাছা" কহিলেন-

"কেমনে মন্দির হোতে, নগেন্দ্র নন্দিনী
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।
সুরা সুর বৃন্দ যবে মথি জল নাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি সুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগ দল নম্র শিরঃ লাজে
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে!

স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর !"

"রাজার" সহিত "মাতার" কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন ? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন ? মহাদেবের নিকট পার্বতী গমন করিলেন,

"মোহিত মোহিনীরূপে ; কহিলা হরষে
পশুপতি, "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননী ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর শঙ্করী ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা ; "এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহুদিন আজ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতি পরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি পাশে ?"

পতি পরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতি সমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোন ধর্মশাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্ম নিবেদন করা পার্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাব যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ নীচভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্তিকের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন।

"যালো তুই সৌদামিনী গতি
নিবার, কুমারে, সই। বিদারিছে হিয়া
আমার লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
রাজার কোমল দেহে।" ইত্যাদি—

অসুর মর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে "বাছার কোমল দেহে রক্তধারা" দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড় সুকল্পনা নহে ; পৃথিবীতেও এমন নারী আছেন, যাঁহারা

পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের বুঝাইবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

বাল্মীকি রামের চরিত্র বর্ণনা কালে বলিয়াছেন"যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।"* "ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।" যখন কৈকেয়ী রামকে বনে গমন করিতে আদেশ করিলেন, তখন "মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যাথত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।" "চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্য নাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেজন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাহার চিত্ত বিকার কাহারই অনুমাত্র লক্ষিত হইল না।" "ঐ সময়ে দেবী কৌষল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক মহোৎসব প্রসঙ্গে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেই রূপ তিনিও চির পরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।" সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তাহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরিউক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব। অথবা যদি মাইকেল রাম চরিত্র চিত্রে আদি কবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

"—শুন সুকেশিনী
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে

* উদ্ধৃতি গুলি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত রামায়ণ হইতে।

বৈরীভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?" ইত্যাদি—

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্যাদা বুঝেন ; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন ত জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর !* যুদ্ধ সাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে খাটয়ে সখে হেন বাঘিনীরে।"

এ রাম যে কি বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা !

প্রমীলা ত লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়।

তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

"এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুলমণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে ?"

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন ; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে।······
······এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে !"

* লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

"মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

হায়রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু বেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,

প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।" ইত্যাদি—

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন।

"উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে ;

'স্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোত্তম

আকুল পরাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব

এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?" ইত্যাদি—

কিছুতেই কিছু হইল না; রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল।

"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,

সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেব কুল প্রিয়

তুমি ?"

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটি ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন, ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতর-ভাবে কহিলেন,—

"সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে

রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে ;

রথীবর !"

বিভীষণ কহিলেন, কোন ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষস সৈন্য কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

পুত্র শোকে আজি

বিকল রাক্ষস পতি সাজিছে সত্বরে ;......

রাখগো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।

স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য দোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে।
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি
রঘু বন্ধু ; রঘু বধ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে ! স্নেহ পাশে কিনিয়াছ রামে
তোমরা, বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে।
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি !"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরু স্বভাব রাম বনের বানরগুলোকে লইয়া এতকাল লঙ্কায় তিষ্টিয়া আছে কি করিয়া তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন ; সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড্ হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু পেট্রক্লাসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কিরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাহার দেবী মাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.
Patroclus—Ah !—Say, goddess, can I boast
A pleasure now ? revenge itself is lost ;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is Slain !
'Tis not in fate the alternate now to give ;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart ;
On this condition will I breathe : till then,
I blush to walk among the race of men.
A flood of tears at this the goddess shed :

"Ah then, I see thee dying ; see thee dead !
When Hector falls, thou diest,"—"Let Hector die,
And let me fall ! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain !
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away ;
Since, unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achellis' hand ;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
Others in council famed for nobler skill,
More useful to preserve, than I to kill)
Let me—But oh ! Ye gracious powers above !
Wrath and revenge from men and gods remove
Far, far too dear to every mortal breast
Sweet to the soul, honey to the taste :
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
(Agamemnon urged to deeply hate ;
'Tis past—I quell it ; I resign to fate.
Yes—I will meet the murderer of my friend ;
Or (if the gods ordain it) meet my end.
The stroke of fate the bravest cannot shun :
The great Alcides, Jove's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath,
And sunk the victim of all-conquering death.
So shall Achilles fall ! stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread !

Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hair ?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes ?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me—Hence ! my arms, my arms !—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know' Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যমপুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

"—কি হেতু হেথা সশরীরে আজি ,
রঘুকুল চূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা ; জিতেন্দ্রিয় সবে "

পরে দশরথের নিকটে গেলেন ,

"হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)"

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন ত ভাল হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমনকি ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই, এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কিরূপে সে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় "ভিখারী রাম", "ভিখারী রাম" করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভাল লাগে না, এইরূপ নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা

প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে "আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য কর।" একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে "আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা কর।" কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারে না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"

"অমূল্য রতনে

রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"

"বাঁচাও করুণা ময়, ভিখারী রাঘবে।" ইত্যাদি

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার একি দুর্দশা করিয়াছেন! তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোন কালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয় ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়; মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্যাপ্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন :—

বৎস সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণ পূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্য পরাক্রম অরিন্দম; রূপ বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ কর।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছেন, হনুমান জাম্বুবান ও ঋক্ষ সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া—তাহাকে বিনাশ কর। বিভীষণ

তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ভুজগ রাজের জিহবার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূর প্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্ন হৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষন্ন হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রু নেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। "এখন বিষাদের সময় নয়" বলিয়া রাম রাবণ বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শরজালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত দেহে সসর্প পর্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষ হইতে বহু যত্নেও রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন। শক্তি উৎপাটন কালে রাবণ তাহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপন পূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখ, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টনপূর্বক এই স্থানে থাক এবং উহাকে অপ্রমাদে রক্ষা কর। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ঐ সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করতঃ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছু ভীত হইও না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকী বিয়োগ এই সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপি সৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছিলাম; সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টি পথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ-সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ কর। আমি

আজ এমন ভীষণ কার্য করিব যে, অন্ধকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জল-ধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এই ত রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতন দৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভাল হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

রামের নিকট হইতে বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন. মায়ার প্রাসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব ভুকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষেড়নধারী। ইত্যাদি—

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্ত ভাবে দুই একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড় ভাল হয় নাই। “সভয়ে” কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, ‘রক্ষঃকুলবধূ’ ও ‘রক্ষঃকুলবালাদের’ দেখিয়াছেন, শোকাকুলা ‘রঘুকুল-কমলকে’ দেখিয়াছেন, “কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে” দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়!”—কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।” যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নয়নে, প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এত আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত

করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন-ভীষণ "মূর্তি" মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষেড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? "সভয়ে" এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি; ইহাতে "রঘুজ-অজ-অঙ্গজ" দশরথ তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন—

"ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ: নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!"

যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে সয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জলন্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান্ শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান্ ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,—

"নিরস্ত্র যে অরি;
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,

ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?

তখন—

জলদপ্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !"

একথা বলিবার জন্য জলদ প্রতিমস্বনের কোন আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র যুবক, অন্যায় তাহার কোনমতে সহ্য হয় না, তরবারীর উপর সর্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে। মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্পবয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎ পরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণ চরিত্র বুঝিতে পারিবেন।

* রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনত মুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা-প্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক কহিতে লাগিলেন ; আর্য ! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনি অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত

* হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?……বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।……তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষ প্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিসহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবে না।

……প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়! তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা

করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনপ্রকার বিরোধাচারণ করেন, আমি একাকীই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভূজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠবন্ধন এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রু বিনাশার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদ্যুৎবৎ ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে।..... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন, প্রাণ ও সুহৃদগণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয় আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধ বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"তুমি এইস্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নহে। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয় স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধি শৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়-বশতঃই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনি ত আবার

সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরুলোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার ত সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখ, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্য গুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথামাত্রে কখনও কার্যের পারগামী হওয়া যায় না। যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন দুস্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস্। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস্। কিন্তু দেখ্ এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কি হইবে, যদি তুই সম্মুখ যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস তবেই আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ্ আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।" *

---

* ভারতী প্রথম বর্ষ, ১২৮৪, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক; পৌষ, এবং ফাল্গুন সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

॥ ২ ॥

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে, এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না। রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখন তাহার ফুল বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে। আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান-নাই যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না-সে কি করে? সে প্যাটার্ন কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরী করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে কখন বা রাবণরূপে, কখন বা হ্যামলেটরূপে, কখন বা ম্যাকবেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতি-বিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই,—ইঁহাদের কেবল কেরানীগিরী করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করিতে পারেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ। সৃষ্টির অর্থ তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময় বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আমরা যতগুলি ট্রাজেডি দেখিয়াছি, সকল

গুলিতেই প্রায় শেষ কালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্রাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্রাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র; তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্রাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণ কালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম, কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন,...তাহা অতি সামান্য, এতদিন বুঝাবুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নামিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্রাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল

চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি! অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময় সেমি-কোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে, দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে চান, তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন।

এপিক (Epic) শব্দটা লইয়া এইরূপ গোলাযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণত বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলা ভাল হয় না, যে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস একটা এপিক লেখা যাক্" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন, সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগদেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। তাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডে···নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা

দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংসাপ্রবৃত্তি, আর রামায়ণে দেখ, এক দিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের, ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইবে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ—বর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নামমাত্র মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আট শ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র-বিকাশ চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে পাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে। যাহার শুভ্র তুষার ললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণ-স্তূপ, যাহার কোথাও অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে

সমস্ত মহাকাব্যের ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়! কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তিত হয় গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব কল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্‌খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটি মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্রি আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণ পথে পড়িবে না।

পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপ চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধে রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চির-স্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত, তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে।

বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম; তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব-জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না জানিতেই পারি না। সেই সকল অমর সহায়ক সৃষ্টি মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিক ব্যাপী সেই কবিত্ব জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্টি মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কবি বলেন "I despise Ram and his rabble সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষস দিগকে দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব জ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীতে কিরণ দান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহার বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁচে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সম্মুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন; সেই আহ্বান সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব

 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতরণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাবাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি বুঝিতে পারিবে মহাকাব্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন, যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতুহলবশত পড়িতে পারে, বাঙ্গলা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয়দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই, দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও। *

* ভারতী ১২৮৯-ভাদ্র সংখ্যা থেকে পুর্নমুদ্রিত।

॥ ৩ ॥

এর দীর্ঘকাল পর প্রথম তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের ধ্বনি-ঐশ্বর্য ও ছন্দ সম্পর্কিত সশ্রদ্ধ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে।

বাংলা যে-ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয়না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ,' ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনি বৈচিত্র্য, যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা নাই, তার উপর যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক, তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাত পূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আষাঢ় : ১৩০১ [বিহারীলাল : আধুনিক সাহিত্য]

॥ ৪ ॥

'সাহিত্য' গ্রন্থের সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে এর কিছুকাল পর তিনি প্রসঙ্গত মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন—

'য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, একথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না! ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনো মতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত

নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র তীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎ-খচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ কথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোনো ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিবনা বলিয়াও পদে পড়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান গাহিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

রচনাকাল : ১৯০৭ (১৩১৪ : আশ্বিন)

॥ ৫ ॥

জীবনস্মৃতির অন্তর্গত ভারতী প্রসঙ্গে কবি আবার চার বছর পরে অকপটে কৈশোর রচনা সম্পর্কে ত্রুটি স্বীকার করে লিখলেন—

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা 'ভারতী' পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর একটা আমাদের উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স ঠিক তখন ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্ধায় রেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।...

যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই।......

ভারতীর পত্রেপত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লেখা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

রচনাকাল : ১৯১১ (১৩১৮)

॥ ৬ ॥

আরও সাত বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনের উদ্দেশ্যে 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দের প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন :

পয়ার আটপায়ে চলে বলে তাকে যে কতরকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ

কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের সুর বাজিয়েছেন! কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই 'বীরবাহুর' বীর মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল।—'সম্মুখ……বীরবাহু।" তারপরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মত ভাঙাছন্দে ভেঙ্গে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে-দেবী অমৃত ভাষিণী"; তারপরে আসল কথাটা যেটা সবচেয়ে বড় কথা সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্ঘোষিত হ'ল—"কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

প্রথম প্রকাশ : ১৩২৪-চৈত্র : (১৯১৮) —সবুজপত্র।

॥ ৭ ॥

সর্বশেষে ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনাকালে মন্তব্য করলেন—

ইংরেজী ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে, সেটা ওভাষার accent এর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজী ছন্দ এমন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্যে বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয়না। অর্থ বোধের জন্য বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষর বহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'বাদঃ গতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ। অল্পবয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম,

পরবর্তীকালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা, দুর্বলতাটা দূর করবার জন্য গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছি।

১৯৩২ এপ্রিল (১৩৩৮ চৈত্র)

দ্র: ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম সংস্করণ) : পৃঃ ১৮৫

১২৯০ বঙ্গাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কয়েক বছর ধরে বাংলা দেশে ধর্ম আন্দোলনের যে ঝড় উঠেছিল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৈলাশচন্দ্র সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষী সাহিত্যসেবী ও সমাজহিতৈষীবর্গ সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন সঞ্জীবনী, নবজীবন, প্রচার, বঙ্গবাসী, তত্ত্ববোধিনী এবং ভারতী পত্রিকায় তার সাক্ষ্য মেলে। এই ধর্ম আন্দোলনে তিনটি পক্ষ পাওয়া যায়। প্রথম, আদি ব্রাহ্মধর্ম-সম্প্রদায়,—স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নেতা। তাঁর সহযোগীরূপে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হন ১২৯১ বঙ্গাব্দে) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হন ১২৯১ বঙ্গাব্দে) প্রভৃতি কাজ করছিলেন। অপরদিকে হিন্দু সমাজে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, আর বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্ব নিলেন নব্য হিন্দুধর্ম আন্দোলনের। নবজীবন (১২৯১ শ্রাবণ) এবং প্রচারে (১২৯১ শ্রাবণ) যথাক্রমে 'ধর্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে মিল, স্পেন্সার, কোম্তে (Positive Policy and Religion) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতের সাধর্ম্যে নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করলেন।—এই প্রবন্ধ দুটি অবলম্বনে ব্রাহ্মসমাজে এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ১২৯১ বঙ্গাব্দে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তাতে ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকরূপে ২৩ বৎসরের তরুণ যুবক রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১২৯১ অগ্রহায়ণ) 'একটি পুরাতন কথা' নামে প্রবন্ধ লেখেন,—এটি প্রথমে মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ সিটি কলেজের হলে পঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র "আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" (প্রচার : ১২৯১ অগ্রহায়ণ) শীর্ষক

প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহের পাত্র ছিলেন। তবু তাঁর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে যে লিখলেন "তাহারি কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া" দেখেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নায়কেরা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে বঙ্কিমের নব্য হিন্দুধর্ম মতের প্রতিবাদ করছেন বুঝেই তিনি এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'কৈফিয়ৎ' (ভারতী : ১২৯১ পৌষ)-এ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এই প্রবন্ধের যে জবাব দিয়েছিলেন সেটি লক্ষণীয়। তিনি কারও ছায়া রূপে নয়. নিজে বঙ্গসমাজের পক্ষে থেকে যেমন বুঝেছেন, ঠিক সেইভাবে প্রতিবাদ করেছেন লিখেছিলেন। যাই হোক এই কৌতুকময় দ্বন্দ্বের মধুরভাবেই সমাপ্তি ঘটেছিল। দীর্ঘ দিন বাদে জীবনস্মৃতিতে সশ্রদ্ধভাবে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন কবি।—

"সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক! এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।"
[জীবনস্মৃতি : বঙ্কিমচন্দ্র ; র. র. ১৭ খণ্ড, পৃ. ৪১৯]

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ দুটি, তত্ত্বোধিনী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি, এবং রবীন্দ্রনাথের ও বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর প্রত্যুত্তর মূলক প্রবন্ধ তিনটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। পাঠক সেযুগের একটি অনতিস্পষ্ট অধ্যায়ের কৌতুককর চিত্রের সন্ধান পাবেন আশা করা যায়।

ধর্ম-জিজ্ঞাসা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিষ্য : মহাশয়! আজ আপনাকে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিব, শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। অনেকে অনেক কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিয়াও, অতি সহজ ব্যাপার বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে না! আমি তাহারই একজন।

গুরু : প্রশ্নটা কি?

শিষ্য : ধর্মে কিছু কি প্রয়োজন আছে?

গুরু : ইহার কি কোন উত্তর কোথাও শুন নাই?

শিষ্য : শুনিয়াছি। যথা—ধর্মে পরকালে উপকার হয়।

গুরু : সেটা কি সদুত্তর নয়?

শিষ্য : যে পরকাল মানে তাহার পক্ষে এটা সদুত্তর হইলে হইতে পারে। কিন্তু যে পরকাল মানে না? তাহার পক্ষে ধর্মে কি কোন প্রয়োজন নাই?

গুরু : যে পরকাল মানে না, এমন একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, শোন সে কি বলে?

শিষ্য : সে বলিবে ধর্মে প্রয়োজন আছে। কেন না ধর্মে আত্মাশক্ত বলিয়া কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে সম্মত নহে।

গুরু : বাপু হে, ধর্ম কথাটা লইয়া তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। কখন কোন্ অর্থে ইহা ব্যবহার করিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহারজাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, যথা অমুক কার্য "ধর্ম-বিরুদ্ধ" "মানব ধর্ম শাস্ত্র" "ধর্ম সূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক না পারুক "নীতি বিরুদ্ধ" কথাটা চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে

পারে। তৃতীয়ত ধর্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্মাত্ম মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্মিক অমুক ব্যক্তি অধার্মিক। এখানে অধর্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্মের নাম "Sin"—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"Good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌম্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। যথা "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ড ধর্মের" কথা লিখিয়াছেন। যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে, ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য মোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥"

পুনশ্চ—"পাষণ্ডগণ ধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।" আর ষষ্ঠত ধর্ম শব্দ কখন কখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

"দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য, ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্মাত্মতার প্রতি এবং কখন পুণ্য কর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম (রিলিজন), উপধর্ম সঙ্কুল-নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-

 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

শিষ্য : আমি এমন কি কথা বলিলাম, যে তাহাতে এ সকল বড় বড় কথা আসিয়া পড়ে।

গুরু : তুমি বলিলে, "ধর্মে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে।" এখানে তুমি নীতি অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছ। আবার যখন জিজ্ঞাসা করিলে, "ধর্মে কিছু প্রয়োজন আছে কি?" তখন তুমি রিলিজন অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছ?

শিষ্য : কিসে বুঝিলেন?

গুরু : নীতিতেই আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু রিলিজনে যে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য নহে। জন স্টুয়ার্ট মিল, প্রকৃত ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অথচ রিলিজনের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইরূপ য়ুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য, ভাবুক চিত্ত এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, তাঁহারা রিলিজনের আবশ্যকতা মানেন না। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক এবং তুমিও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ "ধর্মে কি কিছু প্রয়োজন আছে?"

শিষ্য : আপনি কেন মনে করেন না, যে আমি নীতিরই প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি।

গুরু : আমি তাহা মনে করিতে পারি না, কেন না নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে।

শিষ্য : যদি তাহাই হইবে, তবে দুর্বিনীত লোক দেখিতে পাই কেন?

গুরু : দুর্বিনীত মনে করে, যে আমার নীতির বশবর্তী হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সে কখন মনে করে না, যে আর সকলেরও নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না, যে অন্যে তাহার ধনাপহরণ করুক, নরঘাতী ইচ্ছা করে না, যে অন্যে তাহাকে খুন করুক, পারদারিক মনে করে না, যে অন্যে তাহার ভার্যাহরণ করুক। অতএব দুর্নীতেরা নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে।

শিষ্য : আপনি যে, কয়টি উদাহরণ দিলেন, সেগুলি আইনের কাজ হইতে পারে দুর্নীতেরাও ইচ্ছা করে না, যে আইন উঠিয়া যাক্, কেন না তাহা হইলে কেহই সমাজে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইল ?

গুরু : আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত যে নীতি, তাহাই আইন। একথা তলাইয়া বুঝিলে বুঝিতে পারিবে, যে মানবাদি ধর্মশাস্ত্র—হিন্দু নীতি মাত্র, হিন্দুধর্ম নহে। তাহার বিপর্যয়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধর্মচ্যুতি ঘটে না। কিন্তু সে পরের কথা। আইন নীতি; তাহার লঙ্ঘন সমাজ অথবা সমাজের মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত করেন। আর কতকগুলি নীতি আছে, তাহা সমাজ বা রাজা দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই তাহার দণ্ডপ্রণেত্রী। যথা, অধিক সুরা পান। রাজা ইহার দণ্ডবিধান করেন না। অনেক সমাজও ইহার দণ্ডবিধান করে না। মহাভারতে যদু-বংশীয়দিগের ও অপরের মদ্যাশক্তির বর্ণনা যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, অতিশয় মদ্যাশক্তি তখন সমাজ কর্তৃক দণ্ডিত হইত না। কিন্তু রোগ, অবনতি, ক্ষয় প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি এ পাপের দণ্ড করিয়া থাকেন। মহাভারতের কবিও সে কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। মৌসল পর্বে সেই দণ্ডের কীর্তন আছে। এই দ্বিবিধ নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। সুরাপায়ীও কখন বলিবে না, সমাজ শুদ্ধ মাতাল হউক। এক্ষণে বুঝিলে যে তোমার প্রশ্ন কেবল রিলিজন সম্বন্ধেই সঙ্গত।

শিষ্য : আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার সদুত্তর প্রার্থনা করি।

গুরু : উত্তরের আগে, একটা নিয়ম করা যাউক। এই রিলিজন কথাটা বাঙ্গালায় সর্বদা ব্যবহার করা চলে না। এ বিচারে ধর্ম শব্দই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম শব্দের ছয় প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে— দেখাইয়াছি। এই ছয়টি সর্বদা একের স্থান অপরে অধিকার করে। ইহা মহান্ অনর্থের মূল। এই জন্য এই ছয়টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নিয়োজিত করা কর্তব্য। আমি রিলিজনকে ধর্মই বলিব আর কিছুকে ধর্ম বলিব না। Morality অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অর্থে নীতি শব্দ ব্যবহার করিব, ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিব না।

শিষ্য : এখন কথাটা পরিষ্কার হইল। এক্ষণে প্রার্থিত উপদেশ প্রদান করুন—ধর্মে প্রয়োজন কি ?

গুরু : কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। ধর্মে প্রয়োজন কি,—জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম কি ? ধর্ম কি তাহা না বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে কিনা ?

শিষ্য : ধর্ম ত রিলিজন।

গুরু : রিলিজন কি ?

শিষ্য : সেটা জানা-কথা।

গুরু : বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে ?

শিষ্য : যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু : প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদাদের প্রাচীন ধর্ম কি ধর্ম নয় ?

শিষ্য : যদি বলি দেব-দেবীতে বিশ্বাস।

গুরু : ইস্‌লাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদা প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্মে দেবও এক—ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম নয় ?

শিষ্য : ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ?

গুরু : এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলে, বুঝা যায়, যে তৎপ্রণয়ণের সমকালিক আর্যদিগের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্মহীন নহেন, কেননা তাঁহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মও নিরীশ্বর. অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি ? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য : তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম।

গুরু : অর্থাৎ Supernaturalism। তাহা বলিলে তোমার প্রশ্নের উত্তরটা সহজ হইয়া আসিল। যদি লোকাতীত চৈতন্যের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে,

তাহাতে বিশ্বাস অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য কর্তব্য কেন, অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন না যাহার প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। তাহা হইলে ধর্মের প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মত, লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্মও নাই—ধর্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য: অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা "Religion of Humanity."

গুরু: সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়।

শিষ্য: তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব!

গুরু: প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা" মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন "নোদনা লক্ষণো ধর্ম।" নোদনা ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "নোদনা প্রবর্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কিনা।

শিষ্য: কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক ধর্মগ্রন্থ ততগুলি পৃথকপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম; মুসলমানও কোরান সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম পদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু: এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে "বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনবদর্থো ধর্মঃ।" এই সকল কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধর্ম। এবং সদাচারই ধর্মশব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে, যথা মহাভারতে—

 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"শ্রাদ্ধকর্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মঃ সাধারণো নৃপ॥

কেহ বা বলেন, "দ্রব্য ক্রিয়া গুণাদীনাং ধর্মত্বং" এবং, কেহ বলেন ধর্ম অদৃষ্ট বিশেষ। এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনিয়াছ। এজন্য আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। ফলত আর্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্যই ধর্ম যথা বিশ্বামিত্র—

যমার্যাঃ ক্রিয়মানংহি শংসস্ত্যাগমবেদিনঃ।
সধর্মে যং বিগর্হস্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্মযদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপবাচ," ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রহ্ম জ্ঞানই পরধর্ম। ভগবদগীতার স্থূল তাৎপর্যই কর্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু ধর্ম-বাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এইজন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ পর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্মতত্ত্ব নির্দেশ নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেকস্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।

ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব হইতে ধর্মব্যাধোক্ত ধর্ম ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই

শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য : এদেশীয়েরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই ?

গুরু : রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন্ শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে ?

শিষ্য : কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু : তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life ; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonions whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him. Because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so

difficult at the present day to erect it into a separate entity. *

শিষ্য : তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু : তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে re-ligare হইতে ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন, ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা re-legere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফূরিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

শিষ্য : প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু : কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, অনেকটা religion শব্দের অনুরূপ। ধর্ম—ধৃ+মন (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকঃ বা) এইজন্য আমি ধর্মকে religo শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য : তা হোক—এক্ষণে রিলিজিয়নের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু : আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্মানেরাই সর্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি জর্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্মানদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look

* লেখক প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল। উহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, আবার অনেক পাঠক বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে লেখা বৃথা। অতএব এই রুচি বিরুদ্ধ কার্যটুকু পাঠক মার্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

upon all our moral duties as divine commands, that he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion) ; on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands."

তারপর ফিক্তে। ফিক্তের মতে "Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a rough sanctification to our mind." সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্নপ্রকার। তারপর সিয়ের মেকর। তাঁহার মতে। "Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which through it determines us, we cannot determine in our turn" তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন "Religion is to or ought to be perfect freedom ; For it is neither more nor less than the divine spirit becoming conscious of himslf through the finite spirit" এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য : যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য মোক্ষমূলরের নিজের মত কি ?

গুরু : তিনি বলেন, "Religion is a subject faculty for the appehension of the Infinite."

শিষ্য : Faculty ! সর্বনাশ ! বরং রিলিজিয়ন বুঝিলে, বুঝা যাইবে,—faculty বুঝিব কি প্রকারে ? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি ?

গুরু : এখন জার্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে যেখানে "Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেখানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings" অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত। দেবদেবী ও ঈশ্বরও অন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইহার বাক্য ঐক্য হইল।

শিষ্য : সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু : সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব: যোস্নুকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন স্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন!

শিষ্য : তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্মবিরোধী।

গুরু : তাঁহার শেষাবস্থার রচনাপাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে। যাই হোক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। তিনি বলেন, "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য : কথাটা বেশ।

গুরু : মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য সীলীর কথা শোন। ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোমৎ নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত "Ecco Home" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে। * বাক্যটি এই "The substance of Religion is culture." কিন্তু তিনি একদল লোকের মতের সমালোচনাকালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন "habitual and permanent admiration." ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, which together make up woman are felt in various combination for human

---

* দেবী চৌধুরাণীতে।

beings and even for inanimate objects. It is not exclusively but only par excellence that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state. And this elementary state of religion is what may be described as habitual and permanent admiration.

শিষ্য : এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই 'habitual and permanent admiration' যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, strong and earnest direction of the emotions and desires towords an ideal object recognised as of the highest excellence.

গুরু : এ ভাব, ধর্মের একটা অঙ্গ মাত্র।

শিষ্য : কেন ?

গুরু : "Habitual and permanent admiration," ইহার দেশী নামটি কি,—তোমার স্মরণ হইতেছে না ?

শিষ্য : কি ?

গুরু : ভক্তি। কেবল ভক্তি ধর্ম নহে। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগষ্ট্‌ কোম্‌তের ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্‌ত নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্মসৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, Religion, in itself express the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature moral and physical, are made habitually to converge towords one common purpose."—অর্থাৎ "Religion consist in regulating one's individual nature,

one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate indiving."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

শিষ্য: আগে ধর্ম কি বুঝি, তারপর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণ কৃত ধর্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু: কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন; এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

শিষ্য: তবে সেই ভগবদ্গীতায় যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিন।

গুরু: তাহা পারিতেছি না। কেননা তোমাকে যাহা বুঝাইতে হইতেছে, তাহা রিলিজন্। ভগবদ্গীতার রিলিজন্ সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাতে রিলিজনের প্রতিশব্দ কোথাও নেই। ইহার কারণ পূর্বেই বুঝাইয়াছি। আর্যদিগের চিত্তে সমগ্র মানব-জীবন হইতে রিলিজন কখন পৃথক উদ্ভূত হয় নাই।

শিষ্য: তবে আমার রিলিজন বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহাদিগের মনে রিলিজন ভাব কখন উদ্ভূত হয় নাই—তাঁহারা যদি অভাবেও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবে আমার সেই বৈদেশিক চিত্ত বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই। গীতায় যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে তাহাই বুঝিবার বাসনা করি।

গুরু: এখন আর ধর্মস্রোতে রিলিজন ভাসাইয়া দিলে চলিবে না। বিশেষ

হইতে হউক, স্বদেশ হইতে হউক, স্বর্গ হইতে হউক, নরক হইতেই হউক যখন রিলিজন সামগ্রীটা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দিই বা ঘরে তুলি, না বুঝিয়া কিছু করা হইবে না। কথাটি না বুঝার কারণে অনেক সামাজিক উৎপাত উপস্থিত হইতেছে।. যাহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্মশব্দ বহ্বর্থ। অনেক অর্থ যখন আছে, তখন অনেক সামগ্রাও আছে। সকল সামগ্রীগুলি পৃথক পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া চাই।

শিষ্য : তবে আপনিই আমাকে রিলিজন বুঝাইয়া দিন। জৈমিনি হইতে অগস্ত্য কোম্‌ৎ পর্যন্ত যে সকল পণ্ডিতকৃত ধর্মব্যাখ্যা আপনি আমাকে শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক আলোতে যেমন লোকের চোখ সরিয়া যায়, আমার সেইরূপ হইয়াছে।

গুরু : তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ধর্মে প্রয়োজন কি? কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? কেবল কৌতূহলবশত অথবা কথোপকথনের ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া থাক তবে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট; তাছাড়া তোমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল কি?

শিষ্য : সকলেই ধর্ম কামনা করে—সকলে করুক না করুক আমি করি। নীতি কি তাহা জানি ধর্ম কি তাতো জানি না, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।

গুরু : পরকাল মান?

শিষ্য : তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গুরু : তবে ধর্ম-জিজ্ঞাসু হইয়াছ কেন? ইহলোকে ধর্মাত্মা বলিয়া যশস্বী হইবে এই বাসনায়।

শিষ্য : ঠিক তা নয়। ধর্মে যদি সুখ থাকে এই সন্দেহে।

গুরু : তবে ঠিক বল দেখি তুমি খুঁজিতেছ কি? ধর্ম না সুখ?

শিষ্য : সুখ খুঁজি বলিয়াই ধর্ম খুঁজিতেছি।

গুরু : যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোকে ঠিক পথ পায়, তোমার সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্রকৃত সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম। ধর্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ।

শিষ্য ঃ এ কি ভয়ঙ্কর কথা। লৌকিক বিশ্বাস তো ঠিক বিপরীত। লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাল থাকে, তাহা হইলে ধর্মে পরকালে সুখ হইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব), কিন্তু ইহলোকে যে ধর্মে সুখ হয়, এ কথাটা ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ।

গুরু : ভূয়োদর্শনটা কিরূপ ?

শিষ্য : দেখুন ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি ধর্মবিরুদ্ধ, তথাচ সুখ বটে।

গুরু : ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্মবিরুদ্ধ, এটা ঘোরতর মূর্খের কথা। আমি, মনে কর, নীতি সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়াছি, দরিদ্র প্রভৃতি যাহাদিগকে দেয় তাহাদিগকে উপযুক্ত অংশ দিয়াছি। তারপর যদি উপযুক্ত অংশের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিমাণে নিজের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করি, তবে অধর্ম কোথায় হইল ?

শিষ্য : যে ভোগাসক্ত, সে কি ধার্মিক ?

গুরু ঃ ভোগাসক্তি কি সুখ ? ইন্দ্রিয়ের পরিমিত এবং যথা কর্তব্য পরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পারে—কিন্তু ইহা সুখের অল্পাংশ ; একটা নিকৃষ্ট প্রকারের সুখ মাত্র। সুখের যাহা উপায়, তাহাই ধর্ম। এই কথার যথার্থ ব্যাখ্যার পূর্বে আগে বুঝা চাই যে সুখ কি ?

শিষ্য : বলুন সুখ কি ?

গুরু : পিপাসা পাইলে জল খাইলেই সুখ। মনুষ্য-প্রকৃতি পিপাসাময়। মনুষ্য-প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। সেইগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ। যদি ইংরেজী কথা ব্যবহার করিতে চাও, তবে ইহাকে culture বলিতে পার।

শিষ্য ঃ বৃত্তি কথাটা, লইয়া ত প্রথমে গোলে পড়িলাম। এই মাত্র কথা লইয়া মক্ষমূলারকে পরিহাস করিতেছিলাম।

গুরু ঃ মনুষ্য প্রকৃতি এক বটে, কঠোর বোঝা বা শাকের আঁটির মত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমষ্টি নহে। তথাপি, মনুষ্য প্রকৃতি অবিভাজ্য এক বস্তু হইলেও, তাহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা বিকাশ আছে। যে বলে আমার হাতের বল, সেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি হাত ও পা পৃথক। ক্রোধ ও স্নেহ একই মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া। এই

ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বল না কেন? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক পটুতা, তাহার সেই বৃত্তি সমধিক স্ফুরিত বল না কেন?

শিষ্য: এতে ত ঘোর ইন্দ্রিয়কতা দোষে দূষিত হইতে হয়। প্রথম মানসিক বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি খুঁজি, তাহা হইলে আমি ঘাতক, পারদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাবনা।

গুরু। দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না। প্রথমত তুমি যদি চোর, পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি কোথায়? তোমার সে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পারদারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে একা নহ; তুমি মনুষ্য-সমাজের একটি মনুষ্য মাত্র। সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত: সমাজ সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। সমাজ সুখী না হইলে, তুমি একা কখন সুখী হইতে পার না; কেন না তুমি সংসারে অংশ মাত্র। এখন সামাজিকদিগের পরদারাদি নিরতি; অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কারণ হইতে পারে না; এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না, কেন না তুমি সমাজভুক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবলতর হইয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তির স্ফূর্তি এবং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া সুখের ধ্বংস করিবে। দ্বিতীয়ত দুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়া তোমার সুখের ধ্বংস করিবে। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতি বা স্বার্থপরতা সুখ নহে, দুঃখ।

শিষ্য: তা বুঝিলাম, কিন্তু সুখ কি এখনও বুঝি নাই।

গুরু: সুখ বলিয়াছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য, ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্যগুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ স্ফূর্তি—অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা যত দূর স্ফূর্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটি সীমা আছে—পরস্পরের সামঞ্জস্য। কেহই যেন এতদূর স্ফূরিত হইতে না পারে, যে তদ্দ্বারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত স্ফূর্তির ব্যাঘাত হয়। আর সমুচিত পরিতৃপ্তি—অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং পরের অনিষ্ট না হয়। এই সুখ; ইহা প্রাপ্তির উপায় ধর্ম।

শিষ্য: অনুশীলন ত ইহার এক উপায়—অনুশীলন কি ধর্ম।

গুরু: অনুশীলনই ধর্ম নয়—অনুশীলন ধর্মাচরণ— অর্থাৎ ধর্মানুমত কার্য।

এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সুখে জীবন নির্বাহ, অন্তর্জগতের অধীন। পার্শ্ববর্তী জড়প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদের জানা চাই। যেখানে জানিতে না পারি, সেখানে একটা তত্ত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই—যথা, এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর নিয়ত ; এবং ইহলোকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই ধর্মের মূল। বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত। "Religion of Humanity" নামক অভিধর্ম ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান কেবল বৈজ্ঞানিক।

শিষ্য : ধর্মের যে ভাগকে "Doctrine" বা "Creed" বলা যায়, বোধ হয় এ ভাগ তাই।

গুরু : যদি ইংরেজি কথা নহিলে, বুঝিতে না পার, তবে তাই বলিও। এক্ষণে শোন। তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্গত যে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য পদার্থ পাই। এক্ষণে মিলের সেই বাক্য স্মরণ কর—"Ideal object of the highest excellence." ইহা তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহা কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেবদেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity. পরে সীলির সেই বাক্য স্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মানসিক অবস্থা—"Habitual and permanent admiration". ইহাই উপাসনা। ইহা ধর্মের দ্বিতীয় উপাসনা।

শিষ্য : Worship বা Rites.

গুরু : ঠিক। তারপর, কি জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মনে কর। আমাদিগের বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন এবং চরিতার্থতা অর্থাৎ জীবননির্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে। যে সকল ঐ স্থান হইতে অনুমিত করিয়া লই। সেই নিয়ম নীতি বা ধর্মশাস্ত্র। ইহাই ধর্মের তৃতীয় উপাদান।

শিষ্য : Morality.

গুরু : এই তিনের সমবায় ধর্ম। সমাজস্থিত প্রত্যেক শক্তির জীবন ইহার দ্বারা নিয়ত, এবং সম্যক্ সমাজের ইহাই কেন্দ্রীভূত। অতএব ইহাই উল্লিখিত কোমতের বচনানুমত ধর্ম। মিল ও সীলীর ব্যাখ্যাও ইহার অন্তর্গত এইমাত্র

বলিয়াছি। কাস্তের নীত্যাত্মিকা ও ফিক্তের জ্ঞানাত্মিকা ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাইতেছ। আর, যাহা কার্যের প্রবর্তক তাহাই যদি নোদনা হয়, তবে ত ধর্মকে "নোদনালক্ষণ" বলে।

শিষ্য : এ ব্যাখ্যায় আমি তত সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহাতে আমার প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম আছে, বিশেষত অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন দুইটি নাই। কাহারও তত্ত্বজ্ঞান আছে, উপাসনা নাই। কাহারও বা উপাসনা আছে, কিন্তু নীতি নাই। এসকল গুলিকে ধর্ম বলিবেন কি না?

গুরু : আমাদিগগের সম্মুখে যে ইমারতের আধখানা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে ইমারত বলিবে কি? ঐ সকল ধর্মও সেইরূপ। কাল নামক মিস্ত্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট হইবে।

শিষ্য : আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এ ব্যাখ্যার অনুমত ধর্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণজ্ঞানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। যতটুকু তাহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাসনা ও নীতি সেই পরিমাণে দূষিত হইবে। তারপর, তত্ত্বজ্ঞান খাঁটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের অবধারণে ভ্রান্তি হইতে পারে। উপাস্য ঠিক হইলেও, উপাসনা ভ্রান্ত হইতে পারে। আর নীতি ত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব ধর্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কোন ধর্মবিশেষকে ঈশ্বর বা অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত, এবং সেইজন্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

গুরু : আমারও ঠিক সেই মত। আমি কোন ধর্মকেই ঈশ্বর প্রণীত বা অভ্রান্ত ঋষিপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে মানি। কিন্তু ধর্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা স্বীকার করি না। তাহা বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অবমাননা করা হয়। বস্তুত সকল ধর্মেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্মেই কিছু সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য বা একেবারে মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই।

শিষ্য : এই কথায় আমার তৃতীয় আপত্তিও খণ্ডন হইতেছে। আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে যখন জ্ঞানের তারতম্যে ধর্মের পার্থক্য জন্মিতে পারে (ও

জন্মিয়াছে), তখন ধর্মের নিত্যত্ব কোথায় ? কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে সকল ধর্মেই যখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল ধর্মেই কিয়দংশ নিত্য। কিন্তু আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাখ্যানুসারে নিখিল ধর্মের অন্তর্গত একটা শারীরিক ধর্ম মানিতে হয়।

গুরু : শারীরিক ধর্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবং বিশুদ্ধ চিত্তে শারীরিক ধর্ম আচরিত করিতে হইবে। তদ্বিপর্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্যজাতি দুর্বল হইয়া পরাধীন হইয়াছে। এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্মচ্যুত ও সুখচ্যুত হইয়াছে। ধর্মের সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গের সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়।

শিষ্য : আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম তবে ধর্ম নিষ্কাম হইল কই ? আপনি এই মাত্র ভগবদগীতার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ ধর্ম ব্যাখ্যা ত ভগবদ্বাক্যের সঙ্গে মিলে না।

গুরু : নিষ্কাম ধর্মই সুখের উপায়। সকাম ধর্ম সুখের উপায় নয়। সকাম ধর্মই নয়, অধর্ম। আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছি, যে সুখের উপায়ই ধর্ম। বস্তুত ধর্মই সুখ। এখানে সাধনায় এবং সাধ্যে ভেদ নাই। বৃত্তিগুলির অনুশীলনই পরিতৃপ্ত এইজন্য সাধনাই সাধ্য। এইজন্য ধর্ম ও সুখ, একই। আমাদের বুঝিবার জন্য উহাদের প্রভেদ কল্পনা করিয়া নামকরণ করিতে হয়। অতএব ধর্মাচরণে ধর্ম ভিন্ন যদি আর কিছু কামনা কর তবে তোমার ধর্ম বিপদগামী হইল—তোমার ধর্মচ্যুতি হইল। নিষ্কাম ধর্মের এরূপ তাৎপর্য নহে। সে ধর্ম কামনা করিবে না। ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিবে না, ইহাই তাৎপর্য। ধর্মার্থ কর্ম করিবে, কর্মফলের জন্য কর্ম করিবে না। নিষ্কাম ধর্ম এত অল্প কথায় বুঝান যায় না। সে আর একদিনের কথা।

শিষ্য : আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, ধর্মমাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংস্রব আছে, তবে কোন ধর্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেননা মিথ্যামাত্রেই অনিষ্ট আছে।

গুরু : এইজন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্মই অবলম্বন কর, তাহার সংস্কারপূর্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।

শিষ্য : তবে কি সকল ধর্মই তুল্যরূপে অবলম্বনীয় হইতে পারে ?

গুরু : তবে এমন কথা বলিনা যে, জেলখানায় যেমন একটিমাত্র ফটক, স্বর্গেরও তেমনি একটিমাত্র দ্বার, যে ব্যক্তি বলে আমার গৃহীত ধর্ম ভিন্ন আর সকল ধর্ম মিথ্যা,

কেবল আমি আর আমার সধর্মীরাই স্বর্গে যাইবে, আর সকলই নরকে পচিয়া মরিবে, তিনি আর্যঋষিই হউন, পাণ্ডিত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, বা সর্বশাস্ত্রবেত্তা জার্মানিক হউন, আমি তাঁহাকে ঘোরতর মূর্খ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কখনই এমন পক্ষপাতী এবং খলস্বভাব মনে করিতে পারি না, যে তিনি কেবল জাতিবিশেষকে স্বর্গে যাইবার উপায় বলিয়া দিয়া, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল—ইহলোকের নরকই হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য—যাহারা কোন ধর্ম মানে না। তথাপি, আমি এমন বলি না, যে সকল ধর্মই তুল্যরূপে অবলম্বনীয়। যে ধর্মে সত্যের ভাগ অধিক, অর্থাৎ যে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা, যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর, এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য : আপনার মতে কোন্ ধর্ম এই লক্ষণাক্রান্ত? কোন ধর্ম সর্ব শ্রেষ্ঠ।

গুরু : হিন্দুধর্ম সর্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাই অবলম্বন কর।

শিষ্য : শুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্মই মিথ্যা ধর্মপূর্ণ, অধর্মপূর্ণ, কদর্য। এবং পাশব ধর্ম।

গুরু : তুমি হিন্দুধর্মের কিছু জান কি?

শিষ্য : হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি।

গুরু : ম্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না।

শিষ্য : আপনি ব্রাহ্মণ আপনি না হয় আমাকে উপদেশ দিন।

গুরু : আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্ম ব্যাখ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমার ব্যবসা। অতএব, আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি। তবে আজ বেলা অবসান হইয়াছে, সময়ান্তরে হইবে। আজ, একজন ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের একটি বাক্য তোমাকে উপহার দিব—রাত্রে শুইয়া তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিও।

আচার্য গোল্ডস্টুকারও আমার মত বলেন; হিন্দুর ধর্ম হিন্দুধর্ম। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"If the creed of an individual is founded on Texts held sacred it is a national creed; no nation can surrender it

without laying the axe to its own root. For a religion based on texts believed sacred, embodies the whole history of the Nation which professes it; it is the shortest abbreviation of all that ennobles the nation's mind, is most dear to its memory and most essential to its life.

এমন অমৃতময়ী বাণী ম্লেচ্ছ ভাষায় আর কখন আমার কানে যায় নাই।

'নবজীবন' শ্রাবণ ১২৯১

হিন্দুধর্ম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসার আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।[১]

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে হিন্দুধর্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীর-রক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন। এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে

১। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তারপর অপরাহ্ণে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,—ভোজনান্তে জমিদারী কার্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে—বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন মোকর্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন এ সময় হরিস্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খায়। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন।

যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্রে ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখনও মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানে মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকেও বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্বগুণ সম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দু-ধর্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র বিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগ-পুষ্করিণাদির জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।* যে হিন্দুধর্মে তৃষিতকে এক গণ্ডূষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম? যদি হয়, এরূপ নৃশংস ধর্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র, কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্মে মন্বাদি অপেক্ষা মোলত্‌কে ও নেপোলিয়ন অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূলকথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম লুকোচুরি, তখন যেমন ধর্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বিধিকে "রাজধর্ম" ইত্যাদি বলা, সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, মনুর কোন্ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম আছে এবং কোন্ গুলিতে নাই, এ কথার কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদিগের সকল—উক্তিগুলিই ধর্ম—যদি তাহাই ধর্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্র মতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না। যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না। যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রৌতস্মার্ত অগ্নি

* ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায় ১৯৬

পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্মকর্ম করে, যে দুর্জন, যে পিতা মাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এ বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্মে আজিকার দিনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই বা হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আর কোন নূতন ধর্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধর্মহীন রাখা উচিত? যে সমাজ ধর্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইবে?

* অনেকে বলেন যে, ধর্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতি মাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম বা ধর্মমূলক।

পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহারা আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্‌লাম্ কতকগুলা বন্য জাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য সমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম রাজার ধর্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্ ধর্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্মে পরিণত হইবে।

যখন ধর্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম তাহার সর্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না। এবং বোধ হয় কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম আছে; তৎকর্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য অথবা প্রত্নতত্ত্ব যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ নির্বোধ-

গণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস অথবা কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় ; তাহাই ধর্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মে যেরূপ আছে এরূপ আর কোন ধর্মেই নাই। সেইটুকু সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য যাহা অসত্য তাহা অধর্ম! যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক একটা ধর্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা একথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য কোন্ কথা মিথ্যা ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্‌টুকু ধর্ম, কোন্‌টুকু ধর্ম নয়? কোন্‌টুকু সার কোন্‌টুকু অসার? উত্তর, আপনারই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে?

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প-লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।

'প্রচার' শ্রাবণ ১২৯১

নূতন ধর্মমত : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন মহাকবি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরকে জানা বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কোথায় ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ হইবেন তাহা না হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, অথবা কোমত্‌বাদ অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে কোমতের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। "নবজীবন" নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। নবজীবনের "ধর্মজিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে চির-চমৎকৃতি এবং সুখই ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সকল এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। আমরা যদি উক্ত প্রস্তাবের লেখক বঙ্কিমবাবুকে দিনরাত্রি চমৎকার ভাবে দেখি তাহাকে কি ধর্ম বলা যাইতে পারে? কোনপ্রকার সুখ ইচ্ছা করিয়া ধর্মসাধনই কি ধর্ম বলা যাইতে পারে? বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতাতে নামিয়া এত দুর্দশাগ্রস্ত হয় নাই যেমন এইমত প্রচলিত হইলে তাহা হইবে। ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না যে ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকলই ব্রহ্মকে কীর্তন করিতেছে। যোগীরা ব্রহ্মকেই ধ্যান করেন, কর্মীরা কর্মের ফলাফল সকল ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া সেই কর্মের স্বার্থকতা সম্পাদন করেন। চির-চমৎকৃতিও ধর্ম নহে; সুখও ধর্ম নহে; একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে। "নবজীবন" সম্পাদক বলিয়াছেন "নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে বাঙ্গালী একটু একটু বুঝিতেছেন যে ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না। আমাদের কোন উন্নতি হইবে না।" ঘৃণিত কোমত্‌ বাদের * প্রবর্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের

* Permanent admiration এবং Culture সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন

কারণ হয় তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না। যথার্থ বলিতে গেলে, ব্রাহ্ম ধর্মই আমাদিগের মৃতবৎ হিন্দুসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্মই বঙ্গদেশের লোকদিগকে সেই মৃত সঞ্জীবন, জীবনের জীবন, সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্মই আমাদিগের দেশের লোকদিগকে পান-দোষ প্রভৃতি দোষ হইতে ক্রমে ক্রমে বিরত করিতেছে এবং তাহাদিগকে নৈতিক উন্নতি সাধন করিতেছে। আমরা অধিক বলিব কি, দেশের অনেক স্থানে যে সকল হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদিগের কার্যপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল সভা বিশেষ কোন পৌত্তলিক মত সমর্থন না করিয়া এক্ষণে সাধারণ ধর্মের যে অধিক আলোচনা করেন তাহা কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তেই উত্তেজিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ অবলম্বন করিয়া অপৌত্তলিক ধর্মের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উৎপাদন পূর্বক আর্যসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতএব মৃতবৎ হিন্দুসমাজে কে নবজীবনের সঞ্চার করিল? ব্রাহ্মধর্মই করিল। "নবজীবনে"র সহযোগী "প্রচার" পত্রিকার কোন লেখক বলেন "হিন্দুধর্মের কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ সকলই স্বীকার করেন যে এই বিমিশ্র কলুষিত হিন্দুধর্মের দ্বারা হিন্দু সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম সেইটুকু অনুসন্ধান

সে বিষয়ে comte এইরূপ বলেন। "Thus each step of sound training in positive thought awakens perpetual feelings of veneration and gratitude; which rise often into enthusiatic admiration of the Great Being (Humanity) who is the author of all these conquests, be they in thought or be they in action." যাঁহারা মনে করেন যে কোমতের এই মত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সর্ববাদিসম্মত তাঁহারা একবার দেখুন যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক Spencer কি অকাট্য যুক্তি দ্বারা কোমতের উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।

"What may have been the conceptions of veneration and gratitude entertained by M. Comte, we cannot of course say, but if any one not a disciple will examine his consciousness, he will, I think, quickly perceive that veneration or gratitude felt •

করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত।...যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সার ভাগ গঠিত; এরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব, সকল ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মে তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মে যেরূপ আছে এরূপ আর কোন ধর্মেই নাই। সেটুকু সারভাগ। সেইটুকু হিন্দুধর্ম। সেটুকু ছাড়া যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে মহাভারতে থাকে অথবা বেদে থাকে তবু অসত্য অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।" এই কথাতে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিই, কিন্তু "প্রচারের" উক্ত প্রস্তাবে লেখক আবার নবজীবনের "ধর্ম জিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক। "ধর্ম জিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি কোমতের মত হিন্দুধর্মের সার ভাগ মনে করেন। যদি কোমতের মত হিন্দুধর্মের সারভাগ হয় তাহা হইলে এমন হিন্দুধর্ম আমরা চাহি না কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কোমতের মত হিন্দুধর্মের সারভাগ নহে। ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক হবে না।

"প্রচার" পত্রিকার "হিন্দু ধর্ম" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখকের যে কথা উপরে উদ্ধৃত হইল তাহাতে লিখিত আছে যে হিন্দুধর্মের সার কি তাহা স্থির করা

* towards any being, implies ascription of a promoting motive of a high kind, and deeds resulting from it: gratitude cannot be entertained towards some thing which is unconscious. So that the "Great Being Humanity" must be conceived as having in its incorporated form ideas, feelings and volitions. Naturally there follows the inquiry. "Where is its seat of consciousness?" It is diffused throughout mankind at large? that cannot be; for consciousness is an organised combination of mental states, implying instantaneous communications such as certainly do not exist throughout Humanity. Where then, must be its centre of consciousness? In France of course, which, in the comtean system, is to be *

কর্তব্য এবং ঐ ধর্মে যাহা সত্য আছে তাহাই হিন্দুধর্ম। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইল আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের সার কি তাহা স্থির করিয়া তাহা সঙ্কলন পূর্বক "ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রন্থ" নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম ভাগে উপনিষদ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক এবং দ্বিতীয়ভাগে স্মৃতি ও মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে নীতি বিষয়ক শ্লোক সকল সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই এক্ষণে যাহারা উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের যে সকল শ্লোক আছে প্রায় তাহাই উদ্ধৃত করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রণালী অনুসারে যদি উক্ত লেখক বেদ, উপনিষদ মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল হইতে আরো অধিক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা হইলে একটি কাজ হয়। "নবজীবন" পত্রিকার "ধর্মজিজ্ঞাসা" প্রবন্ধের লেখক আচার্য গোল্ডষ্টুকরের নিম্নে-লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "If the creed of an individual is founded on texts held sacred, it is a national creed; no nation can surrender it without laying the axe to its own root. For a religion based on Texts believed sacred embodies the whole history of the Nation which Professes it; it is the shortest abbreviation of all that ennobles the nation's mind, is most dear to its memory and most essential to its life."

---

* the leading state; and naturally in Paris to which all the major axes of the temples of Humanity are to point. Any one with adequate humour might raise amusing questions respecting the constitution of that consciousness of the Great Being supposed to be thus localized. But preserving our gravity, we have simply to recognize the obvious truth that Humanity has no corporate consciousness whatever. Consciousness, known to each as existing in himself, is as cribed by him to other beings like himself, and in a measure to inferior beings; and there is not the slightest reason for supposing that there ever was, is now or ever will be, any consciousness among men save that which exists in them individually. If them, the Great

যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির ধর্ম, জাতীয় পবিত্র গণ্য ধর্মগ্রন্থের শ্লোকমূলক হয়, তাহা হইলে তাহা জাতীয় ধর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কোন জাতি আপনার পায়ে কুড়াল না মারিয়া সে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে ধর্ম জাতীয় ধর্ম গ্রন্থের শ্লোকমূলক তাহাতে সেই জাতির পূর্ব পুরাবৃত্ত সংক্ষেপে পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোক সকল জাতীয় মনের মহত্ত্ব-সম্পাদক সমস্ত পদার্থের সংক্ষিপ্তসার। উহা ঐ জাতির স্মৃতির অত্যন্ত প্রিয় বিষয় এবং উহা তাহার জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।" আচার্য গোল্ডষ্টুকর যে সকল শ্লোকের কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদিগের ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। উক্ত গ্রন্থ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে। এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইল প্রচারিত আছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতের কোন চর্চাই ছিল না এবং ভট্ট মোক্ষমূলর এবং গোল্ডষ্টুকরের এত প্রাদুর্ভাবই ছিল না। উহা একেবারে ছাটিয়া ফেলিয়া সকলই নূতন করিতে চেষ্টা করা "নবজীবন সম্পাদকের পক্ষে উচিত হয় নাই। এইরূপ করিয়া যদি পূর্বে যাহা হইয়াছে তাহা ছাঁটিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কার্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। "নবজীবন" সম্পাদক যদি এইরূপে পূর্বে যাহা হইয়াছে তাহা ছাটিয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি যে সত্য উদ্ভাবন করিবেন পরবংশের লোকেরা তাহা ছাটিয়া ফেলিতে পারে। ধর্ম সংস্কার কার্যভূতকালের সঙ্গে যোগ রাখিয়া সম্পাদন না করিলে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

"নবজীবন" সম্পাদক একস্থানে আমাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এক্ষণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য ফুরাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "তত্ত্ববোধিনী"তে যে সকল প্রাণীতত্ত্ব জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।" তত্ত্ববোধিনীতে জড়তত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব কচিৎ কখন প্রকাশিত হয় কেবল তাহাই কি সাধারণে পাঠ করেন? আর আচার্যের উপদেশ প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তাব প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে তাহা কি কেহ পাঠ করেন না? ইহা অতি অযথার্থ কথা।

"ধর্মজিজ্ঞাসা" প্রবন্ধ লেখক তাহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন "যে ধর্মের

Being who is the author of all these consequests is unconscious, the emotions of veneration and gratitude are also lutely irrelevant. See Nineteenth Century July, 1884.

তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্মে সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী সেই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ"। হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মই এই সকল লক্ষনাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে তাহা সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক এমন অন্য কোন ধর্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির উপযোগী এমন অন্য কোন ধর্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

'তত্ত্ববোধিনী' ভাদ্র ১২৯৩

একটি পুরাতন কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেকেই বলেন, বাঙ্গালীরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে পরামর্শ দেন practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, "হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে।" আমি তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশী আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোণার যেমন ভাল মজবুত গহনা গড়ান যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারে কাজ চলে না তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা Sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যক-মত দুই-একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্য-সাধন করিয়া লয় তাহারা practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙ্গালীদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙ্গালীরা বিস্তর কাজে লাগে, কিন্তু কোন কাজ করিতে পারে না। চাকরি করিতে পারে; কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। practical লোক দেখে ফল কি,—প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিত্ত সেই-ই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভাল বাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না; সে অতি সাবধান সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু

ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়—সুতরাং "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সঙ্কুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এই জন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানতা ও বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্যহেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না। ভয় হয় পাছে কার্যসিদ্ধ না হয়—এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়ত অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়।

আমি সাবধানিতা বিজ্ঞতার নিন্দা করি না, তাহার আবশ্যকও হয়ত আছে। কিন্তু যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কি! তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমেশে বিজ্ঞতা কেবল বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও দেখা যায় না। শিশু যদি সাবধানী হইয়াই জন্মিত তবে সে আর মানুষ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। কালক্রমে জ্ঞানার্জনশক্তির অশক্ত ডানা হইতে পালক ঝরিয়া যায়—তখন সে ব্যক্তি কোটরের মধ্যে প্রবিষ্ট শাবকদিগকে ডানা ছাঁটিয়া ফেলিতে বলে, ডানার প্রতি বিশ্বাস তাহার একেবারে চলিয়া যায়। এই ডানা যাহাদের শক্ত আছে তাহারাই নির্ভয়ে উড়িয়া চলিয়া যায়। তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত, তাহাদিগকেই জরাগ্রস্থগণ sentimental বলিয়া থাকেন—আর এই ডানার পালক খসাইয়া যাহারা বদনমণ্ডল গোলাকার করিয়া বসিয়া থাকেন, এক পা এক পা করিয়া চলে, ধূলির মধ্যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, চাণক্যেরা তাহাদিগকেই বিজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসীকতা দেশ কালপাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যাত্মিকত অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিল দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলে-খেলা করিতে পারেন না—কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন অন্তরকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি

—আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায় কিন্তু তাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে, সে তাহার মনুষ্যত্বের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবনরক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরে নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্ম-রক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তার আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ, নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা, কৌশল, আপাততঃ প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্বল রুগ্ন হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধা সকল তাহার চতুর্দিকে বল্মীকের স্তূপের মত উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে। কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে। অনন্তের সমুদ্র হইতে দক্ষিণা বাতাস বহিলে তবেই তাহার স্ফূর্তি হয়; তবেই সে বল পায়, তবেই তাহার কুজ্ঝটিকা দূর হয়, তাহার কাননে যত সৌন্দর্য ফুটিবার সম্ভাবনা আছে সমস্ত ফুটিয়া উঠে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য, তাহা চতুর্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়—অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এই জন্যই বলি সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদান গুলির উপর বুদ্ধির কাঁচি চালাইও না। কলসী যত বড়ই হউক না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যাইবে না। তখন যে তোমাকে ভাসাইয়া রাখে সেই তোমাকে ডুবায়।

ধর্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এই জন্যই সে আপাততঃ অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব এমনকি মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধি বিচারের সীমা—কিন্তু ধর্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সমগ্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে! একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষা নিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চির নিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা নিবারণের কারণ বর্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে,

দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্তে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধিবলে কিছুদিনের জন্ম সমাজ রক্ষা হইতেও পারে কিন্তু ধর্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, তাহার আবার আনুষঙ্গিক স্বরূপে চতুর্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্তি, সমাজের সৌন্দর্য ও বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়ন তত্ত্বের সাহায্যে কোনমতে অক্সিজেন গ্যাস নির্মাণ করিয়া কিছুকাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু মুক্তবায়ুতে যে চির প্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা ত বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সঙ্কীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবলমাত্র কম ও বেশী লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক প্রভেদই অত্যন্ত গুরুতর।

ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশু পক্ষী হইতে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর না কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনটা বা অল্পদিনে হয়, কোনটা বা বেশী দিনে হয়।

এই জন্যই বলিতেছি—মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তম আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিবৃত সত্য, সঙ্কীর্ণ সত্য, আপাততঃ সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থা বিশেষের উপর নহে—সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙিয়া যায় —তখন বিসর্জিত দেব প্রতিমার তৃণকাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানাছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এর জন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি; অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার সাহায্য করিবে, এই জন্যই পরের সাহায্য করিব—তবে কখনই পরের ভালরূপ সাহায্য করিতে পার না, ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনই অধিকদিন টিকিবে না। কিসের বলেই বা টিকিবে! হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এতদিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে

গিয়াছে, তাই সে এত গভীর,এত প্রশস্ত; আর গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড় জোর কলিকাতা সহরের ধুলাগুলি কাদা হইয়া উঠিত আর কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালে দুই কলসী অধিক জল তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না—আর কেবল মাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক —একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবী বেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এইজন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধি বিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনী করিতে ইচ্ছা যায় না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তি ভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ Practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ। কিন্তু Political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোন ইংরাজ অপদস্থ হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ। কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বলে! উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক

না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মত একটা সুবিধার সুযোগ হইল। কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ ও ন্যায়ানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মত মানুষ হইত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিতে পারিত, তাহার হৃদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া, সংসারের কার্য আমাদের অধীন নহে, আমরা যদি কেবলমাত্র একটি স্চ অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি স্চ গোপন করিবার জন্য আলো নিভাইয়া দিই, তবে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোন উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না। তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্য কিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কায করে। তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজবর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশ্যে যদি একটা আকাশ জোড়া ছাত তুলিয়া ধর তবে সবুজ রং তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেই সঙ্গে লাল নীল রং সমুদয় রং মারা যাইবে, পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই মিলিয়া সরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবল মাত্র Political উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য সমাজের অস্থি মজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য করিতেছে—একটি মাত্র উদ্দেশ্য বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্তন কর, তবে সে শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনই মতিভ্রম বশতঃ একটি সঙ্কীর্ণ হিত সমাজের চক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনই সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদগতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরিউক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কখ

কৌশল ধূর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মত মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুড়ঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসাতল রাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্বথা পরিবর্জ্জব্য।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড় বড় দেউড়ী আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোট ছোট খিড়কীর দুয়ারগুলিই ভয়ানক সেদিকে তেমন কড়াকড় নাই। অতএব বাহির হইতে দেখিতে যেমনই হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলি প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনই আমি মনে করি "লোক হিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই" তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল "সত্য ভাল," সে বিশ্বাস সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় "সত্য ভাল কেন না সত্য আবশ্যক।" সুতরাং যখনই কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভাল। সময় বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভাল এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময় বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, ত আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর। আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভাল।

প্রশ্ন। কেন ভাল? সময় বিশেষে সত্যই যদি ভাল না হয়, তবে লোকহিতই যে ভাল এ কথা কে বলিল?

উত্তর—লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভাল।

প্রশ্ন—কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর—আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

তদুত্তর—কই তাহা ত সকল সময়ে দেখা যায় না। এমন ত দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর—তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন—তবে কাহাকে বলে।

উত্তর—স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর—আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভাল মন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাততঃ অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া

পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী নহে তাহার প্রমাণ কি? প্রবঞ্চনা না করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয়া উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়—কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয় জ্ঞান পূর্বক প্রবল গর্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে সুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর লোকহিত তুমিই বা কি জান, আমিই বা কি জানি! লোকের শেষ কোথায়! লোক বলিতে বর্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোককে আশ্রয় সে কখনই দিতে পারে না। বরং মিথ্যা একজনের কাছে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোক হিতের কথা যদি উঠে ত আমরা এ পর্যন্ত বলিতে পারি, যে সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

এত কথা কি আমি অনাবশ্যক বলিতেছি? এই সকল পুরাতন কথার অবতারণা করা কি বাহুল্য হইতেছে। কি করিয়া বলিব। আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধ-ভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন। কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। একথা কেহ ভাবিতেছেন না, যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন! অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্বল; ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই

বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে? যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মের সেই আদর্শপটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়—সেখানে সেই আদর্শে না জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে, তাই তাহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তাহাই যদি হয় তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দেবে কে? সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে। সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া! তাহার বলের ভাণ্ডার কোথায়! সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাঠিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক এখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন!" কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে,—তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অসীম দেশও অসীমকালে তাঁহার হিত ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে—সুতরাং একটুখানি বর্তমান সুবিধার উদ্দেশ্যে খানিকটা মিথ্যার দ্বারা তালি-দেওয়া লোকহিত তাঁহার কার্য হইতেই পারে না। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছার নিম্নে পড়িলে ক্ষণিক ভাল মন্দ চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার অগ্নিতে সৎ লোকও দগ্ধ হয় অসৎ লোকও দগ্ধ হয়। তাঁহার সূর্যকিরণ স্থানবিশেষের সাময়িক আবশ্যক অনাবশ্যক বিচার না করিয়াও সর্বত্র উত্তাপ দান করে। তেমনি তাঁহার অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীমকাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্বিচারে তাহার নির্দিষ্ট ফল ফলিতে থাকিবেই। আমরা তাহার সমস্ত ফল দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। এই জন্যই আরও অধিক সাবধান হও। ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শে ইহাকে লইয়া খেলা করিও না।

অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক অসত্য

বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এতই সঙ্কুচিত যে অসত্য ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না!

যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কপটতা, সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতে পারে। Practical লোকে যে সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধির বিচার-তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধি বিচার তর্কে আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে নিপুণ হয়—সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গম শিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মত সরল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা-নালা-নর্দমার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধি বিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভ ক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে—বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এই ভাবের সমুদ্রকে বাঁধাইয়া বাঁধাইয়া যাঁহারা কূপ করিতে চান, তাঁহারা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাদের নিজের গুরুভার বিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিন, কিন্তু সমস্ত স্বজাতিকে বিসর্জন না দিলেই মঙ্গল।

আমাদের জাতি নূতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধজাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোন মতেই কর্তব্য বোধ হয় না। তখন ইতস্ততঃ করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্যে ভাঙ্গাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা, তবে উত্তর কালে তাহার জীর্ণ ধূলিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। অল্পবয়সে শরীরের যে কাঠামো নির্মিত হয়, সমস্ত জীবন সেই কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়া চালাইতে হয়। এখন আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই বলিয়া থাকেন, বই বিক্রি করিয়া টাকা হয় না এ সাহিত্যের মঙ্গল হইবে কি করিয়া! বুড়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের টাকার থলি দেখিয়া হিংসা করিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এ বয়সের এ কথা নহে। বই লিখিয়া টাকা নাই হইল! যে না লিখিয়া থাকিতে পারিবে না সেই লিখিবে, যাহার টাকা না হইলে চলে না সে লিখিবে না। উপবাস ও দারিদ্রের মধ্যে সাহিত্যের মূল পত্তন, ইহা কি অন্য দেশেও দেখা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কি কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিলেন? যদি তাঁহার কুবেরের ভাণ্ডার থাকিত রামায়ণ রচনার প্রতিবন্ধক দূর করিতে তিনি সমস্ত ব্যয় করিতে পারিতেন। প্রখর বিজ্ঞতার প্রভাবে মনুষ্য প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারেনা যে উদরের মধ্যেই সাহিত্যের মূল হৃদয়ের মধ্যে নহে। লেখার উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে লেখা মহৎ হইবে না।

যেমন করিয়াই দেখি, সঙ্কীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনই মহত্ত্বের স্ফূর্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসারতরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি ধ্রুব বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সঙ্কোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচরণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন

ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাসই করুন sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন বা শ্রীকৃষ্ণেরই দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক, আত্মহিতই হউক লোকহিতই হউক মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভাণ করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না,—সত্যকে আশ্রয় করিয়া মস্তক উন্নত হইয়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভাল, তবু মিথ্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সুবিধার গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিপ্রায়ে আপন কবর রচনা করিব না।

'ভারতী' ১২৯১ অগ্রহায়ণ

আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম, "একটি পুরাতন কথা"। বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্ন স্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।

তবে যে এই কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে, "নবজীবন" প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও

প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পালটাইয়া দিতে বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম —যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি-ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায়

প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী—সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় "নূতন ধর্মমত" ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি। উহাতে "নাস্তিক" "জঘন্য কোমৎ মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রযুক্ত, ইংরেজরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধ লেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন "যে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ।" হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা) ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম—সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও

নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে, একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুরমহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইঁহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসন পত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্‌স্‌মূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, লাউদার্জি, মেইন, মিউ, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।"* নব্যভারত—ভাদ্র ২২৫ পৃষ্ঠা

এখন, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই, তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালি-গালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালি-গালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির

* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে, প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সংবাদ পত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোঁহাটার ভাব এতদূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্রবাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর যেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্রবাবু বলেন, যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে, কে আমাদের দেশের মূল্য * লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ—৩৭১পৃঃ)

সর্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়িস্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি

* বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত ; তারপর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণ স্বরূপ "একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা।" সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন, যে "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোস গুণ বর্ণনা করিয়াছি। একজন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ি তাহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" ইহাকে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তারপর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে ?

এই দুইটি কথা "অসত্য" বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের লেখকের বাক্য-বলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত, যে আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না।

এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি, বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। "যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।" এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায়, একটি "চতুষ্কোণ গোলক।" তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্রবাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, "এমন" কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্রবাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন, যে আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন, "অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।" কাজটা রবীন্দ্রবাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর, অনেকবার রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এতদিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্রবাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে, অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া

কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা। অর্জ্জুন বলিলেন, না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া, অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জ্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে, "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য"—চ্যুত হবেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল—জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পাশে দাড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এমন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয় একটু বুঝাই।

রবীন্দ্রবাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, Truth, মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজীর অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদ পরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। "সত্য" "মিথ্যা" প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে সত্য Truth আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞারক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজী কথা আছে—"Troth"। ইহাই Truth শব্দের প্রাচীনরূপ।

এখন, Truth শব্দ Troth হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটিও এখন আর বড় ব্যবহৃত হয় না। Honour, Faith এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা Truth রবীন্দ্রবাবুর Truth তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ-প্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে, যে আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কিনা, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্রবাবু, "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, যদি "বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্মসমাজকে জড়াইতেছ কেন?" এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচি বিগর্হিত, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি,

ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘৃণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তারপর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্মসমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে কিনা, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ, আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বিবাদে বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি

কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিস, এদেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্যতঃ সমুদ্র প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, "Lie direct" সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না * দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।

'প্রচার' ১২৯১ অগ্রহায়ণ

* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃঃ

কৈফিয়ৎ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে "পুরাতন কথা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে "আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিম বাবুর কতকগুলি কথা ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এই জন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু আনুষঙ্গিক যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু বলেন "রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরেজী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজীর অনুবাদ করি নাই * * * 'সত্য' 'মিথ্যা' প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।" বঙ্কিমবাবু যে অর্থ মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি। "যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ—সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না বা প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম।—এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া "আরো কিছু"-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদ পরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খ্রীষ্টান হইব—আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি—দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত :—"সত্য" বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না। সত্যপালন বা সত্যরক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায়। কেবলমাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়ত :—বঙ্কিমবাবু "সত্য" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি "মিথ্যা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে—কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধকরি প্রচলিত নাই—আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আরেকটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "যদি মিথ্যা কথা কহেন"—সত্য রক্ষা না করাকে "মিথ্যা কথা কওয়া" কোন পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন খ্রীষ্টয়ানই হউন স্বাধীন চিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদ পরায়ণই হউন "মিথ্যা কথা কহা" শুনিলেই তাহার প্রত্যহ প্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জ্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখনও তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জ্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না। তাহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না,

কোন প্রকার সত্যের ভাণও করেন নাই। আমি যদি বলি যে, "আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব" ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে কোন্ নৈয়ায়িক আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়—আমি যখন বলিয়াছিলাম, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে, কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম, অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জ্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতা সত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধা প্রযুক্ত করিতে পারিলেন না—মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্যবুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে "মিথ্যা কথা কহা" বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজন-খ্যাত দ্রোণপর্বস্থ কৃষ্ণের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না। তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহাই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য।

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ—সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না বা প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম।—এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া "আরো কিছু"-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদ পরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খ্রীষ্টান হইব—আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি—দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত :—"সত্য" বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না। সত্যপালন বা সত্যরক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায়। কেবলমাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়ত ঃ—বঙ্কিমবাবু "সত্য" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি "মিথ্যা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে—কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধকরি প্রচলিত নাই—আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আরেকটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "যদি মিথ্যা কথা কহেন"—সত্য রক্ষা না করাকে "মিথ্যা কথা কওয়া" কোন পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন খ্রীষ্টিয়ানই হউন স্বাধীন চিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদ পরায়ণই হউন "মিথ্যা কথা কহা" শুনিলেই তাহার প্রত্যহ প্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখনও তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না। তাহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না,

কোন প্রকার সত্যের ভাণও করেন নাই। আমি যদি বলি যে, "আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব" ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে কোন্ নৈয়ায়িক আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়—আমি যখন বলিয়াছিলাম, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে, কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম, অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জ্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধা প্রযুক্ত করিতে পারিলেন না—মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্যবুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে "মিথ্যা কথা কহা" বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাপ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজন-খ্যাত দ্রোণপর্বস্থ কৃষ্ণের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না। তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহাই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য।

বিশেষতঃ সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। "হুত ইতি গজে"র কথা সকলেই জানে, কিন্তু পাণ্ডবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোন অর্থ সহজেই প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেই জন্যই বঙ্কিমবাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু। এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বঙ্কিমবাবু এস্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা কথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোন মতেই বোধ হয় না। কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম "লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "প্রথম 'কল্পনা' কথাটি সত্য নহে। অমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি একথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই, যে তাহা হইতে এমন অনুসন্ধান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, 'কল্পনা' নহে। আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুইজন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট আরেকজন আচার ভ্রষ্ট। ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু আমাকর্তৃক আলোচিত আচার ভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখ স্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখ কালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেকস্থলেই দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি এইরূপ অনুমান করিয়া থাকি

তবে তাহা তরুণ বয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদার হৃদয় মহাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন—"তারপর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?"

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম "তিনি একটি 'হিন্দুর আদর্শ' কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা ও একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা উভয় অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা—ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শ স্থল মনে করি নাই, বঙ্কিমবাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে বঙ্কিমবাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে ভুল হইয়া গেল তাহা নহে; ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন চিত্রের প্রতি তিনি (জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শ স্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিমবাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষেগুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে কোন একটি চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা, কেহ বলিতে পারেন যে আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিমবাবু যদি মহত্তম

আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোন একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি ছিল। কিন্তু হিন্দুর দোষগুণ নাই। আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিমবাবুর নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন "যেখানে লোক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়",—সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—এত আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিমবাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন "প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে" সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কিনা জানি না; যদি থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "লোকহিত" শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এইজন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গিয়াছে। সানন্দে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই অন্য যাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাহাকে গালিদিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজনতুল্য, তিনি আমাপেক্ষা কিসে না বড়? আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে! তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবলমাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার ত কথাই নাই, আঁষ্‌টে গন্ধটুকু পর্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে। তাহা আক্ষেপ-উক্তি। মেছোহাটাই বল আর প্রার্থনামন্দিরই বল আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আমদানি করি নাই—আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারিনা—হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার

মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—প্রথম সংখ্যক প্রচার বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? মূল কথাটির সহিত তাহার কি যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। দুর্বল স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ উক্ত কয়েক ছত্রের গুণরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তির মুখে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে প্রচার আসিবামাত্র যে কোন দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য ভাল করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধের মর্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোন অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোন দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম এখন আর দুই একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি বিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখা-মুখী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্তব্যকাব সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই ; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই, যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণ মাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাহাদের মত প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন তবে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাকে কোন পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভাল, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ব-বোধিনীতে বঙ্কিমবাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ নব্য হিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিমবাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা "জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের" কোন যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতররূপে আক্রমণ করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোন অধিকারই নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপ্যুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায় ? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্ম সমাজের হইয়া লিখি নাই।*

* সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিমবাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন ? যদি বলেন যে *

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ বিদেশী-দেশী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ প্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দু হৃদয় বিসর্জন দেন নাই—এইজন্য চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহার শিরে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার গাম্ভীর্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদিব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতা বশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্যভাব গ্রহণ না করেন।

'ভারতী' ১২৯১ পৌষ

বঙ্কিমবাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথবাবুতে আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিমবাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

উত্তর ভাগ : রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সম্পাদক,

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু আধুনিক শিল্পকলা নামে যে প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনে'র গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন সেটা পড়ে দুচার জায়গায় আমার ঠেকলো।

ফণীবাবু বলছেন—প্রথমে কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এবিষয়ে আন্দোলন সুরু করিলেন। হ্যাভেল সাহেবকে আমি গুরুতুল্য মনে করি কিন্তু ব্যাপারটার আন্দোলন তিনি সুরু করেন না বলতে আমি একটুও ইতঃস্তত করবো না, কেননা আমি জানি কোথা থেকে কি হল।

হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলে আসার পূর্বের কথা হচ্ছে তিনি মাদ্রাজের আর্ট স্কুলটাকে দেশী শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলেছেন। কলিকাতার সে সময়ের কথা রবি-কাকা মহাশয়ের 'বালক' বলে পত্র 'সাধনা' বলে পত্র এবং 'চিত্রাঙ্গদা' বলে কাব্য তিনি চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলার কল্পনা করে আমাকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের আর্ট স্কুল ও আর্ট স্টুডিও দুই স্থান থেকেই ইঙ্গবঙ্গ ছবি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। আর্ট গ্যালারীতে বিলাতী ছবিই দেখা যায়, দেশী ছবি একটিও নেই। সে সময়ে 'স্বপ্নপ্রয়াণের' ছবি ঈশ্বরী প্রসাদ বলে এক হিন্দুস্থানি কারিগরের দ্বারায় লিথোগ্রাম করে সাধনাতে দেওয়া হল। এবং রবিকাকার উপদেশ মতো বৈষ্ণব কবিতা সমস্ত পড়ে আমি দেশীয়ভাবে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা সুরু করে দিলেম। সেই সময় রবিবর্মার একসেট্ ছবি সর্বপ্রথম রবিকাকার কাছে দেখি এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে আমার হাতে বিলাত থেকে ওদের সাবেক প্রথায় আঁকা আল্‌বম এবং দেশী শিল্পীদের আঁকা আর একটা ঐরূপ আল্‌বম আমার হাতে পড়ে। এই শেষোক্ত দেশীয় চিত্র সংগ্রহ দেখে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর "দিল্লীর চিত্রশালা" একটি প্রবন্ধ লেখেন ও রবিকাকা সেটি সাধনাতে প্রকাশ করেন। সাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় সূত্রপাত এইভাবে হল। তোমরা শুনে অবাক হবে কৃষ্ণলীলার কুড়িখানা ছবি শেষ করতে তখন

আমার পুরো একবৎসর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যার সময় রবিকাকার খামখেয়ালী মজলীসে সংগীত, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক এরই চর্চা, এই যখন চলেছে নিয়মিতভাবে, বলতে পার অনিয়মিতভাবে তখন এলেন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতায়। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্টস্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয়, আমি কোনো কালেই আর্টস্কুলে ভর্তি হইনি। আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় আমার কৃষ্ণলীলার ছবি নিয়ে। এবং সেই সূত্রে মোগল শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, বিশেষ করে তাঁরি সাহায্যে আমার ঘটলো, সেইজন্যই আমি তাঁকে বলি আমার গুরু; কিন্তু হ্যাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন collaborator বলেই, স্নেহ করে কখন বা বলতেন chela। বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন, বাংলার আর্টিস্ট সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চললো কতদিন—তারপর ভারতশিল্পের নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী, অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী, কুমার স্বামী, উডরফ সাহেব, হ্যাভেল সাহেব এবং Indian Society of Oriental Art দেখা দিলেন পরে পরে। হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হয়ে চলে যাবার পরে যখন একা আমি ছাত্রদের এবং জনকতক ইংরাজ বন্ধুদের নিয়ে আমাদের আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় ফিরছি এবং গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আর্টস্কুলের বাহিরে এসে পড়েছি সে সময়ে শান্তিনিকেতন এতটুকু একটি টোল বা পাঠশালা মাত্র। আমি একদিকে চলেছি রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে। Oriental Art Society-কে সম্বল করে চলতে চলতে একটা দিন এমন এল যে দেখলেম আমি যে ভয়ে আর্টস্কুল ছেড়ে বার হলেম সেই ভয়ই গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন Art Society আর্টিস্ট পাখি-পোষার একটা খাঁচারূপে পরিণত করে দিয়ে গেল।

ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে রবিকাকার অভয় এল আর্টিস্টদের জন্য। বিচিত্রা ভবন সৃষ্টি হল কলিকাতায়। তার পরের কাজ শান্তিনিকেতনের আলো

১৩৩২ চৈত্র সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় কালীন্দ্রনাথ বসু 'আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবকে দেশী—চিত্রকলার প্রচারে প্রথম আন্দোলনকারী বলে পরিচয় দেন। আলোচ্য পত্রে অবনীন্দ্রনাথ সেই উক্তির ভ্রান্ততা নিরসন করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও তিনি কিভাবে প্রথম কবির গ্রন্থগুলি এবং সেই সঙ্গে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্র চিত্র-শোভিত করবার প্রয়াস পান তার পরিচয় দিয়েছেন।

আর বাতাসে খেলা আর্টিস্টদের জন্যে দেশের বুকে ছোট্ট বাসা করা রবীন্দ্রনাথের দান ভারতীয় শিল্পে শিক্ষার্থীদের জন্য! তাঁহার পঞ্চষষ্ঠিতম বৎসরের উৎসব শুধু তো ছবি নিয়ে নয়—কবিতা নাটক আর্টের যে আর তিনটে দিক সঙ্গীতও তাও নিয়ে।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।

এই ক'টি পংক্তিতে কবি নিজেই নিজের অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবনব্যাপী কবিতা ও সঙ্গীত সাধনা এরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। সত্তর বৎসরের মধ্যে হয়ত দশ বৎসর বয়সে তিনি এই ধ্বনি নিজে অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিলেন,—কে জানে,—"আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে"। তারপরে হয়ত আর দশ বৎসরের মধ্যে অপরকে শোনাতে পেরেছিলেন ; সন তারিখ ঠিক দিতে পারব না,—"আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে।" তারপর থেকে সে ধ্বনি—প্রতিধ্বনির প্লাবনে বঙ্গদেশ ভেসে গেছে, দেশ-বিদেশে তার "তরঙ্গ-আঘাত" গিয়ে পৌচেছে, সে-কথা সকলেই জানে।

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন মাঝে।"

আমরা ছেলেবেলা থেকে এই সঙ্গীতের আবহাওয়াতেই মানুষ, সুতরাং নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করা শক্ত। আর বিচারাসনে বসবার ধৃষ্টতাও আমার নেই। কথা ফোটবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী গাইতে আরম্ভ করেছি—"গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে।" বেশ মনে আছে, তখন "ইন্দু" কথাটার মানে জানতুম না, অথচ সিমলা পাহাড়ে বসে গেয়ে যাচ্ছি—"ঢালে ইন্দু অমৃত-ধারা।" তারপর আমাদের একটি স্বনামধন্য বন্ধু ও শ্রোতা বোধ হয় পরীক্ষাচ্ছলে যে-অজ্ঞতা ধরতে পেরে আমাকে "ইন্দু" কথাটির মানে আর মজা খাবার সদুপায় দু'টোই এক-সঙ্গে শিখিয়ে দিলেন ; আর আজ পর্যন্ত সে দু'টোর কোনটাই ভুলিনি। তারও আগে, কিম্বা অনতিপরে, পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের গান "প্রেমের কথা আর বোল না" লোকের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গাইতুম, আর "ছোট মুখে বড় কথা" শুনে লোকে হাসত মনে পড়ে। তবু তারা জানত না যে, বাড়িতে আমরা কচি মেয়েরা আর অপোগণ্ড শিশু দিনেন্দ্রনাথ তথৈবচ "নিবার নিবার প্রাণের ক্রন্দন, কাটছে কাটছে এ মায়া বন্ধন" এমন বয়সে গাইতেন, যখন আহারের জন্য সে ক্রন্দন, এবং নিদ্রার জন্যই সে-মায়া হওয়া সম্ভব। তখনকার প্রচলিত গৃহনাট্য "মানময়ী" থেকে "এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারিনে"—অম্লানবদনে নির্বিকার চিত্তে গেয়ে বেড়াতুম। এই "মানময়ী" এবং পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত "বসন্ত উৎসব" গীতিনাট্যই আমাদের জীবনের প্রথম নাট্যস্মৃতি। "ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল" হচ্ছে শেষোক্তের প্রথম গান। একবার সখী সমিতির অধ্যক্ষতায় উক্ত নাট্যাভিনয়ের সময় আমার বুদ্ধিমান ভাইরা পশ্চাৎপটের উপর শুখ্‌নো ঘাসের আস্তরণে ডিমের খোলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে জোনাকীর নকল করতে গিয়ে কি-রকম অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছিলেন, সে-কথা ভোলবার নয়, এবং সহজেই অনুমেয়।

'বিবাহ উৎসব' নামে আর একটি ছোট গীতিনাটিকা আমাদের অর্ধ শতাব্দীর পূর্ব স্মৃতির প্রথম পরিচ্ছেদ অধিকার করে, তার গান সম্পূর্ণ রবীন্দ্র রচিত বা রবি-জ্যোতির সম্মিলিত রচনা, তা' ঠিক মনে নেই কিন্তু বাড়ির কোন বিশেষ বিবাহের বাসরঘরে সেটা অভিনীত হবার সময় কনে—বেচারি হিস্টিরিয়া-রোগে মূর্ছিত ছিলেন, এবং গাঁটছড়া বাঁধা বর বেচারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একলাই অভিনয় উপভোগ করছিলেন, এটুকু মনে আছে। আর একটা বিবাহ-সংক্রান্ত নাটক বহুকাল পূর্বে রবি কাকা ও জ্যোতি কাকা মশায় দু'জনে অতিথি-সৎকারার্থে বৈঠকখানায় অভিনয় করেছিলেন মনে পড়ে। তখন আমরা নিতান্ত ছোট; এত ছোট যে, আমার দাদা কোন বিশিষ্ট অতিথির ভাবোল্লাসের চোটে তাঁর কোল থেকে পড়ে গিয়ে চৌকীর তলায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সেটা ঠিক পুরোদস্তর নাটক নয়, কেবল বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে যেন কবির লড়াইয়ের উতোর এবং চাপান; তবে লোকে খুব তারিফ করেছিল শুনতে পাই। এ সব পুরনো গান ও নাটকের আজকালকার বাজারে যে দরই হোক্, আমার মনে হয় ইতিহাসের খোরাক হিসেবে এগুলি উদ্ধার করে লিখে রাখা উচিত।

আমাদের বাল্যস্মৃতির গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই ভাইকে সঙ্গীত ক্ষেত্রে আলাদা করে দেখা শক্ত, সে-কথা বোধ হয় 'জীবনস্মৃতি'তেও

আছে। হয় ইনি গান বাঁধছেন, উনি তাতে সুর দিচ্ছেন, নয় উনি ঝম্‌ঝম্‌ করে' পিয়ানোর গৎ তৈরী করছেন, ইনি তাতে কথা বসাচ্ছেন। ওঁদের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও চট করে সুরে কথা যোজনা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এঁদের তিনজনের সংযুক্ত রচনার পুরনো খাতা হয়ত এখনো শ্রীমান রথীন্দ্রের কাছে খুঁজলে পাওয়া যায়। পুরাতনের মূল্য না থাকলেও মোহ আছে, এ কথা কে অস্বীকার করবে? আমার এক নিকটাত্মীয় বলেন যে, 'জ্যোতিকাকা মশায়ের সেইসব গৎ এখনকার jazz-এর পূর্বপুরুষ। কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

আমি যখন ইতিহাস লিখছিনে, কেবল যদৃচ্ছাক্রমে স্মৃতিপট থেকে ছবি উদ্ধার করছি, তখন আগেকার কথা পরে বললেও দোষ নেই। মনে পড়ে' গেল যে, কবি সতের বৎসর বয়সে যখন বিলেত যান, তখন থেকে তাঁর ইংরাজী গানে হাতে-খড়ি। "Won't you tell me, Mollie darling" এবং "Darling, you are growing old," এই দুই সেকেলে গানের সুর "বহু যুগের ওপার হ'তে" আমার কানে ভেসে আসছে। তারপর যখন আমার পিয়ানো বাজাবার সময় হল, তখন "If", "Come into the garden, Maud", "Goodnight Goodnight, beloved," "Goodbye, Sweetheart, Goodbye" প্রভৃতি কত রকম ইংরাজী গানই তাঁর সঙ্গে বাজিয়েছি। Tom moorc-এর Irish Melodies ও আমাদের পুরনো বন্ধু তার কতকগুলি সুরে বাঙলা কথাও বসানো হয়েছিল। যখন তিনি বলেন :—

"Oh, the heart that has truly loved, never forgets,
But as truly loves on to the close,
As the sun-flower turns to her god when he sets,
The same look as she turned when he rose !"

তখন সত্য হোক্ বা না হোক্ শুনতে ভাল লাগে নিশ্চয়ই।

ইংরেজ জাত ব্যবহারে যতই রুক্ষ হোক্ তাদের গান যে ভাবে গদগদ, তা উক্ত নামেতেই প্রকাশ। Goodbye Sweetheart-এর প্রথম ক' লাইন :—

The sun is up, the lark is soaring,
Loud swells the song of chanticleer,
The leoret bounds o'er earth's soft floor ng
Yet I am here—ye-e-et I am here !

 ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

যেন কোন্ মগ্ন চৈতন্য থেকে উঠে এল। এর মধ্যে যে ক'টি পশু-পক্ষীর উল্লেখ আছে, অবসর বিনোদনার্থে প্রভুরা যেগুলির প্রাণপাতপূর্বক উদারসাৎ করতে দ্বিধা বোধ করেন না, ভাবলে কবিত্বের আবেশ কিছু কমে আসে অবশ্য। আর যাই হোক, আমরা কোকিলের পঞ্চম স্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবার পরমুহূর্তেই কোকিলের চচ্চড়ি রেঁধে খাইনে!—যদিও কোকিল-ভাজা খেলে গলা মিষ্টি হয়, লোকে বলে! যা হোক্, এরূপ অ-কবিজনোচিত খাদ্যে পুষ্ট না হয়েও কবি যে ভগবদ্দত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তার সাক্ষী সেই কণ্ঠাবশেষ। প্রথম বয়সে তিনি মধ্যমে, বা পঞ্চমে ছাড়া কখনো গান ধরতেন না, এবং অবলীলাক্রমে তারা সপ্তকের "হি" পর্যন্ত গলা চড়াতে পারতেন; যদিও সাধারণতঃ আমাদের গানে দেড় সপ্তকের বেশী লাগে না। যাঁরা সেকালে তাঁর "অনন্ত সাগর মাঝে" বাগেশ্রীর গান শুনেছেন, তাঁরাই আমার কথার সমর্থন করবেন। আজও যে "মরা হাতী লাখ টাকা" তার পরিচয় সেদিন তিনি 'নবীন' রঙ্গমঞ্চেও দিয়েছেন। তফাতের মধ্যে তখন যা শুনলে আনন্দ হত, এখন তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনলেও ভয় করে, মনে হয় কাজ ঠিক হচ্ছে না।—

"জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।"

ইংরিজী গান গাইবার অভ্যাস তার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল; অন্যান্য দুই-একটা য়ুরোপীয় ভাষার সঙ্গীতও চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানের উপর বিদেশী সুরের প্রভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, সেটা আশ্চর্যের বিষয়। সশরীরে যে বিদেশী সুর নিয়েছেন তা' নিয়েছেন বা ভেঙেছেন, যথা 'কালমৃগয়া' বা 'বাল্মিকী-প্রতিভার' "সকলি ফুরালো", "কালী কালী বল রে আজ" ইত্যাদি। কিন্তু নিজে যে সুর বসিয়েছেন, তাতে সামান্য ছায়া ছাড়া সম্পূর্ণ বিদেশী ঢঙ খুব বেশী নেই বলে আমার বিশ্বাস। এইখানে না বলে থাকতে পারছিনে যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য নিদেন আমার চোখে ত' আর পড়েনি। কেবলমাত্র গানে অমন সরসভাবে গল্প বলা, অমন চটপট ঘটনা এগিয়ে দেওয়া, অমন বিচিত্র রস ব্যক্ত করা, যে-কথার যে-ভাব তাতে অবিকল সেই ভাবের সুর যোজনা করা,—একাধারে আদর্শ গীতিনাট্যের উপযোগী এতগুলি গুণ এ দেশের আর কোন নাটকে আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় ত দেখতে পাইনি। ছেলেবেলা থেকে কতবার এ নাটকের অভিনয় ঘরে-বাইরে দেখলুম, পুরুষানুক্রমে কত বাল্মীকি, কত সরস্বতী এল গেল, কিন্তু নাটক নিত্য নবীন রয়ে গেল, কখনো

পুরনো হল না; প্রত্যেকবার সেই একই আনন্দের সঞ্চার করে। অত অল্প বয়সে অমন সুন্দর গীতিনাট্য রচনা করতে পারাই কবির প্রতিভার প্রথম পরিচয় বলা যেতে পারে। নাম-ভূমিকায় অবতরণ করে অভিনেতা রূপেও বোধ হয় তিনি প্রথম যশস্বী হন।

বিদেশী সঙ্গীতের স্রোতে তিনি যে গা ভাসিয়ে দেননি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়িতে ভাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবেত্তার যাতায়াত ছিল। যদু ভট্ট, মৌলাবক্স, এসব নাম আমাদের কানে শোনা মাত্র হলেও, তাঁদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন, এবং এঁদের কাছে হিন্দুসঙ্গীত শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী আমাদের কাল পর্যন্ত সে-সঙ্গীতের জের টেনে এনেছিলেন, এবং তারপরে নানা দেশে নানা ভাল মন্দ ওস্তাদ শোনবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়েছে। সুতরাং কোন বিশেষ ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিক্ষা না পেলেও সবসুদ্ধ হিন্দু-সঙ্গীতের মূলনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল এবং ভাল হিন্দী গান-বাজনা শুনতে তিনি খুবই ভালবাসেন, তা সকলেই জানেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্ম-সঙ্গীত সকল প্রকার হিন্দী সুরের একটি রত্নাকর বিশেষ, তা মন্থন করলে হেন হিন্দী রাগ-তাল নেই যা পাওয়া যায় না। এবং তার দ্বাদশ ভাগের প্রথম তিন ভাগ বাদ দিলে, শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই বোধ হয় রবীন্দ্ররচিত। স্বদেশের ভাণ্ডারে এই সঙ্গীত ব্রাহ্ম-সমাজের একটি অপূর্ব এবং অক্ষয় দান, যার যথার্থ মূল্য কালে নিরূপিত হবে। পূর্ব দুই ভাগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলির একটি চয়নিকা স্বরলিপিসহ প্রকাশ করা ব্রাহ্ম-সমাজের একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ, যা' আর বেশী দেরী করলে হয়ত কোনকালে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

কবির গানের সঙ্গে যাঁর কিছু মাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, তিনি হিন্দী গানের গঠন-প্রণালী সর্বদা মেনে চলেন; অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ গানে আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চার ভাগের ব্যতিক্রম করেন না। রাগরাগিণীও বজায় রাখেন, তবে অনেক সময় ইচ্ছামত মিশ্রিত করেন। মিশ্ররাগ আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু কালক্রমে যে কয়টি মিশ্রণ প্রচলিত হয়ে গেছে, তদতিরিক্ত কিছু করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত কানে খটকা লাগে। সব নূতন জিনিসেরই এই ধাক্কা সামলাতে হয়,—পহিলা সামাল্না মুস্কিল হে। আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম দিক্‌কার গানে মিশ্রণ কম। শেষেরগুলিতেই সেদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন;

 ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

বিশেষতঃ "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গানে ভৈরোঁ (টোড়ী ?) ও বিভাস মিশিয়ে বাঘে-গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে, বর্ণ-সঙ্করের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন।

তানকর্ত্তব নেই বলে' লোকে মনে করে কবিবরের গান শেখা সোজা, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম মীড় ও খোঁচখাঁচ বজায় রেখে গাওয়া মোটেই সোজা কাজ নয়; তার সাক্ষী বোধ হয় তাঁর গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রছাত্রীগণ দিতে পারবেন। মুস্কিল এই যে, স্বরলিপিতে সে সূক্ষ্ম কারীগরী দেখানো শক্ত, এবং দেখেও না-দেখা সহজ; আজকাল আমরা সকলেই সহজিয়াপন্থী। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান শিখ্‌লে ফল সব সময় ভাল হয় না, বিশেষ শিক্ষানবীশের বেলা। অথচ স্বরলিপিই গান-প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়; সকলের ত' শান্তিনিকেতনে গিয়ে শেখবার সুবিধে হয় না। তবে যাঁরা সে সুযোগ পান, তাঁদের সেটা অবহেলা করা উচিত নয়, যদি নির্ভুলভাবে কবির গান শিখ্‌তে চান। এইখানে গোপনে বলে রাখি যে, তিনি নিজের গান নিজেই অনেক সময় মনে রাখ্‌তে পারেন না, তাই শ্রীমান দিনেন্দ্রই সে-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট—অন্ততঃ আধুনিক গান সম্বন্ধে।

তাল সম্বন্ধে তাঁর তত বৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁক নেই, মামুলী তিন ও চারের সরল ছন্দেই তাঁর আশ মেটে। শ্রীমান দিনেন্দ্রকে নাকি একবার তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে, "আমি যে গানই তৈরী করি তুই বলিস্ তার তাল কাশ্মীরী খেমটা!" গুরু-গম্ভীর রাগরাগিণীকে নাচিয়ে তোলবার তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা একেবারে চাপা পড়েনি। "নবতাল" (নিবিড় ঘন আঁধারে) এবং "একাদশী" (দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া) তালের নূতনত্ব তার নামেই প্রকাশ, এবং "ঝম্পকে" ঝাঁপতাল উল্টে ফেলাতেও বোধ হয় তাঁর কিছু হাত আছে। তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে গানের ছন্দ বা তাল সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য নিজেই বলেছেন।

তান সম্বন্ধেও যেন সম্প্রতি কবির একটু একটু শখ দেখা যায়, পাখার ছানা যেমন প্রথম উড়তে শিখে অল্প দূর উড়ে আবার মাটিতে পড়ে, তেমনি আজকাল এক-একটা গানে ছোট ছোট তাল সংযোগ করবার ইচ্ছে যেন তাঁর মনে জেগেছে বলে বোধ হয়। তার দৃষ্টান্ত "বাদল মেঘে মাদল বাজে"-র প্রত্যেক কলির শেষে, এবং অন্যত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর সুরও যেমন, সে তানও তেমনি, গানের অঙ্গাঙ্গী সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি,—সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত,—তার

উপর আর কোন গাইয়ের হাত (অথবা মুখ) চলবে না। এইখানেই তাঁর গানের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব। প্রত্যেকটি একটি ব্যক্তি বিশেষ, শুধু জাতি বিশেষের অন্তর্গত নয়। হিন্দী গান রাগিণী বা জাতিকে ফোটাতে চেষ্টা করে; তাই সেই রাগের পরিধির মধ্যে গায়কের স্বাধীনতা অপরিসীম; কিন্তু কবি নিজের কথাকে সুর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, অথবা সম্মিলিত সুর ও কথায় 'গান' নামক এক একটি পরিচ্ছিন্ন মূর্তি গড়তে চেষ্টা করেন, যার উপর স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্ দিয়ে চেহারা বদ্‌লে দেবার পক্ষপাতী তিনি মোটেই নন। হিন্দী গানের কথা সুর ফলাবার অবলম্বন মাত্র। বাংলা গানের সুরকে যে অপরপক্ষে কেবল কথা প্রকাশের বাহন মাত্র হতে হবে, তা' আমি বলিনে। আমি বলি যে, গান এমন এক জিনিস যাতে সুরেরও প্রাধান্য নেই, কথারও প্রাধান্য নেই, কিন্তু দুইয়ে মিলে-মিশে একটা তৃতীয় জিনিস গড়ে ওঠে যার রস আলাদা; যে রস শুধু কবিতায়ও পাওয়া যায় না, শুধু সুরেও পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরোহিত তিনিই, যিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে 'গীতরস' নামক একটি বিশেষ আনন্দরসের সৃষ্টি করেন।

"চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে।"

সেই পিপাসা মেটাবার অফুরাণ উৎস কবির অন্তরে সঞ্চিত, উৎসারিত, উচ্ছ্বসিত, নিত্য বহমান। সেই বাল্যকালের 'বাল্মিকী প্রতিভা'র পর কত যে গীতিনাট্য, কত যে গানে তা প্রকাশ পেয়েছে, তার কি বর্ণনা করব, কত হিসেব দেব! গীতি ও নাট্যগুলি গান হ'লে, গানের সমষ্টি বলে' তবু পথ নির্দেশক চিহ্নরূপে কতকটা ধরা যেতে পারে। 'মায়ার খেলা' বোধহয় ৪০।৪৫ বৎসর আগে রচিত। সেটাও মনে আছে, সখী সমিতির এক মেলা উপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। তাতে মেয়েরা পুরুষ সেজেছিল, এবং মায়াকুমারীদের হাতে বিজলী বাতির ছড়ি একবার জ্বলছিল, একবার নিভছিল। তারপরে সেটা আরও কতবার কত রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রথম প্রমদার করুণ বিদায় সঙ্গীত—"এই লহ, এই ধর, এ মালা তোমরা পর" এখনো সকলের কানে বাজছে; তার তুলনা নেই, তার পুনরাভিনয়ও আর কখনো হবে না। হঠাৎ একটা অবান্তর কথা বলবার ত্রুটি আশা করি মার্জনীয়—প্রথম প্রথম 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র অভিনয়ে পুরুষদের ঢিলে পায়জামা পরানো হতো, কেন কে জানে? কিন্তু ইদানিং বরাবরই ধুতি পরানো

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

হয়, সেটা যে ঢের বেশী সঙ্গত, শোভন ও স্বাভাবিক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাক্ সে কথা। 'কাল-মৃগয়া'ও পুরনো করুণরসাত্মক, তবে শিকারের দৃশ্যগুলি 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রই অনুরূপ। এটিরও পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়, আমাদের ঘরের একটি মেয়ে 'কোথা সে ভাইটি মম' বলেই এত কাঁদল যে, একবার অভিনয় বন্ধ করে দিতে হ'ল; তা ছাড়া অন্ধ মুনিও কিছুতেই নিজের তরুণ ভাগিনেয়কে মৃত মুনিপুত্র সাজতে দিলেন না।

'ফাল্গুনী' থেকে একটা নতুন সুর কবির গীতিনাট্যে প্রবেশ করল বেশ মনে আছে, যদিও তারিখ মনে নেই;—সেটি রূপকের সুর, চিরযৌবনের সুর—চলে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা কতবার কত রকমে প্রকাশ করেছেন, এই সেদিন 'নবীন'-এও বলে গেছেন, 'রাজা', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', এ সবই রূপক নাট্যস্রোতের এক একটি তরঙ্গ, সবই গানে গানে ঝঙ্কৃত, অলঙ্কৃত—মানে খুব স্পষ্ট বোঝা যাক্ বা না যাক্। আমাদের এখন গান নিয়েই কথা। তাছাড়া তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য রচিত 'ঋতু-উৎসব', 'বর্ষা-মঙ্গল' প্রভৃতি প্রকৃতি-নাট্যও এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে, যার প্রতিধ্বনি এই সহরের ইঁটকাঠকেও বৎসরে বৎসরে রঙিয়ে জাগিয়ে তোলে।

ব্যষ্টিগানও তাঁর এক এক সময়কার রচনা হিসেবে এক এক দলে ফেলা যেতে পারে, যথা:—"ওগো শোন কে বাজায়", "মরি লো মরি", "বনে এমন ফুল ফুটেছে"—এ সব এক দল। আবার "নিশি নিশি কত রচিব শয়ন", "এত প্রেম আশা", "আজি শরৎ-তপনে", "হেলা-ফেলা সারা বেলা" এ সব একদল। তখনকার কালে "আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে" এবং "মরি লো মরি"র খুব রেওয়াজ ছিল। 'রাজা ও রাণী' এবং 'গোড়ায় গলদের' গান সংখ্যায় কম হলেও উল্লেখযোগ্য। "শুধু যাওয়া আসা" "তবু মনে রেখো" ইত্যাদি পেরিয়ে "চিনি গো চিনি তোমারে"র দল অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে এসে পড়ে। 'গান' নামে সেকালের একটা বেঁটে মোটা বইয়ে তাঁর সব রকম বয়সের গান পাওয়া যাবে, যদিও সময়োচিতভাবে সাজান নেই, জানিনে সে বই এখনও বাজারে পাওয়া যায় কি না। তাঁর অনেক সুরে বাউল সংগীতের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। গীতিনাট্যের যেমন, গানেরও তেমনি তাঁর একটা অভিব্যক্তি হয়েছে, বলা বাহুল্য। তবে তার গতি নির্দেশ করা তত সহজ নয়। কারও সেকালের

গান পছন্দ, কারও একালের; কারো এ ভাল লাগে, কারো ও। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তিনি নিজে বলেন, তাঁর আগেকার গান ছিল emotional, এখনকার গান হয়েছে aesthetic

যেবার নোবেল প্রাইজ পেয়ে কবি দেশে ফেরেন—বোধ হয় ১৯১৪ সালে (?) এই সময়েই, সেই থেকে যে তাঁর গানের বন্যা খুলে গেছে, সে স্রোত এখনো সমানে বইছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, দম নেই, সময় নেই। যদিও সম্প্রতি চিত্রাঙ্কণ তাঁর মনের ও সময়ের অনেকখানি জুড়ে বসেছে, তবু আশা করি বীণার স্থান তুলিতে বেদখল করবে না; সরস্বতীর উদার কোলে উভয়েরই জায়গা আছে। কবির কবিতার যেমন একটা চয়নিকা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে সর্বজন প্রিয়তম শ'খানেক গান নির্বাচন করে, 'সংগীত-শতক' নামে একটা চয়নিকা করলে হয় না? তাঁর নিজের 'ভোট'ও এ বিষয়ে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার

বাংলা সাহিত্য বলিতে আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্য বুঝিব, যে সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ, যার রূপে ও রসে আমরা, একালের বাঙালী, আমাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার অবকাশ পাইয়াছি। সেই বহু-প্রাচীন-নির্মোক-মুক্ত অভিনব-কলেবর-সমৃদ্ধ নূতন আত্মপুষ্টিমূলক সাহিত্যের কথা চিন্তা করিয়া, আমি সেই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিমাপ করা আমার কাজ নয়; আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই প্রতিভার প্রভাব আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র। তথাপি ইহাও জানি যে, বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষায় এ-প্রভাব এখনই সমাপ্ত হয় নাই; এ-জাতি যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার জাতীয় ভাব-পুষ্টির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ নামক অধ্যায় চির-কালের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়া গেছে, এবং সে-প্রভাব শেষদিকে কতখানি কল্যাণপ্রদ হইবে, ভবিষ্যৎ তাহা ভালরূপেই নির্ণয় করিবে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মর্মমূল হইতে তাহার শাখাপ্রশাখায় পত্রপল্লবে যে দৃঢ়সঞ্চারী প্রাণরস প্রবাহিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই যে তাহার প্রধান, অথবা প্রায় একমাত্র উৎস, এ-কথা অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার ভিত্তি হইতে শিখর পর্যন্ত সমুদয় বদলাইয়া দিয়াছেন; তিনি কেবল এ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, ইহাকে নূতন করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন। আর কোন সাহিত্যে কোন একজনের সৃষ্টি-শক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।

ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের অধিনায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভাই সর্বপ্রথম এদেশে আধুনিক সাহিত্যের পত্তন করিয়াছিল, বাঙালীর রসবোধের উদ্বোধন ও সাহিত্যিক রুচির সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছিল। এই আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তনায় মাইকেল যেমন কবি-কল্পনাকে মুক্তির আশ্বাসে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, বঙ্কিম তেমনই বাঙালীর রসবোধ জাগ্রত ও পুষ্ট করিবার প্রয়াস

পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; সে হিসাবে বঙ্কিমই বাংলা সাহিত্যকে এক নূতন পথে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে-পথে অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের পুনরায় গতি পরিবর্তন হইল; এই পরিবর্তন যেমন সম্পূর্ণ বিপরীত, তেমনই গভীর ও ব্যাপক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় আমরা যে মন্ত্রের পরিচয় পাই, পরবর্তী যুগে যদি তাহারই প্রসার ঘটিত তবে বাংলা সাহিত্য তাহাতে কোন্ দিকে কতখানি লাভবান হইত, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা জানি, সে-সাধনার ধারা বাংলার সাহিত্য-ভূমিকে উর্বর করিয়া পরে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে রবীন্দ্রনাথের সাধন-মন্ত্রই এ-যাবৎ জয়ী হইয়া আছে। আমরা কেবল ইহাই দেখিব যে, এ ঘটনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া; রবীন্দ্রনাথের সাধনমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি; সে প্রভাবের বিস্তার ও গভীরতা কতখানি। এজন্য প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস এবং একালে সেই মানস-ধর্মের সাহিত্যিক প্রয়োজন চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়; আশা করি, ইহা হইতেই আর সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার একটা লক্ষণ এই যে, তাহাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল; বাঙালীর ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কাব্যলোক উদ্‌ঘাটিত করিলেন, তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব-পিপাসার সঙ্গে একটি মহিমাবোধ যুক্ত হইল, সাহিত্যে এই জগৎ ও জীবন এক নূতন ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত হইল; ভারতীয় সাহিত্যের সুচির-প্রতিষ্ঠিত রসের আদর্শ বিচলিত হইল; কবি কল্পনা অতি গভীর হৃদয় সংবেদনাকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবকেই এক নূতন রসরূপে বৃহৎ ও মহিমময় করিয়া তুলিল। বহিঃপ্রকৃতি ও মানবহৃদয় এই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে অন্তর মথিত হইয়া যে রসের উৎসার হয়—প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন-জনিত সেই গভীর অতৃপ্তির রসোল্লাস সেই একজন বাঙালীর প্রতিভায় খাঁটি য়ুরোপীয় আদর্শে কাব্যসৃষ্টির শক্তিলাভ করিয়াছিল। রূপরস-পিপাসার সঙ্গে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তির সমাবেশ ঘটিলে কিরূপ কাব্যসৃষ্টি হয়—এই প্রকৃতি পারবশ্যই পুরুষের চিত্তে কি রস-প্রেরণার সঞ্চার করে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বাঙালী তাহার পরিচয় পাইল। কিন্তু এ রসের চর্চায় তাহার স্থায়ী অধিকার জন্মিল না। অতি দুর্বল ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কল্পনার সংযম রক্ষা করা দুরূহ।

এ-সাহিত্যের রসবোধে যে বিবেক ও রুচির শাসন আবশ্যক তাহা অতি সবল, সুস্থ জীবন-চেতনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই সাহিত্যে এই নবমন্ত্রের সাধনা বঙ্কিমের দৈবী প্রতিভায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, সে-যুগের সকলের পক্ষেই তাহা অনধিকারীর বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ শাক্তসাধনার পক্ষে প্রাণমনের যে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, যে দৃঢ় ও অসঙ্কোচ অনুভূতি-বলে বস্তু ও ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাহিত্যে সেই ধরনের রসরূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়—বাঙ্গালীর জীবন ধর্মে তাহার অবকাশ ছিল না। তাই দেখা যায়, হেম-নবিনের কাব্য অধিকাংশ স্থলে ছন্দে গাঁথা উচ্ছ্বাসময় গদ্য; যে প্রকৃত ভাববস্তুর উপাদানে তাঁহারা কাব্যসৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে ভাব অথবা বস্তু কোনটারই রস পরিচয় নাই; তাই তাঁহাদের কাব্যের বাণীরূপ এত দীন, এত অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু ইহাতেই সে যুগের বাঙ্গালীর শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা ও অবোধ ভাবাতিরেক কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্ত হইয়াছিল—সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর রসবোধ যে ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। যে কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ পড়িয়া মুগ্ধ, তাহার নিকট বৃত্রসংহার উপাদেয়। তাহার কারণ বাঙ্গালীর অন্তরের বন্ধনদাগ তখনও ঘোচে নাই;—অন্ধকার গৃহে বসিয়া সে রন্ধ্রপথে আলোক শলাকা দেখিয়া মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু আলোক পিপাসা তাহার জাগে নাই। য়ুরোপীয় কাব্যের আদর্শ তাহার রসবোধের পক্ষে নিরর্থক কাব্যের সে রসরূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে সাড়া দিবার মত চিৎশক্তি তাহার নাই। তাই বঙ্কিমের কল্পনা তাঁর উপন্যাস কয়খানিতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর কাহারো প্রতিভায়, আর কোন সাহিত্যিক রূপ-সৃষ্টিতে সে কল্পনার প্রসার ঘটিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কতায় বাংলা সাহিত্যে একটি বারোয়ারী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল—বাঙ্গালী একটি সার্বজনীন সাহিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বড় উৎসাহ বোধ করিয়াছিল; সাহিত্য ক্ষেত্রে এই উদ্যম ও পুরুষকারকেই তিনি সর্বাগ্রে চাহিয়াছিলেন। নিজে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তি ও রসবোধের অধিকারী হইয়াও সাহিত্য বিচারে তিনি ছিলেন পুরামাত্রায় ক্লাসিসিস্ট (Classicist); সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের মূল্য বিচার করিয়া, সকল সংস্কারের আমূল পরিবর্তন তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই—খাঁটি সাহিত্য বোধের উদ্রেকঅপেক্ষা তিনি বাঙ্গালীর জীবনে সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতির প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তাই সমসাময়িক সাহিত্য ক্ষেত্র কতকগুলি স্থূল অনাচার হইতে মুক্ত থাকে, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির

যাহাতে অধিকতর উন্মেষ হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। একটা অতিশয় স্ব-তন্ত্র, ব্যক্তিগত দূরবিচ্ছিন্ন ভাবদৃষ্টি লইয়া, একটা পৃথক মনোভূমিতে দাঁড়াইয়া, সবসংস্কার মুক্ত হইয়া, দেশ ও জাতির বর্তমান পরিচয়কে একটা সার্বভৌমিক সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লইবার আশঙ্কা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন কিছু মুক্ত, কিছু জড়িত। তাই তিনি যেমন একদিকে ভারতীয় দশভূজা মূর্তি স্থাপনা করিয়া সাহিত্যের উৎসব জাঁকাইয়া তুলিতেন, তেমনি আর একদিকে সেই উৎসবের বাদ্যকোলাহলে দেবীর বোধন মন্ত্র যে ভাল করিয়া শ্রুতিগোচর হইল না—বাণীপূজায় বাঁশীর সুর অপেক্ষা কাঁসির আওয়াজই যে বাঙ্গালীর কানে অধিকতর উপাদেয় হইবার উপক্রম করিল, জাতি-স্নেহমুগ্ধ বঙ্কিম সে আশঙ্কায় বিচলিত হন নাই।

কিন্তু সমস্যা শুধু ইহাই নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে আদর্শ অতিশয় অভিনব অনভ্যস্ত এবং জাতির জীবন সংস্কারের বিরোধী বলিয়া চমক লাগাইলেও, সত্যকার রসবোধ উদ্রিক্ত করে নাই বলিয়াছি—সাহিত্যের যে আদর্শ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া সেখানকার কাব্যেও বিশেষ বিচলিত ও পরিবর্তিত হইতেছিল; এবং যে কারণে তাহা সেখানে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল সেই যুগান্তরকারী ভাব চিন্তার প্রভাব আমাদের দেশে এই অপ্রবুদ্ধ জীবন চেতনার মধ্যেও নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইতে-ছিল। এজন্য আমাদের দেশেও সেই নূতন সাহিত্যিক উৎসাহের মূলে যেন একটা সংশয়-বিমূঢ়তা ঘটিয়াছিল; তাহার ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে ভঙ্গী আমরা অনুকরণ করিতেছিলাম তাহাতে আর তেমন আস্থা বা উৎসাহ রক্ষা করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যেও বাঙ্গালীর জাতিগত কবি প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক গীতি-রস-প্রবণতা যেন পথ না পাইয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে যতই তাহার পরিচয় বৃদ্ধি পাইল ততই তাহার কল্পনা যেন পুনরায় নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হইল। এই কাব্য সাধনার আদর্শে সে যেন একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও আত্ম-স্বভাব সুলভ পন্থা খুঁজিয়া পাইল; শুধু তাহাই নয়, ইহা হইতে ভাবের যে স্বাতন্ত্র্যমন্ত্রে সে দীক্ষা লাভ করিল, তাহাতে দেশ, কাল ও বহির্জীবনের প্রতিকূল অবস্থা হইতে সে কতক পরিমাণ মুক্তির উপায় করিয়া লইল। অতএব এ-যুগে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় আকস্মিক বোধ হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। এইবার এ-সম্বন্ধে আমি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে মুখ্যতঃ গীতিধর্মী তাহাতে বাঙ্গালীর জাতিগত প্রতিভারই

জন্ম হইয়াছে; কিন্তু তাহার মূলে যে-কল্পনাভঙ্গী আছে তাহা ভারতীয় কাব্য-পন্থার অনুগত না হইলেও ভারতীয় ভাব সাধনার আদর্শেই অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের মত খাঁটি ভারতীয় মানস-প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রেরও নহে; বরং সে-হিসাবে কবি-বঙ্কিম য়ুরোপেরই মানসপুত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহা ফুটিয়াছে, ভারতীয় তত্ত্বচিন্তায় তাহার প্রেরণা চিরদিন ছিল। ভারতীয় ভাব-সাধনায় যাহা বৈশিষ্ট্য সমগ্র জগতকে একটি রস-চেতনায় আত্মসাৎ করার সেই অপূর্ব প্রতিভা চিরদিন ভাবকে লইয়াই তৃপ্ত হইয়াছে, রূপেরও অরূপ-সাধনা করিয়াছে। জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়-ক্ষেত্রে, এই প্রকৃতির রূপরেখা-লিপির সুস্পষ্ট সঙ্কেতে, রসস্বরূপ ব্রহ্ম যে ভাবে মানুষের সহজ ইন্দ্রিয় চেতনার পথেই আত্মসাক্ষাৎকার করাইতেছেন, কাব্যই যে সেই অনুভূতির বিশিষ্ট সহায়, এবং রসজ্ঞানী সাধক বা জ্ঞানরসিক ঋষি যাহা পারেন না—রূপের মধ্যেই ভাবকে প্রত্যক্ষ করা ও রূপের ভাষাতেই তাহাকে প্রকাশিত করা,—তাহা যে কবি কর্মেরই আয়ত্ত, এই ভাব সর্বস্ব জাতি এতদিন তাহা ভাবিতেও পারে নাই। মানুষের সার্বজনীন অধিকার সম্বন্ধে সংশয়, এবং রূপকে ত্যাগ করিয়া অরূপে ভাবদৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রবৃত্তি—এই দুই কারণে ইতিপূর্বে আমাদের দেশে ভাব-সাধনা কখনও উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে নাই।

য়ুরোপীয় কাব্যে যে কবি-প্রতিভা এতদিন রূপের আরাধনা করিতেছিল, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে মানস-প্রাণের বিচিত্র বিক্ষোভকেই একটি অবশ আত্মমুগ্ধ রস-পিপাসায় পরিণত করিয়া কল্পনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিল—উনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রতিভার এক স্ব-তন্ত্র কবি মানসের উদ্ভব হইল। এ-যুগের কবিগণ রূপের উপরে ভাবের প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তথাপি এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মূলক সাধনার মূলে প্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল ছিল বলিয়া—এই বহিঃসৃষ্টির বহু বিচিত্র রূপবিলাসের অন্তরালে এই সকল সাধকেরা স্ব স্ব ভাব কল্পনায় এক অব্যভিচারী চিন্ময় আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া এ প্রবৃত্তি কবি-প্রতিভারূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং কাব্যের সঙ্গীতে ও কাব্যের ভাষায় ভাবকে রূপ দিবার এক উৎকৃষ্ট পন্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রূপের এই অভিনব ভাবভঙ্গী, অনির্বচনীয়কে বাক্যের সাহায্যেই হৃদয় গোচর করার এই বাণী প্রতিভা এ-যুগের ভারতীয় কবি মানসকে আশ্বস্ত করিয়াছিল।৮ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী ও তথা য়ুরোপীয় কাব্য কেবল এই হিসাবেই রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপোষক

হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়, য়ুরোপীয় কবির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হইয়াছে—এই মিলনের গূঢ় তাৎপর্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না।

পূর্বে বলিয়াছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে আদর্শে বাংলা সাহিত্য প্রথমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক সাধনার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালীর অতি দুর্বল জীবন চেতনা। জীবনের বাস্তব অনুভূতি-ক্ষেত্রে যে বস্তুর পরিচয় নাই, তাহাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবে কেমন করিয়া? অথচ য়ুরোপীয় সাহিত্যের রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে, কাজেই বিড়ম্বনার অন্ত নাই। এ-অবস্থায় সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে, এ-যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে যে মুক্তির প্রয়োজন, বাহিরে বাস্তব জীবন ব্যাপারে সেই মুক্তি বহুবিঘ্নময় বলিয়াই তাহার একমাত্র পন্থা স্ব-তন্ত্র ভাব সাধনা। ইহা এই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনারই অনুপন্থী। চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা জগৎকে আত্মচেতনা হইতে বহিষ্কার করিয়া, অথবা আত্মচেতনার প্রত্যয়ানন্দে এই জগতের আধ্যাত্মিক রসরূপ কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ লাভের যে উপায়, তাহা ভারতীয় প্রতিভার নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু একালের মুক্তি সাধনায় এই Mystic পন্থা তেমন প্রশস্ত নহে; এবং সত্যকার কাব্যে তাহা কোন কালেই চলে না। কারণ, কাব্যে শুধু ভাব নয়, অরূপ রসের অর্দ্ধব্যক্ত উল্লাসও নয়—এই জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রসরূপে পূর্ণ প্রকাশিত করাই কাব্যের একমাত্র সার্থকতা। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কাব্যে কবি কল্পনার যে মুক্তিপ্রয়াসের কথা বলিয়াছি, তাহাতেও এই বহিঃপ্রকৃতির প্ররোচনাই প্রবল, তাহাতে প্রকৃতি প্রভাব জনিত জীবন চেতনাই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ ধরনের প্রকৃতি প্রভাব আমাদের জীবনে কোন কালেই প্রবল হইতে পারে নাই। এই ভাব সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনা এক অভিনব মুক্তির সন্ধান পাইল; এবং সে কল্পনার মূলে যে সেই ভারতীয় ভাব সাধনার মন্ত্রই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। যে প্রেরণা এতকাল কাব্যকে দূরে রাখিয়া ভাব-সাধনার অন্যতর মার্গে ধাবিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই ভাব হইতে রূপে নূতন পন্থায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। ঋষির মন্ত্রদৃষ্টিকে, সাধকের ইষ্টস্বপ্নকে, অপরোক্ষদর্শী রসজ্ঞানীর প্রত্যয়ানন্দকে তিনি অন্তর হইতে

বাহিরে—এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির হাবভাবের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার কল্পনায় সেই মোহিনী অসতীই সতীমূর্তির কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কবির কাজ ছিল স্বতন্ত্র; কাব্যামৃত রসাস্বাদকে সংসার—বিষবৃক্ষের অমৃতফল বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও সংসারটা বিষবৃক্ষই ছিল। সেই বিষবৃক্ষ হইতে অমৃত ফল আহরণ করিতে হইলে নিছক কল্পনা বা বাস্তব-বিস্মৃতির যে কৌশল, তাহারই নাম কবি-কর্ম। কাব্যশাস্ত্রবিনোদ একটা চিত্তরঞ্জন বা মন-ভুলানো ব্যাপার; অতএব বাস্তব জীবন-চেতনার কোন উৎপাত রস-সৃষ্টির পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে রস একটি mystic অনুভূতির অবস্থা-মাত্র; এজন্য কাব্য-বিচারে কবি ও কাব্য অতি সহজেই অব্যাহতি পাইয়াছে—কাব্যবস্তু বা কবি-মানসের কোন বিশেষ পরিচয় বা মূল্য-নিরূপণের প্রয়োজন তাহাতে নাই। এজন্য একদিকে কবি-কল্পনা ও তাহার বিষয়ীভূত বস্তুজগৎ যেমন অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তেমনি কাব্য বিশেষের রসনির্ণয়ে একটি অতি স্থূল পদ্ধতির প্রয়োগই যথেষ্ট। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণেই যাহার প্রমাণ, তাহাতে কোন বিশেষ বস্তু পরিচয় বা মানস পরিচয়ের অবকাশ নাই, তাহাতে কবি কল্পনার প্রয়াস কোথায়? রসের এই ধারণা হইতেই বুঝা যায়, এদেশে জগৎ ও আত্মচেতনার মিলন ক্ষেত্র রূপে, কাব্যের সীমা বিস্তার কেন হয় নাই; রসের আদর্শকে মহিমা-মণ্ডিত করিলেও, আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক শিষ্য ইহার উত্তরে কি বলিবেন, জানি; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে আধুনিক মানুষ এমনই বেরসিক যে, তাহা বুঝিতে চাহিবে না। আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় কোনও চিন্তালেশহীন মানসিকতাবর্জ্জিত তুরীয় অবস্থার আস্বাদন কামনা নাই। কাব্যের মধ্যেও সে একটা জগৎকেই চায়; সে এমন জগৎ, সেখানে এক উচ্চতর মানস-বৃত্তি-পূর্ণ লীলার অবকাশ পায়, এই জগতের সকল অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে একটি অখণ্ড রস চেতনায় সুসমঞ্জস করিয়াই তাহার চিত্ত নিবৃত্তি লাভ করে। এই মানস বৃত্তির আমরা বাংলা নাম দিয়াছি কল্পনা: ইহার সংজ্ঞানির্দেশে এখনও গোল আছে। দেশীয় কাব্য শাস্ত্রে এই বৃত্তির সম্যক সন্ধান নাই, তার কারণ, কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে ভাবদৃষ্টি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক সুন্দর বোধের সাহায্যে এই জগৎ ও জীবনের রসরূপ আবিষ্কার করে, রসবাদী তাহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই বৈরাগ্য ভারতীয় রস-বাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,—এই রস

ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর, তাহার আস্বাদনে যে মুক্তি ঘটে তাহা বাস্তব মুক্তিও বটে। কিন্তু য়ুরোপীয় কাব্যে কবি কর্মের যে বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাস্তবকে স্বীকার করিয়াই তাহার উপরে আধিপত্য চেতনায় একরূপ রসমুক্তির পরিচয় আছে—সেখানে বাস্তবকেই কাব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি আছে—সে কাব্যের রস শেষ পর্যন্ত বস্তু চেতনার উপরেই নির্ভর করে।

এক্ষণে দেখা যাইবে, যে সাধনা আমাদের কাব্যে কখনও প্রশ্রয় পায় নাই, অথচ যাহা ভারতীয় মানস-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় তাহা কেমন কাব্য সৃষ্টির অনুকূল হইয়াছে। যুগ-প্রভাব ও যুগ-প্রয়োজনের বশে এ-সাধনা প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল কবি বিহারীলালের কাব্য ভঙ্গিতে। তথাপি বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত Mystic; তিনি রূপ হইতে ভাবে আরোহণ করিয়া সেইখানেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা"র রহস্যে মুগ্ধ হইয়া জগতের এক নূতন রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিহারীলালের সারদা—স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র-রূপিণী।" বিহারীলাল তাঁহার ভাব-দেবতাকে এইভাবে 'দেবী যোগেশ্বরী' বা 'যোগানন্দময়ী তনু যোগীন্দ্রের ধ্যানধন' বলিয়াছেন, ইহা নিরর্থক নহে;—অন্তর ও বহির্জগতের এই যোগাত্মিকা রস-সাধনাই ভারতীয় ভাবুকতার আদর্শ। বিহারীলাল এই ভারতীয় আদর্শকেই সর্বপ্রথম কাব্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে সে কল্পনা সিদ্ধি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই অন্তর গহনের দীপশিখাকেই বস্তু পরিচয়ের মানস রঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন; তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে; বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা এই বহির্জীবনের নাটমন্দিরে কবিকরধৃত বাণীদীপের আরতি আলোকে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। বহু কালাগত সংস্কারকে এমন করিয়া উল্টাইয়া ধরা কবির পক্ষে কম দুঃসাহস নয়; তাহার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট উহা এক মনোহর হেঁয়ালী হইয়া আছে। যাহারা পুরাতন কাব্যরসে অভ্যস্ত তাহারা এ-রস আস্বাদনে সঙ্কুচিত; যাহাদের রসবোধ অপেক্ষাকৃত উদার, তাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্যমন্ত্রদ্বারা এ-রস শোধন করিয়া তবে

আস্বাদন করিয়া থাকে; যাহারা কোন রসেরই রসিক নয়, এ কাব্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাকৃত সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনায় উচ্চতর ভাব সিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্র সাহিত্যে মনুষ্য জীবনের যে নবতম মহিমা বোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে, মানুষের অতি ক্ষুদ্র সাধারণ সুখ-দুঃখের উপরে, অতি পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্বাশ্রয়ী রস কুতূহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে, সর্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনার এই অতি মৌলিকভঙ্গী সেকালে আমাদের মত ব্যক্তিকেও কিরূপ মুগ্ধ ও সচকিত করিয়াছিল তাহা বলিব। তখন আমার বয়স ১৫।১৬; তাহার বহুপূর্বে নিতান্ত বালক বয়সেই এক প্রকার কাব্যপ্রীতি জন্মিয়াছিল। মাইকেলের মেঘনাদবধ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ তখন আমার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় জয় করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যের নব উৎসব প্রাঙ্গনে সেকালের তরুণ আমরা এইসব লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম কিন্তু সে সময়েও, অর্থাৎ ১৯০০ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত, রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নাই; অতি সামান্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে সে ভাষা, সে সুর, কেমন অদ্ভুত মনে হইত। রবীন্দ্র সাহিত্য তখনও সুপ্রচারিত হয় নাই; তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন প্রতিভাকেও তখনকার দিনের প্রচলিত সাহিত্য সংস্কার যেন একটা মেঘাবরণে অন্তরাল করিয়াছিল। কিন্তু যেমনই স্কুল ছাড়িয়া কলেজের পাঠ পদ্ধতির তাড়নায় ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর ও ঘনিষ্টতর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড গল্পগুচ্ছ হাতে পড়িল; তারপর কি হইল তাহা তখন ঠিক বুঝি নাই; কারণ মুগ্ধ অবস্থায় আত্মপরীক্ষা সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও থাকে না। সেই কয়টি গল্প পড়িয়া যে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, আমার সমস্ত মানস-শরীরে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, আজ তাহা বুঝিতে পারি। মনে হয়, এতদিনে যেন পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; কিন্তু ইহার পর যেন চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীকে দেখিতে লাগিলাম; যেন এমন একস্থান হইতে এমনভাবে এই নিত্যকার জগৎকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম যাহাতে অতিপরিচিতের মধ্যেই অপরিচিততম সৌন্দর্যের অফুরন্ত আয়োজন হৃদয়গোচর হয়। বাস্তবে ও স্বপ্নে যেন ভেদ নাই; সর্বত্র ভাবদৃষ্টির

কেন্দ্রই যেন অকস্মাৎ এমন একদিকে সংস্থাপিত হইল যে, বস্তু-সকল এক নূতন ছায়া সুষমায় নব মূর্তিতে প্রকাশ পাইল। এই গল্পগুচ্ছই ছিল আমার রবীন্দ্রকাব্য প্রবেশিকা। এখন বুঝি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব গীতিপ্রবণতা; ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার, সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটা ভাবৈকপরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। গদ্যে হোক, পদ্যে হোক—তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত এই সঙ্গীত পাঠককে আবিষ্ট করে, তাহা সমগ্র চেতনাকে সেই সর্ব সমঞ্জসকারী গীতিরাগে বিগলিত করিয়া যে ভাবদৃষ্টির অধিকারী করে তাহাতে জগতের কোন কিছুতে উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সত্য-মিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্বাত্মীয়তার প্রীতি কল্পনায় ধূলিও পরম বস্তু হইয়া উঠে। গল্পগুচ্ছের কথা অংশে বস্তুগত রোমাঞ্চ বিস্ময়ের আয়োজন নাই, তথাপি তাহা যে বিস্ময়-রসে হৃদয় আপ্লুত করে তাহার কারণ, তুচ্ছতম বস্তুর উপাদানে লেখক মহত্তমের প্রকাশ দেখাইয়াছেন; আকাশের গ্রহ-তারকা হইতে ধূলিতলের তৃণপুঞ্জ পর্যন্ত যে একটি মহিমা অব্যাহত রহিয়াছে, প্রাণ তাহারি ভাব ভঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া উঠে; তখন আর বাস্তবে ও কল্পনায় কোন বিরোধ বুদ্ধির অবকাশ থাকে না; কে বলিবে, গল্পগুচ্ছের কতটুকু বাস্তব; আর কতটুকু কল্পনা? গল্পগুচ্ছে এই ভাব যে-রূপ পাইয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়-মনের গোচর হয়, এবং যে একবার এই ভাবমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মসঙ্গীত তাহার কানে ও প্রাণে কোথাও আর বাধা পায় না। গল্পগুচ্ছের মধ্য দিয়াই আমার এই দীক্ষালাভ—একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও, আমার মনে হয়, আমার মত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সহিত সহজ পরিচয়ের উহাই উৎকৃষ্ট সোপান। এবং ইহাও আমার বিশ্বাস যে, গল্পগুচ্ছের মধ্যে কবি-দৃষ্টির যে অতি-স্বতন্ত্র ও নিগূঢ় ভঙ্গী এবং রস সৃষ্টির যে কৌশল আছে, তাহা এখনও আমাদের দেশের সকল রসিক চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, পারিলে, অন্ততঃ একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিবার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক ঘটিত না।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা আর নাই। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত

হই নাই, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি ? রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে ভাষায় ও ছন্দে যে নব কলেবর ধারণ করাইয়াছেন তাহাতেই একালের বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। কিন্তু ওই বাণীরূপের অন্তরালে যে ভাবের আত্মা আছে, তাহা বাঙ্গালীর রসবোধে সম্যক ধরা দেয় নাই একটা স্বতন্ত্র ভাব মুক্তির পরিবর্তে অন্ধভাবের ঘোর সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কলা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত কানে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই কাব্যকলার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্বতন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই। এ-যুগে যে-কেহ বাংলা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন, তাঁহার ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের এই বাহ্যপ্রভাব অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু জগতের বৈচিত্র্যকেই ভাবসঙ্গীতের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-নাথের কবি-প্রতিভা বাংলা ভাষাকে যে রূপ দান করিয়াছে, সে রূপের প্রভাব অজেয়; বাংলা ভাষা সেই সঙ্গীতরসে বিগলিত হইয়া এমন একটি সৌষ্ঠব ও নমনীয়তা লাভ করিয়াছে যে, অতঃপর সর্ববিধ সাহিত্য-গঠন-কর্মে ভাষার এই রূপ শিল্পীমাত্রেরই বরণীয় হইতে বাধ্য। এখন যাহা সাধারণ বাংলা লেখকের অতি-সুসাধ্য অনুকরণ কর্মের সহায় হইয়াছে তাহাই যে একদিন নানা উৎকৃষ্ট প্রতিভার ভাবপ্রকাশ পন্থাকে বহু পরিমাণে সুগম করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বব্যাপী হইলেও যাঁহারা সাহিত্যে রবীন্দ্রপন্থা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কচিৎ দুই একজন সত্যকার কবি-শক্তি বা মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা দাবি করিতে পারেন; যাঁহারা সে-প্রভাব স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের রচনা প্রায়ই সাহিত্যপদবাচ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দুই চারিজন লেখক গদ্যে পদ্যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, স্বাতন্ত্র্য সত্বেও তাঁহাদের কল্পনা রবীন্দ্র বিরোধী নহে, এজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৃহত্তর মণ্ডলের মধ্যেই তাঁহারা নির্বিরোধে অবস্থান করিতেছেন। অতএব বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া ধরিলে সে-সাহিত্যের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না; এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশে রবীন্দ্রনাথের রচনাই এত অধিক যে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার নিজের কীর্তিই সর্বত্র দেদীপ্যমান হইয়া আছে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ব্যাপক হইলেও তাহা যে তেমন গভীর হইতে পারে নাই, ইহার কারণ আপাততঃ এই বলিয়া মনে হয় যে, রবীন্দ্র-

নাথকে আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে-সাধনার শক্তি আমাদের ছিল না—অতিশয় সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, এই নিতান্ত নিম্নভূমিতলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই গগনবিহারী গরুড়ের পক্ষ ও বক্ষ-বল আয়ত্ত করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিতলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আমাদের মানস-নেত্রের দৃষ্টি পরিবর্তন করাইয়া ভিতর হইতেই যে মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন, তাহাতে এককালে মনে হইয়াছিল, এ সাধনায় আমরা অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, কিন্তু তাহা হয় নাই। অতিশয় বর্তমান কালে সাহিত্য-প্রেরণা মন্দীভূত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে; কোন জাতির জীবন-সংকট কালে তাহার যাবতীয় শক্তি অন্য প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়, তখন রস-কল্পনার তেমন স্ফূর্তি আর আশা করা যায় না। তথাপি এ-সাহিত্যে পূর্ব হইতেই শক্তি ও সঞ্জীবতার অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়াতলে, সাহিত্য রচনার কৌশল, ভাষা ও ছন্দের কারিগরী যতটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনুপাতে নবসৃষ্টির প্রেরণা যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালীর মনে সাড়া জাগাইলেও তাহার অনুকরণ যেমন দুরূহ ছিল, রবীন্দ্র নাথের সাধন মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তাহার বাণীলীলার মোহময় ভঙ্গী তেমনি সহজ অনুকরণের বস্তু হইয়াছে। এমন হইল কেন? একদিকে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিপ্রতিভা ও অপরদিকে সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার প্রভাব ও প্রতিপ্রভাব লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ অভিনব কবি-কল্পনা আমাদের রসপিপাসাকে আশ্বস্ত করিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-ধরনের সাহিত্য সমালোচনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও একটি সুস্থ রসবোধ জাগিয়াছিল। হেম-নবীনের কাব্যে যে রস-সৃষ্টির অভিপ্রায় আছে তাহার ব্যর্থতা আমরা অনুভব করিলাম; ইংরাজ কবি পোপ, এমন কি বায়রণও, আর তেমন করিয়া মুগ্ধ করিল না; স্কট অপেক্ষা জর্জ ইলিয়টের উপন্যাস আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। এজন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব হইতেই যে রূপসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহাই যেন আরও পরিশুদ্ধ হইয়া একটি পূর্ণতর বাণী-সাধনার আশায় আমাদিগকে উন্মুখ করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার এই প্রেরণা কবির নিজস্ব আত্ম-সাধনার প্রয়োজনে ভিন্নপথে প্রবাহ

করিল—রূপ হইতে পুনরায় অরূপের পারে ভাবের "খেয়ায়" পাড়ি জমাইল—কবির কাব্য সাধনায় আত্মভাব সাধনা প্রধান হইয়া উঠিল। তারপর হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কাব্যকে সঙ্গীতের অধীন করিয়া তাহার বস্তুভার হরণ করিয়াছেন; রূপের স্বরূপ কল্পনার পরিবর্তে তাহার অরূপ-রসে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় য়ুরোপ পাইয়াছে ও চাহিয়াছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে গীতাঞ্জলিই যদি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান হইত, তবে বাংলা সাহিত্যের কি কোন ভরসা থাকিত?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ভারতীয় মানস প্রকৃতির যে প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহাই যেন সে প্রতিভার যৌবন শেষে তাঁহার কাব্য প্রেরণাকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বধর্মকেই জয়ী করিয়াছে। এ ঘটনা প্রাচীন ভারতের পক্ষে গৌরব জনক হইলেও আধুনিক ভারতের ইহা সৌভাগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এককালে সেই ভারতীয় ভাব সাধনার mysticism কেই প্রতীচ্যের রূপ সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমাদের সাহিত্যে কাব্য ও জীবনের অপরূপ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই ভারতের সৌভাগ্য ও রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ গৌরব। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সাধনার এই যে পন্থা পরিবর্তন, তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্য কীর্তির সম্যক পরিচয়ের পক্ষে ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রধান বাধা। শুধুই কল্পনা বা কাব্যের ভঙ্গী-বৈচিত্র্যে নয়, ভাষা ও রচনার নিত্য-নব রীতি পরিবর্তনে অনধিকারীর চিত্তে একটা মোহময় প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়; ইহার ফলে কোনও একদিক দিয়া রবীন্দ্র প্রতিভার একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া দুরূহ। এইজন্যই এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি সুসঙ্গত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এ পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে কোন সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই; তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুপালোচনা মাত্র। এক্ষণে এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠদান যে—ভাবের রূপ সৃষ্টি, কোনও প্রকার mysticism নয়, তাহা আমরা বুঝিতে সম্মত নই। তাঁহার কাব্যে সনাতনী ভাবধারা বা বিশ্ববাণী যে ভাবেই উৎসারিত হউক, তাহার মূলপ্রেরণা যে আত্মমাত্রায় আধুনিক এবং তাঁহার কবি মানস যে আদৌ mysticism এর অনুকূল নয়, ইহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। আধুনিক মনের রসপিপাসা নিবৃত্তির যে একটি পন্থা তাঁহার কাব্য সাধনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট গৌরব। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতির যে একটি লক্ষণ সম্বন্ধে কাহারও ভুল হইতে

পারে না তাহা এই যে, এমন সদাজাগ্রত মনোবৃত্তি, এমন সুনিপুণ ভাবগ্রাহিতা, এমন সর্বতোমুখী বোধশক্তি এতবড় কবি প্রতিভার সহিত মিলিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি যেমন বিচিত্র, তেমনি তাঁহার কল্পনায় কুত্রাপি অতি সচেতন মানস ক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা যে রীতিই অবলম্বন করুক, তাঁহার কবিচিত্ত ভাব ও বস্তুর যখন যেটাকে আশ্রয় করিয়া যত বিচিত্ররসের সৃষ্টি করুক তাহাতে Idealism থাকিলেও mysticism নাই। ভাব ও বস্তু, Ideal ও Real এই উভয়ের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় ভাব সাধনা ও য়ুরোপীয় রূপ সাধনার যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার প্রধান বক্তব্য তাহাই, এজন্য সেই কথাটাই আর একবার ভালো করিয়া বলিয়া লইয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রপ্রতিভার যে দিকটি আধুনিক জীবন ও আধুনিক কাব্যের সঙ্গতি সাধনে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে সেই দিকটিই আমাদের লক্ষ্য বহির্ভূত হইয়াছে; অথবা এককালে যাহা ক্রমশঃ লক্ষ্যগোচর হইতেছিল তাহা পরে আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছে,—রবীন্দ্রনাথের কবি জীবন একটি সুস্পষ্ট ভেদ রেখায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়াই আমাদের মনে এই দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। 'সোনার তরী' ও 'বলাকা' পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে এই ভেদ রেখা কাহারও অগোচর থাকে না।

আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আধুনিক মনের রস-পিপাসানিবৃত্তির একটি প্রকৃষ্ট কাব্যপন্থা মিলিয়াছে, অথচ এই প্রতিভার উদ্বোধন করিয়াছে প্রাচীন ভারতের সেই ভাবমন্ত্র। যে-ভাবমন্ত্রের সাধনায় রূপ কখনও প্রাধান্যলাভ করে নাই, যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রে অন্তর ও বাহিরের যোগসাধনায় তৎপর হয় নাই, যে মন্ত্রের সাধনায় কখনও কোন কবি-সাধক বস্তু-জগতের রূপে তন্ময় হইয়া এই জীবনের সমস্যাকেই রসোজ্জ্বল করিয়া তোলে নাই, রবীন্দ্রপ্রতিভার যৌবনকালে সেই মন্ত্রই কাব্য-সাধনার অনুকূল হইয়াছিল; যাহা এতকাল তত্ত্ব ছিল তাহাই রসরূপে ধরা দিয়াছিল। আধুনিক মানুষের রস-পিপাসায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে প্রশ্নকাতরতা আছে, তাহার নিবৃত্তি এইরূপ কাব্য-সাধনাতেই সম্ভব। যে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা পশ্চিমের কাব্যকেও আক্রমণ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই সম্মুখে তাঁহার কাব্যের ভিত্তি অকুতোভয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে তখনও বস্তু বা ভাবের কোনটাই নিরতিশয় প্রাধান্য লাভ করে নাই, বাস্তব

মোহিতলাল মজুমদার

হইতে পলায়ন করিয়া ভাবের দুর্গম দুর্গে আশ্রয় লইবার প্রয়োজন তখনও ঘটে নাই। রূপের জগতেই ভাবের সাম্যরক্ষা করিয়া একসঙ্গে রস-পিপাসা ও বস্তু-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই আধুনিক কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই সাধনাই জয়যুক্ত হইয়াছিল। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে এই প্রশ্নকাতরতা নিবারণের যত উপায় দেখা দিয়াছে, তাহার কোনটিতেই কবি-কল্পনা সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইতে পারে নাই; এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে কাব্য স্বধর্ম ছাড়িয়া বিধর্মের সাধনা করিয়াছে। কবি-কল্পনা রূপ হইতে অরূপে ফিরিবার প্রয়াসও করিয়াছে। একালে য়ুরোপীয় কাব্যে আধুনিক মন যে ভাবমন্ত্রের সাধনা করিয়াছিল, পরবর্তী যুগের জ্ঞানবিষ-জর্জরিত ইংরেজ কবি তাহাতে সংশয়মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাই শেক্স্‌পীয়ারের কবি-প্রতিভার উদ্দেশে তিনি হতাশভাবে বলিয়াছিলেন—

> "Others abide our question—Thou art free !
> We ask and ask—Thou smilest and art still,
> Out-topping knowledge :"

শেক্স্‌পীয়ারে কল্পনা যে ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে সেখানে সকল জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত, সে প্রজ্ঞা জ্ঞানকেও অতিক্রম করে। তাই ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্‌ শেক্স্‌পীয়ারের সেই উত্তুঙ্গ কবিসিংহাসনের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়াছেন। কিন্তু শেক্স্‌পীয়ারের এই সিদ্ধিলাভ ত' অরূপ সাধনায় ঘটে নাই—এত বড় রূপস্রষ্টা কবি আর কে জন্মিয়াছে! আর কে এমন করিয়া নিজে নির্বাক থাকিয়া জগৎ-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যগুলি কেবলমাত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে! শেক্স্‌পীয়ারের মত নির্লিপ্ত নির্বিকার বাস্তবজয়ী বস্তু-কল্পনা এযুগে সম্ভব নয়; তথাপি শেক্স্‌পীয়ারের কাব্য সিদ্ধির দৃষ্টান্তে আমরা কাব্যসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। এই বহির্জগৎ, এই সৃষ্টির মধ্যেই যে-কল্পনা আপনাকে মুক্তি দিয়া—যেন একপ্রকার বিশ্বচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনা মিলাইয়া, সর্ববিরোধ সর্ববৈচিত্র্যের তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিকেই দ্বন্দ্বাতীত করিয়া তোলে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা। আধুনিক কাব্যের কবি-কর্ম আরও দুরূহ, এখনকার কালে কাব্যরসের আস্বাদনে এইরূপ আত্মবিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য; কারণ, তীব্রতর জগৎ চেতনার ফলে এখন আত্ম-চেতনাও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কবিকে কাব্যসৃষ্টি করিতে হইলে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই অন্য উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; ভাবকে রূপের অধীন করিতে না পারিয়া কেবল রূপকে ভাবের অধীন করিলেই চলিবে না; য়ুরোপীয় কাব্যে সে

পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র পন্থা—এই সজ্ঞান দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এককালে কবি কল্পনার এই লীলাই আমরা দেখিয়াছি—যেখানে ভাব ও রূপের সাযুজ্যসাধনে এক অপূর্ব রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার এই বৈশিষ্ট্য কেবল কাব্যসৃষ্টিতেই প্রকাশ পায় নাই—তিনি তাঁহার এই কাব্যমন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ, তাঁহার এই কবি ধর্মের সানন্দ উল্লাস, বহুবার বহুবিধভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন; আমরা তাহা বুঝিতেও চাহি নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এই পূর্বার্ধ ভাগের বা পূর্ণ যৌবনের সাধনা তাঁহার উত্তর জীবনের সাধনার দ্বারা আপাততঃ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যাঁহারা আদি হইতে আজ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কাব্য সাধনায়, তাঁহার কল্পনার নিত্যনব ভঙ্গীকে একই কবিব্যক্তির মানস-পরিণতির বিভিন্ন স্তর-বিকাশ মনে করিয়া আশ্বস্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে এই হিসাবে আমার মতবিরোধ নাই যে, সে-ক্ষেত্রে কাব্যই মুখ্য নয়, কবি মানসই মুখ্য—সে বিচারের ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কাব্য বিচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাব্যের উপরে কবি-মানসকে স্থান দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আধুনিককালের কাব্য সমালোচনায় গাতিকাব্যের আদর্শই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায় কাব্যরস অপেক্ষা কবি মানসই আলোচনার মুখ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাও আর একদিকে অবিচার। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের কাব্য-বিচারে যেমন কবি-মানসের কোন স্থান ছিল না—তেমনি আধুনিক কাব্য-বিচারে যদি কবি-মানসই সকল স্থান জুড়িয়া বসে, তবে কাব্য যে বস্তুকে ছাড়িয়া একেবারে ভাবের তুরীয়লোকে রঙীন ছায়ারচনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা বোধ হয় কোন সত্যকার কাব্যরসিক অস্বীকার করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার কৃতিত্ব আলোচনায় আমি তাঁহার কাব্যে ভাব ও রূপের যে অভিনব সমন্বয়ের কথা বলিয়াছি তাহা আপনারা স্মরণ করিবেন, অথবা আধুনিক যুগের কাব্য সাধনায় যে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে বলি। এ প্রবন্ধে কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার অবকাশ নাই, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আমি এ সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছি, আশা করি, সুধীজন তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম,—রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের কাব্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেছে; এই হতচেতনার একটি প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কবি কীর্তির পরিচয় আজকাল বড় কেহ রাখে না। আজকাল

রবীন্দ্রনাথ যে-ধরণের ভাব সাধনায় নিমগ্ন আছেন, ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া তাহার সে সুর আমাদের কানে বাজিতে থাকে—বুঝি বা না বুঝি, চক্ষু মুদিয়া আমরা তাহারই রসাস্বাদনের ভান করি। এ সাধনার সঙ্গে আধুনিক জীবন চেতনার সহজ সম্পর্ক নাই, এবং উহার অন্তর্গত প্রেরণা খাঁটি কবি কল্পনার অনুকূল নয়। তথাপি এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অগ্রাহ্য করিবার নয়; তাই আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যে একদিকে অস্পষ্ট ভাবের ঘোর এবং অপর দিকে তাহারই বিরুদ্ধে বিকৃত মানস বিলাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সাধনার গতি প্রকৃতি যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার কবি জীবনের আদি, মধ্য, অন্তকে, সাহিত্যের আদর্শ ও তাহার ব্যক্তিগত সাধনার আদর্শ, এই উভয় আদর্শে সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া লইবার সামর্থ যদি আমাদের থাকিত, তবে আমাদের সাহিত্য-বোধ আরও সজাগ ও সজীব হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহাকে কোনদিক দিয়াই আমরা বুঝি নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে আদর্শ, রস সৃষ্টির যে রহস্য, কাব্য বিচারে যে নূতন সমস্যার সমাধান দাবি করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কাব কীর্তির মধ্যে সেই সমস্যা পুরামাত্রায় বিদ্যমান; তাহার বিচারেও সেই রহস্যের সন্ধান, সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এই সাহিত্য ধর্মকে এখনও স্বীকার করি না, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও যথার্থভাবে বরণ করিয়া লইতে পারি নাই। এতকাল পরে এ যুগেও কেহ কেহ যে ভাবে কাব্য-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে, কাব্য-পরিমিতি কেন, কাব্য-জ্যামিতি বলাও চলে; সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাঁহারা যে ভাবে রবীন্দ্র কাব্যের রস প্রমাণে যত্নবান হইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শুধুই রবীন্দ্র সাহিত্য নয়, সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনো পরাঙ্মুখ।

রবীন্দ্রনাথের এমন দিব্য প্রতিভাও যে এ-যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জীবনে আশানুরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে শুধুই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ধারা বা তাঁহার কবি-মানসের পরিচয় করিলেই হইবে না; সেই সঙ্গে, বাঙ্গালীর জীবন, তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও সাধারণ সংস্কৃতির কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই দুর্ভাগ্যের জন্য রবীন্দ্র প্রতিভার গৌরব হানি হয় না। বাংলা সাহিত্যে তিনি যাহা দিয়াছেন—তাঁহার স্বতন্ত্র সাধনা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিবার শক্তি যে আমাদের নাই, ইহাও কম দুর্ভাগ্য নহে। আর একদিক দিয়া

দেখিলে রবীন্দ্র প্রতিভার গৌরবে বাঙ্গালীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, শুধু বাংলা দেশের কেন, বর্তমান জগতের যুগ প্রয়োজনে বাধ্য না হইয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-বিসর্পী এক সার্বভৌমিক রসপ্রতিষ্ঠার সাধনা করিয়াছে—সে সাধনায় ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টিই তাঁহার সহায় হইয়াছে। এ সাধনায় যেমন একটি সুমহান আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহার প্রভাবে যেমন কূপমণ্ডূক মহাসাগর দর্শনের অধিকারী হয়, ইহা যেমন বাঙ্গালীর মানস মুক্তির একটি চিরস্থায়ী উপায় হইয়া থাকিবে, তেমনি,—দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা তাহার বর্তমান দেহ দশায় তাহার দুর্বল প্রাণ ধর্মের পক্ষে উপযুক্ত পথ্য নয়; ইহাকে পরিপাক করিবার শক্তি তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনায় যে নূতন রস সৃষ্টির পরিচয় আছে তাহার স্বরূপ নির্ণয় আমার মত ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়; বাঙ্গালী যদি বাঁচিয়া থাকে, যদি তাহার দেহ, মন, প্রাণ নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সত্যসুন্দরের সাধনায় পূর্ণশক্তি লাভ করে, তবে একদিন আমার প্রাণের এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনির পরিবর্তে, এ যুগের এই মহাকবির শ্রদ্ধাতর্পণে, বহুকণ্ঠের সত্যতর মন্ত্রোচ্চারণ শুনা যাইবে। বিশ্ব সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে ভবিষ্যকালের বিচারেও রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমার এমনও মনে হয় যে, এতকাল কবি প্রেরণা যে-পথে রসসৃষ্টি করিতেছিল তাহার মূলমন্ত্র যেমন শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকীয় কল্পনাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তেমনি কাব্য সাধনার যে আর এক পন্থা য়ুরোপীয় সাহিত্যেই সূচিত হইয়াছে, যাহা ডাহিনে বামে নানা ভঙ্গীতে নানা দিকে আজও অগ্রসর হইয়া চলিতেছে—কাব্য-সাধনার সেই পন্থায় যে চূড়ান্ত সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ভাব-কল্পনা হয়ত তাহাতেও শক্তিসঞ্চার করিবে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই পূর্ণমিলন যজ্ঞের উদ্‌গাতারূপেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সার্থক হইবে। সাহিত্যের সে-রূপ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—রবীন্দ্রনাথও সে-সাহিত্যের মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র, রূপস্রষ্টা নহেন। য়ুরোপের রূপবাদ ও ভারতের ভাববাদ রবীন্দ্র সাহিত্যে যেটুকু সমন্বয়ের অবকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও মোটের উপর এপর্যন্ত ভাবের প্রাধান্যই অধিক; তথাপি, কাব্য-রস পিপাসার সঙ্গে জগৎ জিজ্ঞাসার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আধুনিককালে উত্তরোত্তর প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক, সেই অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক কল্পনাই এপর্যন্ত আর কোথাও এমন বিশ্বাত্মীয়তার রসে পৌঁছিতে পারে নাই। এদিক দিয়া চিন্তা করিলে য়ুরোপই এ মার্গের নিকটতর অধিকারী, দেশের তুলনায় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের

 মোহিতলাল মজুমদার

প্রকৃত আদর যে অধিক, তাহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও আশ্চর্যের বিষয় নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের রসভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্বে বাঙ্গালীকে এখনও অন্যতর মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। রূপ-সাধনা না করিয়া ভাব-সাধনার গহন পন্থায় প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আজিকার অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যও নহে, স্বাভাবিকও নহে। রবীন্দ্র প্রতিভার মূলমর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিলে, অথবা, তাহার প্রতি আক্রোশ করিয়া সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিলে বাংলা সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিবে। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের চেষ্টা; এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতম রূপটিকেই চরম আদর্শ মনে না করিয়া সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্মকে উদ্ধার করিয়া উদার রসবোধের প্রতিষ্ঠা করা; তবেই বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রকৃত মানস মুক্তি ঘটিবে; তখন রবীন্দ্র সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদকে আমরা আত্মসাৎ করিতে পারিব সে প্রতিভার গৌরবে আমরা যথার্থ গৌরবান্বিত হইতে পারিব।

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হর্বর্ট স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এক পাতা ছাপা গদ্যের চারদিকে যে পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ; হয়তো সেইজন্যেই ওই ধরনের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা না কেটে, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রণালী দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট ঠেকুক না কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারি নি, বরং অনেক সময় ভেবেছি যে ঐ দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্য তীর্থ নামে সুপরিচিত। এ-মতটিকে প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত লাগে, তবু এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। গদ্য বিলাসীরাও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধি বিবেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁদের অন্দরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন তাকে যেন আর কাব্য থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। কাব্যমোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতার ভুক্তভোগী। প্রায়ই এমন কবিতা তার হাতে আসে যার মধ্যে, ছন্দ মিল উপমা অনুপ্রাসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মিলে না, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্মুহু উঁকি পাড়ে।

এত কথা বলার তাৎপর্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই, সেখানে গদ্য পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য কেবল প্রবেশার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা আর কার্য-কারণের সুসংগতি; এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, তাই আমার মতে, গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয় সাহিত্যে দ্রষ্টব্য, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের-এর একজন নায়ক শুনে চমকে গিয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না জেনে গদ্য আউড়ে এসেছেন; এবং আমাদের মতো অষ্টপ্রহরিক মানুষেরাও হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যতবার কবিতায় কথা বলি, তার তালিকাও সত্যই বিস্ময়কর। তবে সেই জন্যেই গদ্য-পদ্যের ঐক্য অবশ্য গ্রাহ্য নয়; এবং বোধহয়

সকল সভ্য মানুষই আবহমান কাল একের দ্বৈধ স্বীকার করে চলেছে। যতদূর মনে পড়ে, এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহকরূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায়; এবং আমি যখন শব্দব্রহ্মে আস্থাবান নই, বুঝি যে মানুষের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়ের মতো ভাষাও আবশ্যিকতার চালনে গড়ে উঠেছে, তখন আমি মানতে বাধ্য যে ও-দুটো অভিধার মধ্যে অর্থের বৈষম্য সহজ বলেই, ওদের আক্ষরিক চিহ্ন বিভিন্ন।

পক্ষান্তরে গদ্য ও পদ্য সাধারণতঃ যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্বকীয় মূলধন একত্র ক'রে যে যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা। কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গে আজ সম্ভবতঃ মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তার সম্বন্ধে প্রতর্ক নিষিদ্ধ; এবং নেতি-নেতিই সে পরিচয়ের বাচনিক অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু তার কেন্দ্র নঙর্থক নয় একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্বচনীয়, কোনো কালেই অজ্ঞেয় নয়; এবং কথাগুলো প্রথমতঃ মরমীদের অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, ব্যাপারটির সঙ্গে কার্যতঃ আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। এমনকি প্রায় সকল যাদুকরই ভোজবাজি দেখায় এই উপায়ে। ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতির শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে, এমনি বেমালুম ভাবে লুকয় যে মোহমুগ্ধ দর্শক অগত্যা ভাবে সে অলৌকিক রহস্যের সম্মুখীন। কারণ একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে দর্শক বা পাঠকের মনে যে-আবিষ্ট তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, তা স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ; এবং সে অবস্থার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু অনিকামতা—আদেশ উপদেশ গ্রহণের অপার ক্ষমতা, তাই সে-ধরনের সংক্রামেই সাপুড়ে সাপকে ব'সে আনে আর হিপ্নোটিস্ট্ হিস্টিরিয়া রোগীকে স্বাস্থ্যের পথে চালায়।

তবে পালনীয় আদেশমাত্রের যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তার ব্যতিক্রম চলে না—অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও আজ্ঞাকারীর মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আজ্ঞায় সহজ বোধ্য নিশ্চয়তা একেবারেই অপরিহার্য। কাব্যের গদ্যময় অংশ এই প্রাজ্ঞকে বিজ্ঞাপনের ব্যাপৃত থাকে, এবং পদ্য নেয় পূর্বোক্ত সমাধি উৎপাদনের ভার। Cover her face, mine eyes dazzle, she died young—এ-রকমের একটা নিরবলম্ব

পংক্তি হঠাৎ বাস্তব জীবনে যদি কানে বাজে, তবে সেটাকে পাগলের প্রলাপের মতো শোনালেও শোনাতে পারে। কিন্তু এই লাইনের অহেতুক প্রভাব এড়িয়ে অরসিকেরা যখন হাসেন, তখন তারা ভুলে যান যে ওয়েব্‌স্টর কেবল ওই কটা কথাকে পর পর সাজিয়েই নিস্তার পান নি, ওই বাণী যাতে দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাও করেছিলেন পূর্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেক্সপীয়র-এর রচনারীতিও অনুরূপ। সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতেই কাটে। তারপরে পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে ঝিমিয়ে পড়লে, আসে দুর্নিবার প্রত্যাদেশ—absent thee from felicity awhile। কিন্তু ততক্ষণে পাঠক আপত্তি বিপত্তির ক্ষমতা হারায়। কাজেই তার পর সেই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটাই তার কাছে ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ঠেকে, সে আর না ভেবে পারে না যে হ্যাম্লেট্-এর চিরপ্রয়াসের সঙ্গে তার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্কেও, কিছুদিনের জন্যে নয়, চিরকালের মতো যবনিকা নাম্‌লো।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্তব্য হ'লেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অগ্রাহ্য। তবে এ-ক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণতঃ সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত; কিন্তু গদ্য সর্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধিনিষেধ মানে না। এই স্বাধীনতা সত্ত্বেও গদ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয়, এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না; কিন্তু এতে ক'রে তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে যায়, তাও একান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাক্ না কেন, ললিত কলায় এখনো অর্থই অভিষ্ট; এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই পদ্যের পরে জন্মেও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে আজ জ্যেষ্ঠের উচ্চবর্তী। অবশ্য পদ্যের উপকারিতা এখনো একেবারে ঘোচে নি; ভাবের ছায়াময় রাজ্যে পদ্যই আজও পুরোধা; এবং যৌবনসুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালেভদ্রে এই রাজত্বের সীমায় এসে পড়ে, তখন সেও অগত্যা এখানকার হাল-চাল সম্বন্ধে অগ্রজেরই উপদেশ শোনে। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন শুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়াই স্বাভাবিক। বিধাতা জগতকে এক সুরে ঢালেন নি। তার মৌলিক তত্ত্ব জানতে চাইলে, হয়তো সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আছে; কিন্তু সেইজন্যেই উপরের স্তরগুলো অবজ্ঞেয় নয়, বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং আরিস্টটল-এর মতো কাব্যাদর্শকে জীবনেরই মুকুর ব'লে ভাবলে, সেই প্রতিবিম্বে স্থূল স্তবকগুলোর স্থান হওয়াও অত্যাবশ্যক।

বলাই বাহুল্য যে গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই গড়া যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনো বাছবিচার নেই, যাতে খুশিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্মিত আধারটির নামই মুক্তচ্ছন্দ—free verse। তাতে নূতন-পুরাতন সকল বয়সের সুরাই ইচ্ছামত মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবার কোনো ভয় থাকে না। সে-ছন্দকে উপলক্ষের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামান সম্ভব, আবার অবস্থান্তর ঘটলে, গদ্যের অনিয়মিত গতিও তাতে বেখাপ্পা লাগে না। সে সন্ন্যাসী ভেক নেয় নি বটে, কিন্তু তাই বলেই যে সময়ে সময়ে গৈরিক ধারণ করে না, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে তার অঙ্গে তিলার্ধ স্থান অনাবৃত নেই। তার কণ্ঠে "সাধারণ মেয়ের" সুস্থ, সবল উক্তিও যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, "বিশ্বলোক মহানুভবতাও" তেমনি শোভন লাগে। তার প্রসস্ত পথে "ছেলেটা"ও খেলে বেড়ায়, আবার "শিশুতীর্থ"-এর যাত্রীরাও মিছিল করে এগিয়ে চলে। তার প্রাঙ্গনে "মাঝে মাঝে মরচে-পড়া কালো মাটি"র সীমান্তেই ভীড় জমায়। "রক্ত বর্ণ শিখর শ্রেণী রুষ্ট রুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো।" অল্প কথায় তার গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে শোনা যায় "চিরকালের স্তব্ধতা আর চলতি কালের চাঞ্চল্য"। ভাষার সহজ বৈচিত্র্য সে-ছন্দকে শক্তি জোগায়, তাই সহস্র স্বৈরাচরণের মধ্যে সে কেবল এইটুকু হিসাব রাখে যে ভাষার পদক্ষেপের সঙ্গে তার পা ফেলার তাল যেন না কাটে। হয়তো সেইজন্যেই গদ্যের সংগে তার বেশী মিল, অথচ পদ্যের সঙ্গে অহি-নকুল সম্বন্ধ নয়। পূর্বেই জানিয়েছি যে আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনেও পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমনকি আমরা এতদূর পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে তাতে যে-গদ্য ব্যবহৃত তাও একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছৃত বাক্য তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দের প্রশস্তি পাঠে অনেকেই হয়তো বিরক্তির স্বরে শুধোবেন, এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পের দান, সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আর কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে নি? উত্তরে এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে আদি কবিরা তাঁদের কাব্যে জীবনকে যে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন, অর্বাচীনেরা তার ত্রিসীমানাতেও পৌছতে পারে নি। অবশ্য এই বৈকল্যের জন্যে আধুনিক লেখকদের দায় যৎসামান্য, এমন ভাবাও অনুচিত নয় যে ইতিমধ্যে জীবনের অঙ্গবাহুল্য এত বেড়েছে যে কোনো একটা রচনায়—এমনকি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তার চিত্রাঙ্কন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এজন্যে অল্প-বিস্তর দোষ সদ্যন্তন লেখকদেরই অর্শালেও, তাদের পদ্ধতি সত্য সত্যই নিরপরাধ; এবং পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের সঙ্গে মুক্তচ্ছন্দের তুলনা করলে, কোনো দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই দেখা যাবে না। তবে জগৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না; কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে; এবং অচেতন বিবর্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসর ব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্তমান কাব্যের রূপরেখা যদি অল্পাধিক বদলায়, তবে বিস্ময় প্রকাশ অসঙ্গত। আসলে সাহিত্যের সত্তা আজও অবিকৃতই আছে, এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে স্বাধীনতা চাইছেন, তা ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়।

আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় সে-কালের কবিরা এ-কালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেন না; এবং সেইজন্যে সেক্সপীয়র প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা ভুগেছিলেন, তা ইংরেজীনবিস মাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমে নি, তৎ- সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান-কাল ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা বেশী। এমনকি ছন্দ সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্তী। অবশ্য সে-যুগেও, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চলতো না। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হতো, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব। যদিও তখনকার গীতিকবিতার সাম্প্রতিক স্বাবলম্বন মিলতো না, তবু ছন্দকে তাঁরা কখনো কারাগার রূপে দেখেন নি, তাকে চিনেছিলেন কাব্যপ্রেরণার প্রণালীরূপে। ফলে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনো গণিতের শিকল পরে নি; সর্বপ্রথম সে-শাসনের বসে আসেন মিলটন। তাই যখন যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর সাক্ষাৎ পাই, তখন একটা অকারণ বিষাদে মন যেন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

নুয়ে পড়ে; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায় এত বড় মহাকবিকে ছেড়ে প্রাণ চায় হেরিক্-এর মতো গ্রাম্য কবির সংসর্গ; বুদ্ধি নত শিরে মানে বটে যে লুপ্ত স্বর্গের বার্তা মিল্‌টন্-এরই আয়ত্তে, কিন্তু অন্তর খোঁজে মার্ভেল-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পার্থিবার ছলা-কলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে।

জানি মিলটন-এর মর্যাদালাঘব উপহাস্য ও দুঃসাধ্য; এবং সে-প্রয়াসও আমার নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না পাড়লেও, কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাইলেই, সে-মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে। এ-ঋণ এমনি বিশ্বব্যাপী যে বাংলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারে নি। কিন্তু এ-কথা বলা নিশ্চয়ই মার্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের অনুবাদ শিখরে আমার মত জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতঃই সংক্ষিপ্ত। মিলটনী কাব্যের নির্বিকার গাম্ভীর্যে মানুষী দুর্বলতার স্থান নেই; তার মর্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্য বিরাজমান; তার অভিজাত পাত্র-পাত্রীর অন্যতম স্বয়ং ভগবান। কাজেই যে-নাট্যশালা মিলটনী ট্রাজেডির রঙ্গভূমি, সেখানে মর্ত্যচারীর প্রবেশ কোনোমতেই সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকের বিবেচনায় একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আমি এ-মতে সায় দিতে অক্ষম। কথাটা যদি একেবারে মিথ্যা নাও হয়, তবু তার একদেশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্যদুটির সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্—তাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিলটনী পবিত্রতার ছায়া নেই। সেই কাব্য দুটির বাণী মুখ্যত অনুবাদের মারফৎ আমার কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য আমার মুখে মানাবে না। তাহলেও এ-সম্বন্ধে আজ আর বোধ হয় তর্ক নেই যে ওই আদিকবিদ্বয় বর্জনের দিকে ঝোঁকেন নি, অঙ্গীকারের জন্যে উন্মুখ ছিলেন।

অবশ্য তাঁরাও তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেন নি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারও অমর অধিকর্মাদের দৃষ্টি এড়াতো না। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে সেই অতি-মর্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যচ্ছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন শোনায়। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনি তার অতদিনের জড়তা কাটে, অমনি বুঝি চিরন্তনী মাঝে মাঝে ঘুমলেও, কখনোই মরে না। এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্-অনুবাদকদেরই উপলব্ধি নয়, যিনি প্রাচীন

কাব্যকে ভাষান্তরে আনতে চেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ, ষোড়শ শতকে ইংরেজী ভাষা যখন সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠে নি, তখন যে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছেছিলো, আজকের পরিবর্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও ইংরেজেরা তার অনেক নীচে প'ড়ে আছে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অনুচিত নয় যে অর্থমর্যাদার আধিক্যবশত যে-সকল শব্দ আজ আর নিত্যব্যবহার্য নয়, আভিধানিক যাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শন-রূপে সযত্নে রাখা রয়েছে, কর্মজীবনে তাদের অভাব ঘটা ছিলো না। দূরত্ব চিরদিনই গৌরবপ্রসু, কাজেই মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনো আধুনিক অনবদ্য ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে-ভাষা যে অতিশুদ্ধির বোঝা বইতো, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব বর্জনীয়।

সে যাই হোক, এতদিন অনাচারে বেড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ অবৈধতা ছাড়লে, এবং তার মতি পরিবর্তনের জন্যে মিল্‌টন্‌-র উপরে দোষারোপ উচিত নয়, আসলে তিনি উপলক্ষমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের "শ্রমবিভাগ"-ও অনেক দূর এগিয়েছিলো। ড্রাইডেন্‌-এর অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরেজী গদ্যে যে—অপূর্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিললো, তার পরে পদ্যকে সর্বশক্তিমান ভাবার সার্থকতা রইলো না, দেখা গেল গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্তব্য, যা এতদিন অগত্যা আমরা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরেছি, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া ঠিক এই সময়েই জীবনের মূল দিকটারও আগল ভাঙলো, রিনেসেন্স-এর পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে লাঙল চালিয়েছিলো, তাতে অভাবনীয় ফল ফললো, এবং ধরা পড়লো যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফতে কোনোমতেই লোকসমক্ষে আনা যাবে না। এ-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য। তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যিই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য পদ্যকেও তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে পারতেন। অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের সাধ্যে কুললো না, তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটিকে অজ্ঞাতবাসে তাড়িয়ে তাকে দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে ছুটি দেওয়া হবে; কিন্তু যখন উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় আসবে, তখন মিছিলের শীর্ষস্থানে থাকবে সেই।

আমার বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন এই সঙ্কটের অন্যতম কারণ। যতদিন অলি-গলিতে ছাপাখানার আবির্ভাব হয় নি, যতদিন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি কেবল গ্রন্থাগারে বিরাজ করতো, ততদিন কাব্যের ইচ্ছাবিহার বিপদ ঘটায় নি। কারণ ততদিন যাদের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াতো, তারা অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তার দুর্বলতার সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ। কিন্তু এখন থেকে যারা তার চারদিকে ভিড় জমালে, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ধৈর্য তাদের ছিলো না। সাহিত্য তাদের অবসরবিনোদনে লাগলো; এবং যেহেতু সে-যুগের প্রলোভন যে-মাত্রায় বেড়েছিলো, অবসর সে-অনুপাতে বাড়েনি, তাই লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করার মতো সময় তারা পেতো না, ভাবতো আবরণের পরিপাট্যই বুঝি প্রকর্ষতার চিহ্ন। এই শ্রেণীর পাঠক, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর অনুকারকের কুসঙ্গে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচারে বদলায়। অতএব সন্ত্রস্ত কবিরা কাব্যকে বিধান মানানোর চেষ্টায় কোমর বাঁধলেন। ফলে হিরোয়িক্ কাপ্লেট্-এর শৃঙ্খল নির্মাণ হলো, স্থান-কাল-ঘটনার নির্বাসিত সঙ্গতি রঙ্গালয়ে পুনঃ-প্রবেশ করলে, বিবেচকেরা জানালেন যে ট্রাজেডির পক্ষে জাতিরক্ষার একমাত্র উপায় রাজসিক আড়ম্বরের আড়ালে নায়ক-নায়িকার আত্মবিলোপ। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও গাম্ভীর্যের ভেক নিলে, যাতে জনসাধারণ শ্রুতিমাত্রেই বোঝে যে রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যের উপক্রম সুদ্ধ দণ্ডনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত এত করেও অভিষ্টসিদ্ধি হলো না, ফল দাঁড়ালো ঠিক উল্‌টো। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যের প্রকৃতিবিরোধী। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডেন্-পোপ্-এর পরে ইংরেজী কাব্যের অতি উর্বর ভূমিও বহুদিন পর্যন্ত ঊষর রয়ে গেল; এবং আত্মপ্রকাশের প্রণোদনায় যাদের অনীহা ঘুচলো, তারা বরণমালা দিলে গদ্যের গলায়। অবশ্য তখনও ব্লেক্-এর মতো দু-এক জন হঠকারী গোল বাধাতে ছাড়লে না বটে, কিন্তু সমসাময়িক সুধিমণ্ডলী তাতে টললেন না, সে-ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ভেবে তাদের ক্ষমা করলেন; এবং অতিবড় খেয়ালীও আজ এ-কথা মানবে যে তাদের কবিত্ব সম্বন্ধে সহধুরীদের মত যদিও ভ্রান্ত, তবু তাদের চিত্তবিকার-সম্বন্ধে সে-কালের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। তাহলেও শেষ পর্যন্ত পাগলেরাই জিতলো; এবং আঠারো শতকের শেষ দশায় ফরাসী দেশে যে-রক্তগঙ্গা বইলো, তার ধাক্কা রুচি-বাগীশেরা সামলাতে পারলেন না, ডোববার মুখে জানলেন যে উপেক্ষিত বর্বরেরা সত্যসত্যই ক্ষেপে উঠলে, শুধু তাঁদের কেন স্বয়ং বিশ্ববিধাতারও নিস্তার নেই।

ফলে কলিন্স-এর গৌরব পোপ্-এর প্রতিপত্তিকে ছাড়ালো, ওয়র্ডস্ওয়র্থ্ চলিত ভাষাকে কাব্যের ভূষণ বলে রটালেন, অভিজাত বাইরন দিগ্বিজয়ে বেরোলেন রথপতাকায় বর্ন্স্-এর কৃষকী প্রবচন লিখে।

দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা কমে পদ্যের প্রসার বাড়লো, শুভবাদীরা জোর গলায় হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভারে উনিশ শতক এলিজাবেথীয় যুগকেও হার মানাবে; এবং যেন তাঁদের আত্মশ্লাঘার শাস্তি স্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন এক কবির দেহান্তর ঘটলো যিনি সেক্সপীয়র-এর সমকক্ষ না হলেও, পদমর্যাদায় ঠিক তাঁর নীচেই আসন পেলেন। এর পরে কাব্যকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। নিরবচ্ছিন্ন সুসময়ের ফলে কবিরা আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। গদ্য-পদ্যের পুনর্বিবাহে পৌরোহিত্য করেও ব্রাউনিং জাত খোয়ালেন না, টেনিসন গ্রাম্য ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস পেলেন, এবং স্বয়ং সুইন্বর্ন্ বিদ্রোহী হুইট্‌ম্যান্-কে কাব্যের ত্রাণকর্তা বলে উপাধি দিলেন। অবশ্য মুক্তছন্দের এই আদি পুরুষটির যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড সে-দিনেও বোঝে নি, আজও ঠিক বোঝে না; এবং অল্প দিন যেতে না যেতেই সুইন্বর্ন সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র ফিরিয়ে নিয়ে, নিজের ভুল শুধ্‌রোলেন। কিন্তু সুইন্বর্ন-এর পরে যে-কবিরা আসরে নামলেন, তাঁদের কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব ফুটে উঠলো। য়েট্‌স্-প্রতিষ্ঠিত "রাইমর্স ক্লাব্"-এর সভ্যেরা যে-কবিতা লিখতে বসলেন, তার অঙ্গে গদ্যের পাপস্পর্শ হয়তো লাগলো না, কিন্তু তাতে সুইন্বর্ন-এর রসালু বহুলতাও ধরা পড়লো না। রক্ষণশীলেদের উপহাস কুড়িয়ে, তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয়, যতটা শ্রাব্য।

এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলোই, উপরন্তু লিখিত সাহিত্যের যেটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অচলায়তন পারিভাষিকতা—তা কেটে গিয়ে সঞ্জীবিত কাব্য আবার ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বীরূপে দেখা দিলে। বোঝা গেলো যে আবৃত্তির যোগ্য কাব্যে অলঙ্কারের ভার সয় না। সুতরাং ছন্দের গ্রন্থি খুলে ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য ছাড়া পেলে, রূপকের পালা চুকিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চললো, অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় পরিচয়ের পরি-তৃপ্তির কাছে হার মানলে। তৎসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কবিরা অবশ্য ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছতে পারলেন না; তার জন্যে আরো পনেরো-বিশ বছরের দেরি ছিলো। তবু এই বিদ্রোহী নেতাদের অকাল মৃত্যুর পরেও সাইমন্স্ ফরাসীদেশ থেকে নমুনা এনে যে-নববিধান ইংরেজী কাব্যে ঢোকালেন, তা পড়ে আর কারো

সন্দেহ রইলো না যে পরিবর্তন আসন্ন। এর পরের ঘটনা আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়, সমসাময়িক পক্ষপাতের অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনো পরীক্ষা পেরোয় নি, এবং তার ভবিতব্য-সম্বন্ধে নির্ভাবনা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তবে একটা কথা বোধ হয় ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে; এবং তা এই যে কাব্য আর মুক্তি, এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং এরা পরমাত্মীয়; যদি নিরাসক্ত ভাবে সাধনা করা যায়, তবে অরাজকতার মধ্যে দিয়ে কাব্যের নির্দ্বন্দ্ব লোকে উপনীত হওয়া যাবে।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমার উদ্ভট অনুমান যে কেবল ইংরেজী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবে না, তা আমি বুঝি। অপরাপর সাহিত্যকে সাক্ষ্য ডাকা আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু একটা অন্ধ ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কাব্যই আমার সমর্থন করবে। প্রাচ্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; এবং এ-অঞ্চলে মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই নিমগ্ন, ফলে এ-দেশের কাব্য হয় চিত্তবিনোদনের নিঃসার উপাদান, নয় তত্ত্বদর্শনের আধার। কাজেই যেখানে অচিন নূতনের আগমন-আশঙ্কায় আমাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পায় নি; আবার যখন উপদেশকে সারগর্ভ লেগেছে, তখন উপদেশবাহকের সম্বন্ধে আমরা তিলমাত্র ঔৎসুক্য দেখাই নি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টির প্রতিকূল, কারণ জীবনের সকল হিসাব-নিকাশের মতো ললিত কলার খতিয়ানেও দেনা-পাওনার যোগবিয়োগে কেবল শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। তবু যতদূর জানি ও শুনেছি, তাতে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে পূর্বের উদাসীনতাও হয়তো আর অটল নেই। প্রথাপসারণ চৈনিক জীবনের সর্বত্র আজ যে-সর্বনাশ এনেছে, সে-অভ্যাঘাতে চীনা কবিতা মরে নি, বরং বেঁচেছে; এবং জাপানী সাহিত্যের অভিজ্ঞতাও অন্য রূপ নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরোক্ষভাবেও পরিচিত নই— তাই সে-বিষয়ে কোনো রকম মত পোষণ আমার পক্ষে অশোভন। তাহলেও বাংলা সাময়িকীতে বাদ-বিতণ্ডার বহর ও ঝাঁঝ দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে এ-দেশ পাণ্ডববর্জিত বটে, কিন্তু কালাতিরিক্ত নয়।

অবশ্য বাংলা কাব্যে খুব বেশি ভাঙা-চোরার দরকার হয়নি; কারণ তার গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনো দিনই অত্যধিক ছিল না। কিন্তু এই ব্রাত্যতার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতটা আবশ্যিক, তা বলা কঠিন। আমার বিবেচনায়

উনিশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের নাম-গন্ধ না থাকায় এখানকার ছান্দসিকেরা অগত্যা পদ্যকে অবারিত গতির আদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ যারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেদের কামাগ্নিকে দেবতার আড়ালে লুকতে দ্বিধা করে নি, তারা যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দেশ মানবে, এমন ভাবা সহজ নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প; কিন্তু যখন তার বংশকারিকার কথা মনে পড়ে, তখন এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কেননা বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্বই হচ্ছে এই যে তার ভাষা দেবভাষা, অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা; নৃতত্ত্ববিদ্যার বিবেচনায় কাব্য বিবর্তিত মন্ত্র মাত্র; এবং এক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তে আস্থা জাগে। তবে আর্যজাতীয় দু-একটা ছন্দ শুনে এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে হয় যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম ছিল না। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য, ঈষদ্ মনোযোগেই জানা যায় যে আর্যার আপাতস্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, ব্যায়ামকুশলী সৈন্যদলের কুচ-কাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনি। নেপথ্যে প্রযোজক ইঙ্গিত করছেন, তাই অনুগত নর্তকের দল পূর্বাভিনীত ভঙ্গিতে সার ভেঙে শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের প্রয়াস পাচ্ছে।

বিধাতা বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এতখানি দুর্দশা লেখেন নি বটে, কিন্তু পয়ারের পদ্ম-মধু খেয়ে বঙ্গভারতীও কম বিপদে পড়েন নি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধ হয় অশেষ; তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালা-পাহাড় সদর্পে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন; এবং পোশাকের এমনি গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠলো। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের উপরে মিল্‌টন্‌-এর প্রভাব নাতিতুচ্ছ ছিলো না; এবং অসুস্থ কাব্যের রোগ সারানোর পক্ষে সেই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ঔদাসীন্য দেখান নি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই স্মরণ নিয়ে থাকেন,

তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে। অবশ্য এই দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জা বা অনুশোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞা যাকে অপাংক্তেয় করেছিলো, সেই কাঠবিড়ালীই যখন লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধূলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের ছিদ্র ভরাতে পারলে, তখন তার অকিঞ্চনতা উল্লেখযোগ্য নয়, তার প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তিই বিস্ময়কর।

উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে এ-কথাও মনে রাখা কর্তব্য যে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ; এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিলো তদানীন্তন চিৎ-প্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না, তাই তিনি বঙ্গ-ভারতীর সেবকমাত্র, তার ত্রাণকর্তা নন। এ-অনুমান মিথ্যা হলেও, অন্ততঃ এটা সত্য যে বাংলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবতঃ ত্রৈমাত্রিক ভাবায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ বলায় সে-পরিমাণের বিধর্মিতা নেই। কিন্তু এখানে এ-আলোচনা অবান্তর; এবং মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে তিনি শুধু নিয়ামক হিসাবে অদ্বিতীয় নন, চারিত্র্য-গুণের অনটনে তাঁর বিরাট কবিপ্রতিভার অনেকখানি অপ্রকাশিত থাকলেও, তিনি একজন মহাকবি; এবং যতদিন বাংলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, ততদিন তাঁর নামকীর্তনে লোকাভাব ঘটবে না। কারণ মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই, ঝিমিয়ে পড়েন নি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্ক উঠেছিলো, তারা যদিও নিতান্তই আকাশপ্রদীপ, তবু বাঙালী মনীষীরা সেই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বোধ হয় মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘ্য নিবেদন।

মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না পেলে, বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবি-র্ভাব হতো না, এমন অনুমান পাগলামি। কারণ তাঁর সমান কবি হয়তো শতবর্ষে একবার জন্মায়; এবং তাদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও স্বতঃসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও এ-কথা অতি সত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্য তাঁর সামনে জাজ্জ্বল্যমান না থাকলে, অনেক অকিঞ্চিতকর পরিশ্রমেই তাঁর অধিকাংশ শক্তি ফুরতো। ভুললে চলবে না যে শুধু আবেগাতিশয্য বা অফুরন্ত কল্পনা দিয়ে কবিতা লেখা অসম্ভব, সেজন্যে রূপায়ণও আদ্যকৃত্য। অন্ততঃ আমার মতে রূপই কবিতার

প্রধান উপকরণ; এবং এ-রূপ যদি যথার্থই উপযোগী রূপ হয়, তবে কল্পনার ন্যূনত্বেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। অবশ্য ঐশ্বর্যমাত্রেই বর্জনীয় নয়। কিন্তু যেমন ধনবিজ্ঞানের অনুসারে প্রভূত সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ও ভালো, তেমনি মস্তকে সুমেরুপ্রমাণ কল্পনা বেয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো। এ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনই সুস্পষ্ট; এবং তাঁর সাহিত্যে প্রসঙ্গপ্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি, তা অন্যত্র দুর্লভ। বলাই বাহুল্য এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভারই প্রকরণের বহনীয়; কেননা প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জন ছাড়া কোনো মধ্য পন্থার অবকাশ নেই। অতএব তার বহিরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ছন্দে, ভাষায় ও প্রতীকে, স্থিতিস্থাপকতা চাই। এইখানেই পূর্ববর্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার—ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায়তা করেছিলো।

সত্যে পৌঁছনোর পথ যদিও একটি, তবু সে-পথ গোলকধাঁধার মতো, তাতে বার বার পথচ্যুতি অনিবার্য। কাজেই বিপথগুলোয় লক্ষ্যদ্রষ্টাদের পদচিহ্ন না থাকলে, ঠিক পথটা চিনে নেওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টক্রমে প্রাপ্য পন্থায় পদার্পণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন ঠেকে। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথ হাতড়ে বেড়ালেন না, অতি অল্প বয়সেই "চিত্রাঙ্গদা"-র মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের কোঠায় তুলে দিলেন, তখন কেবল "চিত্রাঙ্গদা"—লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই ছুটি পাই না, সেই প্রাক্‌রবৈবিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাংলা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়লো। তবে কাব্যের ধনিক তন্ত্রে জন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত, এমন উদ্‌ভ্রান্ত ধারনা আমার নেই। তাঁর কর্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই বোঝেন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ঐশ্বর্য কী অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি ছাড়তে পারলে, তাঁর মতো ছন্দস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা হয়তো অকবিদেরও অবিদিত নেই; এবং প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয় ব্যতীত প্রতিভার উদ্ভব যে অভাবনীয়, এ-প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই আজ একমত।

কিন্তু সে-সমস্ত মানলেও, হয়তো এমন বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্যে একেবারে বঞ্চিত নন; এবং যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা রাখেন না,

তাঁরাও জানেন যে মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ সকল প্রকারের মহত্ত্বই সুযোগ খোঁজে; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্বপ্রকাশের সুসময় ভাষার শৈশবাবস্থা। সম্প্রতিবিৎরা মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে; এবং মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতেই ঘুণ ধরেছে, এমন বিশ্বাস টিঁকবে না। তাই আমরা ভাবতে বাধ্য যে কাব্যের উপাদানে এখন আর সে নমনীযতা নেই, যাতে মহাকাব্যের মহানুপ্রেরণা মূর্তিমান হয়ে উঠতে পারে; এবং এই সিদ্ধান্ত যাঁদের কাছে অলীক লাগবে, তাঁদের পক্ষে অতীতের ইতিহাস স্মরণীয়। সফোক্লিস, লুক্রিশিয়াস্, শেক্সপীয়র, গোয়েটে এবং সম্ভবতঃ কালিদাস, এতগুলি মহাকবির মধ্যে কেউই যে পরিপুষ্ট ভাষার পরিচর্যা করেন নি, তা নিশ্চয়ই নিছক দৈবযোগ নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই যখন আসরে নেমেছিলেন তখন তাঁদের স্ব স্ব ভাষার বয়ঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকের শাসন তখনো শুরু হয় নি, বার্ধক্যের স্থবিরতা তখনো কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনার অবাধ প্রান্তর। অথচ অতীত তখন আর নিতান্ত নগণ্য নেই, তার পরিণতির পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে, অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে প্রত্যুষের অনিশ্চয়তা ছেড়ে সবে মাত্র প্রভাতের আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় মহাকবির আগমন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি স্বাভাবিক; এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেও আমি এই ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

উপরে যা বললুম, তার থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আমি আধুনিক কবিদের সুযোগের প্রতিক্ষায় হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে তিনি ভুল করবেন। সে তো দূরের কথা, আমি বরং মানি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যের প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোন দিনই বিরল নয় রচনাশক্তির প্রাখর্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে পারেন, কিন্তু তাঁদের অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেরও ছাড়িয়ে যায়; এবং যদি কখনো সুযোগের সাহায্যে তাঁরা সমকালীন পাঠকের শ্রদ্ধা জাগান, তাহলে সেই শ্রদ্ধা খোয়াবার ভয়ে তাঁদের রূপকারী বিবেক পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে যে-উপায়ে একদিন পাঠকের মন মজিয়েছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্মণ্য জেনেও তাঁরা উপায়ান্তর উদ্ভাবনে অক্ষম হন; এবং এই অক্ষমতার জন্যেই অকৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষপাত হারান। কাব্যের রূপ কী, তা নিয়ে অনেকেই তর্ক করেছেন, কেউ মীমাংসায় পৌঁছন নি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্য না বাড়িয়ে শুধু এইটুকু

বলাই নিরাপদ যে কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রেই যখন বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে বাঁচে না, তখন বৈচিত্র্যের উপেক্ষা কাব্যের পক্ষেও অকল্যাণকর। অর্থাৎ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আর একটা বাড়তি গুণ আছে, সেটা কালাতিরিক্ত।

সুযোগ যেমন আসে, তেমনি যায়, সুতরাং তার সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য অলিখিতই থাকে, তবে মহাকবিকে এমন কোন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্তে আনতে হবে, যাতে অতীত সুযোগ প্রয়োজনমতো পুনর্জীবন পায়। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য নাম দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিম দেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো; একটা সমষ্টিগত রূপ তার নিশ্চয়ই আছে, এবং সেটাই সর্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এখানেই তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না; বহুবার শুনে যখন তার সমগ্র রূপরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে, তখন শুরু হয় বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিজত্বে পৌঁছতে পারে, তাতে হয়তো সাময়িক শিল্পের আপাতরমণীয়তা মিলে না, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অজ্ঞতা থেকে চির কাল বাঁচিয়ে রাখে। অবশ্য এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্য-সৃজন চলে। হিন্দু সঙ্গীতের নির্দেশে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগরাগিণীর মধ্যে চারিয়ে দিলে, কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবী গেয়ে খ্যাতি জুটেছিলো ব'লে যে-সুগায়ক সারাদিন কেবল ভৈরবী ভাঁজবেন, তাঁর আসরে শ্রোতাদের সংখ্যা যে অবিলম্বে শূন্যে এসে ঠেকবে, তা নিঃসন্দেহ।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সঙ্গত শোনাচ্ছে, কার্যতঃ ততটা সুস্পষ্ট নয়। এমনকি ওয়র্ডস্ওয়র্থ, শেলি, টেনিসন্ ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেন নি; তাঁরা কাব্যকে তাঁদের নির্বিকার ব্যক্তিত্বের ভারবাহী রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ফলত উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও অভিপ্রায়ে সেক্সপীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ হয়েও তাঁরা সম্ভবতঃ অমৃতলোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে আছেন, লোকোত্তরে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক-বিশেষণ নিয়ে অনেক বিবাদ বেধেছে। তাই এইখানেই জানিয়ে রাখা ভালো যে ওই শব্দের দ্বারা আমি কোনো অমানুষিক লক্ষণের আভাস দিচ্ছি না, শুধু সেই ধরনের শিল্পসামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের

চেষ্টাই বেশি পরিস্ফুট। উদুগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও মানি যে কবি যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনা-বেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে প্রকাশ পায়, তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখেছি যার প্রবর্তনা কবিপরিচিতি নয়, কেবল সৃষ্টি ; এবং উদাহরণত "টেম্পেস্ট" নাটিকাটি উল্লেখযোগ্য। আমার বিবেচনায় সেদিন মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত ; এবং তৎসত্ত্বেও শেক্স্‌পীয়র-এর তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে সেই রচনায় জায়গা জোড়ে নি, এমন নিরুক্তি যদিও অবিশ্বাস্য, তবু এটা নিশ্চিত যে জ্ঞানত টেনিসন্‌-জীবনের প্রভাব কাটিয়েও "আইডিল্‌স্ অফ্ দি কিং" যে-ভাবে টেনিসন্‌-কে ধরিয়ে দেয়, প্রস্পেরো কখনো ঠিক ততখানি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে যাই হোক, অনুরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্তের কল্যাণে আজ এই ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল যে নৈরাত্ম্য আর বৈচিত্র্য অন্যোন্যনির্ভর ; এবং যে-কবিতা নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা অনেক সময়েই উপাদেয় বটে, কিন্তু তাতে অমৃতের আস্বাদ নেই।

অর্থাৎ ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুক না কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্য কর্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনো মানে নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্য-সংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত ; কাব্যকে সে যদি চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে ওঠাতে চায়, তবে কেন্দ্রাপসারণ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অবশ্য বিশ্বও অমিত নয় ; কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগতই তার কাছে অনন্ত ঠেকে ; ঘটনার ঘুরন্ত চাকার দিকে তাকালে, তার এমনি ঘোর লাগে যে একই ঘটনা বহু বার ফিরে আসছে কিনা, তা বোঝবার সামর্থ্য থাকে না। কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বের আশ্রয় নেয়, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক ; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু বিষয়ের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকার ধরা পড়ে না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথাকে তুচ্ছ মনে করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মহত্তের এতাদৃশ নিয়ম-লঙ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত ; এবং প্রাচীন গ্রীস্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারত পর্যন্ত এই প্রয়োগ একদিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিম থেকে শুরু ক'রে আধুনিক প্রাচ্য পর্যন্ত আজও তার তেমনি সমাদর।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথও আর্ষপ্রয়োগক্ষম কবি; সেইজন্যেই তিনি আবাল্য কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব সমন্বয় ধরা পড়ে, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয়; কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে। রবীন্দ্রপ্রতিভার অত্যাশ্চর্য গুণ হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য, তাঁর অশেষ পরিবর্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি। অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দিষ্ট ধারা দেখা যায়; একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে ওঠেন; এবং একবার গন্তব্যে পৌঁছলে, তাঁদের আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন সন্তোষ অবর্তমান; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্র স্বভাব পূর্ণতা তথা কৈবল্যের পরিপন্থী। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য; এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরেই তিনি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী সিংহাসন পেতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"য় এসে ঠেকলো, তখন কবি হঠাৎ তাতে আগ্রহ হারালেন। তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কেন স্বেচ্ছায় হাত দেন, তা বোঝা শক্ত।

অবশ্য পিছনে চাইলে, আজ মনে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া নেই। কিন্তু যে-দিন তাঁর কলম দিয়ে "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা বেরিয়েছিলো, সে-দিন এমন প্রত্যয়ের কোনো কারণ ছিলো না, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিলো সমূহ। ততদিন রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন; এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে পাঠকের কানে যে-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তোলে, তা সংস্কৃতির ধ্রুপদ। এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দে বাঁধার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা। এই অগ্নিপরীক্ষায় কেবল তিনিই এগোতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই, যাঁর কাছে কাব্যের মঙ্গল আত্মকল্যাণের চেয়ে কাম্যতর। কিন্তু "ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর। "ক্ষণিকা" যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই জন্মাক না কেন, ওই পুস্তক প্রকাশের পরে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনো সহজ যোগ নেই। কিন্তু ছন্দ-সম্বন্ধে তখনো সংশয় ঘুচলো না। এ-কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছন্দ কখনো নিগড় হয়ে ওঠে নি, বেজেছে নূপুরের তালে। তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দশৈথিল্য যদিও অনবধানতাপ্রসূত, তবু "মানসী"-র "নিষ্ফল-ক্রন্দন"-এর কবি যে সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ববাদিসম্মত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অবশ্য তারপর বহুদিন পর্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে ভুলেছিলেন। তাহলেও ছন্দের পাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বদ্ধ ধ্রুপদী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লেখযোগ্য।

এই স্বাধীনতা আর মুক্তচ্ছন্দের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান আছে, এবং এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপ সন্ধানে নামলেন। "বলাকা"-য় ছন্দ একেবারে বাঁধন ছিঁড়লো না বটে, কিন্তু সেখানে পুরোপুরি সংস্কারমুক্তি হয়তো বিপদই বাধাতো। কেননা "বলাকা"-র বিচরণ মর্ত্যসীমার বাইরে, সেই নিরালম্ব লোক অন্তত দূরাগত মহাকর্ষও না থাকলে, কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে থামতে পারতো। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা মেনেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজনের পরিচয় দিলে যার পরে আর সন্দেহ রইলো না যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না; এবং মানুষের যেগুলো উর্দ্ধগ আবেগ, সেগুলোর অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমনকি ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নাই। গদ্যকে তফাতে রেখেও এ-ছন্দ স্বকীয় ভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনো হারিয়ে যায় না। তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জগৎ কেবল ভাবের উপাদানে নির্মিত নয়, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে, মনে হয় এ-ইতরের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দরকার এমন এক মুখরাকে যে অমর্যাদায় মুইবে না, অপমানের সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে। "পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দ গড়লেন। এতে ছন্দের শেষ আড়ষ্টতাও ঘুচলো, ছন্দ সম্পর্কিত কোনো পূর্বসংস্কারই আর টিঁকলো না; সকল কৃত্রিমতা কাটিয়ে যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগলো। মিল এখনও পরিত্যক্ত হলো না বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেলো যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইলো না। সে-পর্বেরও আর দেরি ছিলো না। "পলাতকা" লেখার সময়ে সময়েই বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতা রচনা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিলো। সেগুলি বেরুলো "লিপিকা"-র প্রথমাংশে, তবে সে-পুস্তক-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লো যে হর্বর্ট স্পেন্সর একেবারে মিথ্যা বলেন নি;

অনেকেই যদিও ভুলক্রমে ভাবেন যে শিখিপুচ্ছধারী দাঁড়কাক আর ময়ূর এক, তবু গদ্যবেশী কাব্যকে তার যথার্থ উপাধি দিতে সকলেই নারাজ। কবির নিজের মনেও হয়তো এই বই-সম্বন্ধে দ্বিধা ঢোকে নি; কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলি যে-মুহূর্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, তখনি তাদের কাব্যরূপ ফুটে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্য-রচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর, তা আর ঢাকা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সব্যসাচী; এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতেই কৃতজ্ঞ। তাহলেও অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ, কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য-নামের যোগ্য নয়, খুব জোর শুধু কাব্যধর্মী; অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চলেও কাব্যগুণের অংশভাক; এবং এই অসাধ্যসাধন কী ক'রে সম্ভব, তা যদিও আমার জানা নেই, তবু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে, হয়তো এই রহস্যের খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হবে। সকলেই দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনো মিল নাই। গদ্যে তিনি উপমাপ্রয়োগ করেন সাধারণতঃ অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। কিন্তু তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমা তো অর্থাগমের সহায় নয় বটেই, এমনকি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতারও পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও এতে কাব্যের অনিষ্ট ঘটে না; কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, অপরিহার্য শুধু নিষ্ঠা। কাব্যে উপমার একমাত্র কর্তব্য পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া; এবং নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসে না, আসে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকর্ষণে। তাই ব্রহ্মের নির্গুণতা সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তারকেশ্বরের মতো জাগ্রত দেবতা।

এই সনাতন সত্যের নির্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞাপনচিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর স্থান ক্রমশই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন। দেখা গেছে ছবিটি যদি ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়, তবে পণ্যসামগ্রীর গুণকীর্তন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, কেননা সে-অবস্থায় তর্কের সুযোগ হারিয়ে দর্শকের মন কল্পনার দিকে ঝোঁকে; এবং তখন সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে আর সহজে ভুলতে পারে না। কবির উপমাব্যবহারও

এই রকম ; এবং "বলাকা"-র পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপসরমণীর অনুষঙ্গে বেশি পরিস্ফুট হওয়া দূরে থাকুক, বরং একেবারে লোপ পায়। কিন্তু ওই কথা-কটার যাদুতে পাঠক এমন তদ্‌গত চিত্তে ছবি আঁকতে বসে যে সঙ্গতি-অসঙ্গতির খোঁজ-খবর নেওয়া আর তার সাধ্যে কুলায় না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে, নচেৎ সজোরে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলে—একেবারে প্রলাপ। "লিপিকা"-র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা ; তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত ; এবং সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানকে মোহজালে ঘিরে ফেলে, "লিপিকা"-য় তেমনি উপমা আলেখ্যের মায়াকাজল পড়িয়ে তার তর্ক প্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেই জন্যেই "লিপিকা"-র রূপ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমার বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কারণ শুধু এ নয় যে এতদিন পর্যন্ত বাংলা মুক্তচ্ছন্দের একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যেতো ; অধিকন্তু প্রকৃত বাংলার প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য প্রথম এইখানেই আত্মপ্রকাশ করে-ছিলো। তৎসত্ত্বেও "লিপিকা"-র দুর্বলতা নিতান্ত নগণ্য নয় ; এবং সে কবিতা-গুলির প্রসঙ্গনির্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুর পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি জানি বিষয়ের উপরে প্রভুত্ব চলে না ; সে আসে তার নিজের খেয়াল মতো ; সময়ে সময়ে পৃথিবীপর্যটনেও তার সাক্ষাৎ মিলে না, আবার মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহারের অবকাশ সুদ্ধ ঘোচে। তাছাড়া রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন হলেও, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেরণাপ্রসূত। কিন্তু এ-সমস্ত মনে রেখেও "লিপিকা"-র সম্বন্ধে নালিশ চোকে না, প্রশ্ন ওঠে—বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলে না, তবে ছন্দের জীবন্মুক্তি কি অসার্থক নয় ? এবং এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখিয়েছে, তার পাশে ছন্দোমুক্ত "লিপিকা" কেমন যেন সঙ্কীর্ণ। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অবশ্যগ্রাহ্য ঠেকে যে এই বইয়ের সাফল্য-সম্বন্ধে কবির নিজের মনেও দ্বিধা ছিলো ; বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তি এত দূর পর্যন্ত সইবে কিনা, তা তিনি জানতেন না বলেই, "লিপিকা"-র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছিলেন, তার জন্যে এমন প্রসঙ্গ বেছেছিলেন যা সকল রকমে নির্গুণ হয়েও কেবল কৌলিন্যের জোরেই রসোত্তীর্ণ।

"লিপিকা"-র পরবর্তী পুঁথি-কখানিতে এ-সন্দেহ বাড়ে। "শিশু ভোলানাথ",

"প্রবাহিণী", "পূরবী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা যদিও শুধু এগিয়েই চলেছে, তবু প্রকরণ ও পরীক্ষার প্রতি কবির যেন আর দৃক্‌পাত নেই। তার মানে এ নয় যে বইগুলির কাব্যসত্তার তুচ্ছ বা কলাকৌশল শিথিল, তার মানে শুধু এই যে সেগুলির রচনারীতি নবাবিষ্কৃত নয়, পুরাতন রীতিরই পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে-পথেই এগোন, তাঁর অব্যর্থ প্রয়াণ প্রায়ই অমৃতলোকের কাছে থামে; এবং উপরোক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদের সন্দর্শন মিলে, তারা সকলেই উর্বশীর গোত্রসম্ভূত, তাদের মুখে নিশ্চয়ই অনন্ত যৌবনের অবিকার সৌন্দর্য বিদ্যমান, কিন্তু তাদের চোখে নেই অজানার অপার বিস্ময়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রী এই অচলায়তনের স্বপ্নস্বচ্ছ উৎকর্ষ বেশি দিন সইতে পারলেন না; তিনি আবার স্বেচ্ছায় স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এবারে বোধ হয় অমরাবতীর চক্ষু নিরশ্রু রইলো না, নিঃসঙ্গ হলো না কবির প্রত্যাবর্তন; স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁর আকর্ষণে এই ধূলির ধরণীতে নেমে এলেন। অবশ্য দেবীর কণ্ঠে অভ্যস্ত মন্দারমাল্য নেই, মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত করে চলেছে; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁর দিকে চেয়েই বুঝি যে বহিরঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র।

আমি এমন কথা বলছি না যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি কবি পার্বত্য প্রদেশ পছন্দ করেন না, তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্বত্রিক উর্বরতা। এ-কথা যদি তাঁর রুচি-সম্বন্ধে নাও খাটে, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য; সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, তা অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখরগহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার করেও এমন বিশ্বাস পোষণ অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থদুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগোনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবি মাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিরোধ ঘুচলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গী জীবনের মতোই পরিবর্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তী বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয়; চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে মরে, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি বসুধার

স্তুহিতা সীতা; এবং স্বরাজ্য মজ্জায় মজ্জায় না ছড়ালে, নৈরাজ্য অমঙ্গলপ্রদ; তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে অশোক : প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' গ্রন্থখানির (১৯০০) অধিকাংশ কবিতাই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত যাতে ভারতবর্ষের ত্যাগ বীর্য ও মহত্ত্বের আদর্শ উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশ পায়। উপনিষদের পর্ব থেকে মারাঠা পর্ব পর্যন্ত প্রায় সকল কালের ইতিহাস থেকেই তিনি উক্ত আদর্শের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম ও মহত্তম আদর্শ যে রাজর্ষি অশোক, তাঁরই কোনো উল্লেখ নেই এই গ্রন্থের কোনো কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের মতে "ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার উপনিষদ্, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেম মূলক বৌদ্ধধর্ম।" সুতরাং কথা কাব্যটিতে যে বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তা কিছু বিচিত্র নয়। স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরিত্র মহিমার ছবি ফুটে উঠেছে কয়েকটি কবিতায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ যাঁর চরিত্র ও কর্মকে আশ্রয় করে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে, কথা কাব্য তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। কথা কাব্যের পরেও রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় বা নাটকে অশোকের উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ বৌদ্ধ কাহিনী ও আদর্শ মুখ্যতঃ তাঁরই কাব্য নাটকের যোগে বাঙালির কাছে সুপরিচিত হয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামান্য পশুবলির বেদনা তাঁকে রাজর্ষি ও বিসর্জন লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধে অসংখ্য নরবলির যে অনুশোচনা ধর্মপ্রাণ অশোককে চিরকালের জন্য সমর-পরিহারে প্রবর্তনা দিয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের মহৎ লেখনীকে কিছুমাত্র প্রেরণা জোগাল না। অথচ সামান্য ক্রৌঞ্চবধের দুঃখে বাল্মীকি প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। অশোকের কাহিনীতে যে কাব্য ও নাটক রচনার উপযোগিতা নেই ; তাও নয়।

আমাদের দেশে বোধ করি কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনই (১৮৪৭—৯৫) সর্বপ্রথমে অশোক-চরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর 'অশোকচরিত'ই (১৮৯২) সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে অশোকবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।

রবীন্দ্র-বীক্ষা

এই বইখানি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার সুকুমার সেন বলেন যে—

অশোকচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। বইখানিতে লেখকের লিপিচাতুর্যের, ইতিহাস নিষ্ঠার, এবং অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় আছে। পরিশিষ্ট স্বরূপে 'অশোকচরিত' নামে একটি উপাদেয় ক্ষুদ্র নাট্যরচনা সংযোজিত হইয়াছে।

—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড [১ম সংস্করণ], পৃ ২৮৫

বোঝা যাচ্ছে, ঐতিহাসিকের কাছেও অশোকচরিতের নাটকীয়তার আকর্ষণ ছিল। অতঃপর ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৭) এবং গিরিশচন্দ্রও (১৯১১) 'অশোক' নামে নাটক রচনা করেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও অশোক কাহিনীকে ভারতীয় গাথাকাব্যের উপযোগী বিষয় বলে অনুভব করেছিলেন (মহাভারতী, ১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে অশোক চরিত্রগত ভারত মহিমা কিছুমাত্র স্পন্দন জাগাল না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে।

কথা কাব্যের পরে রবীন্দ্রনাথ আর গাথাকবিতা লেখেন নি বলা চলে। সুতরাং অশোক সম্বন্ধে কোনো গাথা লিখলে কথা রচনার সময়েই লিখতেন, এ কথা মনে করা অসংগত নয়। কথার অধিকাংশ কবিতাই ১৮৯৭—৯৯ সালে লেখা। এর উপাখ্যানগুলি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist literature of Nepal (১৮৮২) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 'মালিনী' (১৮৯৬) রচনার সময় থেকেই এই বইটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। এই বই-এর 'অশোকাবদান' অবলম্বনে অশোকের উপরে গাথাকবিতা রচনা করা অনায়াসেই চলত। কিন্তু অশোকাবদানের উপাখ্যানগুলি বাস্তবতা ও মহত্ত্ববর্জিত। সম্ভবতঃ এইজন্যই উক্ত অশোকাবদান থেকে তিনি গাথা বা নাটক রচনার কোনো প্রেরণা পাননি। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বইখানিও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা হিসাবেই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, কৃষ্ণবিহারী দীর্ঘকাল ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে 'নব-নাটক' রচনার সময়ে দেখি তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবার ১৮৮২ সালে ঠাকুর-বাড়ির উৎসাহে রাজেন্দ্রলালের সভাপতিত্বে যে 'সারস্বত-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার যুগ্মসম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় ও রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকারও অন্যতম প্রধান লেখক

ছিলেন কৃষ্ণবিহারী। সাধনার প্রথমবর্ষ থেকেই তাতে তাঁর 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। আর ২য় বর্ষের পৌষসংখ্যাতে তাঁর 'অশোকচরিত' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এখানে ওই সমালোচনাটি সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত করছি।—

এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি ফাউস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। ফাউটিও ফেলার সামগ্রী নহে, উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

—সাধনা, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ১৭৯-৮০

কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' জীবনী খানি যতই সুলিখিত হোক্ এবং তাঁর "অশোকচরিত' নাটিকাখানিও যতই উপাদেয় হোক্, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে কোন প্রবর্তনা পান নি। এমনও হতে পারে যে, কৃষ্ণবিহারী একটি নাটিকা রচনা করেছেন বলেই তিনি এ বিষয়ে মালিনীর ন্যায় নাট্য রচনায় বিরত ছিলেন, আর গাথারচনার উপযোগী উপাখ্যান ও উক্ত ইতিহাস গ্রন্থে পান নি। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথা-নাটকাদি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেননি। রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট, বউঠাকুরাণীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত, মালিনী, কথা, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা প্রভৃতির কথা স্মরণ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং সময় বিশেষে প্রবন্ধ রচনার উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্য-নাট্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার গভীরতা ও বিস্তার কতখানি, তা তাঁর ইতিবৃত্ত-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা

যাবে। এসব প্রবন্ধ সংকলন করে 'ইতিহাস' নামে যে গ্রন্থখানি পরবর্তী কালে (১৩৬২, শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়েছে, তারপ্রতি লক্ষ্য করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

২

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অতি গভীর। ভারতীয় সংস্কৃতির যিনি একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা, তাঁর পক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ না থাকাই বিচিত্র। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জলতম প্রকাশ ঘটেছে দুটি চরিত্রে, সে দুই চরিত্র বুদ্ধ ও অশোক। বুদ্ধ চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সুবিদিত। অশোক চরিত্রের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের কথা তেমন সুপরিজ্ঞাত নয়। তার কারণ কি? মনে হতে পারে যে, বুদ্ধদেব আদর্শ-চরিত্র ধর্মপ্রবর্তক, তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক, অশোক তো সে পর্যায়ভুক্ত নন, তিনি হচ্ছেন মুখ্যত: ইতিহাসের রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাসীনতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ তো শুধু ধর্মবিকাশের ইতিহাসকে নিয়েই নয়; ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি যে বিভাগেই ভারতীয় মহত্বের প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই তাঁর আগ্রহ। তা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ, বাংলাদেশের এই তিনজন যশস্বী ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে যিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে তো ভারতীয় ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অশোকের ন্যায় মহৎ চরিত্রে, আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ অশোক চরিত্রকে কাব্যনাট্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে অবতরণ করেন নি, ঐতিহাসিক মননের ক্ষেত্রে রেখেই তিনি তাঁর মহত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি প্রবন্ধ রচনাকালে প্রয়োজন মত অশোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য স্বভাবতঃই তাঁর কাব্য নাটকাদির মতো জনপ্রিয় নয়; তাই অশোক সম্বন্ধে তাঁর অভিমতও সুবিদিত নয়।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী থেকে অশোক সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করব অশোক চরিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

তার আগে দেখা দরকার, অশোক চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা দেয় কখন। আমার মনে হয় বিংশ শতকের পূর্বে সে আগ্রহ যথোচিত পরিমাণে জন্মেনি। তৎপূর্ববর্তী রবীন্দ্র সাহিত্যে অশোক প্রসঙ্গ আমার চোখে পড়েনি।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এডুইন আর্নল্ডের Light of Asia কাব্য এবং ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে বুদ্ধ চরিত্রের প্রতি আমাদের দেশে শ্রদ্ধান্বিত আগ্রহের সঞ্চার হয় প্রচুর পরিমাণেই। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে (১৮৮৭) এবং নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যে (১৮৯৫) তার সাক্ষ্য রয়েছে। অশোক চরিত্রের প্রতি তৎকালে তেমন আগ্রহ দেখা দেয়নি। রমেশচন্দ্রের History of Civilisation in Ancient India (১৮৯০) গ্রন্থের একটি অধ্যায় এবং কৃষ্ণবিহারীর অশোক চরিত (১৮৯২) তৎকালে এই দুটি ছাড়া ইংরেজীতে বা বাংলাতে অশোক সম্বন্ধে আর কোনো বই ছিল না বললেই হয়। আর এই দুটি বইও এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। বস্তুতঃ অশোকের জীবনও উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাহিনী ও কিংবদন্তীর কুয়াশা ভেদ করে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে ভাল করে ফুটে উঠতে পারেনি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই অশোক চরিত্র ভারত ইতিহাসের উদয়াচলে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেল। ১৯০১ সনে Heritage of India গ্রন্থমালায় ভিন্সেণ্ট স্মিথের Asoka, of Buddhist Emperor of India নামক প্রামাণিক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ওই বৎসরেরই একেবারে শেষ দিকে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির প্রতি বাঙালীর মন আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে অশোকের যথার্থ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে অতি বিশদ ভাবেই। তার দুবছর পরেই প্রকাশিত হয় রিস ডেভিড্‌সের সুবিখ্যাত Buddhist India বইখানি। ঠিক এই সময়েই দেখি রবীন্দ্রনাথও তার কোনো কোনো প্রবন্ধে অশোক সম্বন্ধে অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের বিবরণ ইতিহাস হিসাবেই গভীরভাবে মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩

রবীন্দ্র সাহিত্যে অশোকের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের 'সারবান্ সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে (১২৯৮)—'অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে' এই উক্তিটিতে। উক্ত প্রবন্ধটি রচিত হয় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোক চরিত' প্রকাশের (১৮৯২) কাছাকাছি সময়ে। উদ্‌ধৃত ব্যঙ্গোক্তিটুকুর মধ্যে অশোক চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কোনো পরিচয় আভাসেও প্রকাশ পায়নি। সে পরিচয় প্রকাশ পেতে শুরু করে বিংশ শতকের গোড়া থেকে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

১৯০৩ সালে 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামে একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে অশোক সম্বন্ধে লিখলেন—

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনো কালে মরিবে না, সরিবে না, অনন্ত-কালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন। কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে, অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানব হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল, কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন সে দ্বীপের অরণ্যচারী দ্রুয়িদগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তর স্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্ই হন, তিনি কি চান কি না চান, তাঁহার কাছে কোনটা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এতকাল ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে,…মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে

অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।...সেই চিরস্থায়ীত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা।

—সাহিত্যের সামগ্রী (১৯০৩), সাহিত্য

এই অংশটুকু পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের প্রতি শুধু যে শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন তা নয়, তিনি অশোক ইতিহাসের মূল উপাদান যে অনুশাসনাবলী, তার পাঠোদ্ধারের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়েও গভীর ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গেই বলা উচিত, যে বিদেশী প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে পাহাড়ে খোদাই করা ব্রাহ্মীলিপির মূক ইঙ্গিতপাশ থেকে অশোকের বাণীর উদ্ধার সাধন করে তাঁর অভিপ্রায়কে সার্থকতা দান করলেন, সেই বিদেশী মনস্বীর নাম জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ (১৭৯৯—১৮৪০)। তিনি ১৮৩৪ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠনির্ণয় করতে সমর্থ হন। তারই ফলে অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠ তথা অর্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অশোক আপনার কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর" করতে চেয়েছিলেন, তাঁর হৃদয়ের আদর্শকে চিরস্থায়ীত্ব দিয়ে মানুষের হৃদয়ে অমর করে রাখাই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। একথা যে সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে অশোকের শিলানুশাসনগুলিতেই। তাতে তিনি গর্ব করেই বলেছেন, তার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি উত্তরপুরুষরাও তাঁরই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হক, এই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা। অন্যত্র বলেছেন, তাঁর ধর্মলিপিগুলিকে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে নিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলি চিরস্থায়ী হক এবং তাঁর বংশধরগণ এগুলির অনুবর্তন করুক। "এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপি লিখিতা : চিরথিতিক হোতু তথা চ প্রজা অনুবততু" (পঞ্চম শিলানুশাসন)।

অনেক পরবর্তী কালের একখানি পত্রে (২৮ফেব্রুয়ারী ১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ অশোকলিপির যে কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন এখানে তাও তুলে দেওয়া গেল।—

কাল গাড়ি চলতে চলতে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু সে এমন একটা নাড়া খাওয়া চিঠি, ভূমিকম্পে আগাগোড়া ফাটল ধরা বাড়ির মতো। তার অক্ষরগুলো অশোকস্তম্ভের প্রাচীন অক্ষরের মতো আকার ধরেছে, পড়িয়ে নিতে গেলে রাখাল বাড়ুজ্জের শরণ নিতে হয়।

—পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮)

৪

ইতিহাসে দেখা যায়, এক-এক সময়ে দেশের চিত্ত এক-একটি অসাধারণ

ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে নিজের সমগ্র ও সংহত শক্তিকে অত্যুজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশিত করে। যখন সে রকম অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের অভাব ঘটে তখন সেই শক্তি যদি জাগ্রত থাকে তবে কোনো সাধারণ মানুষকে আশ্রয় করেই স্তব্ধভাবে মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজশক্তি একবার বিপুল ব্যক্তিত্বশালী সম্রাট অশোককে আশ্রয় করে কিরূপ উজ্জ্বল শিখায় দীপ্যমান হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সে ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করেছিল। তাই দেখি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গেই তিনি অশোকের মহৎ দৃষ্টান্তের কথা দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

১৯০৪ সালে দেশের সমাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সংহত করবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ ভাদ্র, পৃঃ ২৫৭) অশোক-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন—

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন।······

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান্ ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে।······ অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তি সঞ্চয়ের সহিত যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য বলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই; কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত হিসাবের সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময় একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল।

—স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), আত্মশক্তি (রচনাবলী ৩)

বোঝা যাচ্ছে—প্রাচীনকালে দেশে একবার বড়োদিন এসেছিল, বড়ো লোকও এসেছিলেন, রাজচক্রবর্তী অশোক; তিনি ছিলেন দেশের সমাজশক্তির প্রতিমাস্বরূপ, তাঁর মধ্যেই দেশের চিত্ত নিজেকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার অবকাশ পেয়েছিল; তাঁর তলবে দেশের সমস্ত হিসাব নিকাশও বড়ো খাতায় প্রস্তুত হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অশোকের প্রতি এমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে অশোক শুধু বৌদ্ধ সমাজেরই প্রতিভূ ছিলেন না; বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নির্বিশেষে তিনি স্বরাজ্যের সকল প্রজারই প্রতিভূপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একথা তাঁরই নির্দেশে উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিলানুশাসনে অক্ষরলিপিতে আজও বিরাজমান রয়েছে।—

দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব পাসংডানি চ পবাজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি, দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে। ন তু তথা দানং ব পূজাব দেবানং পিয়ো সংঞতো যথা কিতি সারবঢী অস সবপাসং ডানং॥

—দ্বাদশ শিলানুশাসন

এর অর্থ॥ দেবগণের প্রিয়দর্শী রাজা [অশোক] প্রব্রাজিত ও গৃহস্থ সর্ব-সম্প্রদায়কেই পূজা করেন (অর্থাৎ সম্মান না করেন), দানের দ্বারা ও অন্য বিবিধ উপায়েই পূজা করেন। কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেরূপ (মহৎ কার্য বলে) মনে করেন না যেরূপ মনে করেন সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধন কে॥

বস্তুতঃ সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি সাধনের চেয়ে মহত্তর কর্ম আর কি হতে পারে? পরে দেখব অশোক শুধু মানুষ নয়, পশুদের কল্যাণসাধনকেও কর্তব্য বলে মনে করতেন। যিনি মানুষ ও পশু উভয়েরই কল্যাণবিধানে তৎপর হয়েছিলেন, তিনি যে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নির্বিশেষে সর্বসম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধিসাধনে ব্রতী হবেন তা বিচিত্র নয়।

৫

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া[১] দর্শন করতে যান (১৩১১ আশ্বিন)। সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও কয়েকজন। তার কয়েকমাস পরেই দেখি 'উৎসবের দিন' নামে এক প্রবন্ধে তিনি অশোকের জীবনাদর্শের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ মাঘ)। এ প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু এর দুবছর পরে লেখা আর এক প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার শিল্পকলার প্রসঙ্গে অশোকের জীবনাদর্শের আর এক বিশিষ্টতার পরিচয়

১। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় আবার যান ১৯১৪ সালে [১৩২১, আশ্বিন]। গীতালির কয়েকটি গান এখানে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে অশোক নির্মিত গুহাগৃহ দেখতে যান; কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধায় তাঁকে পথ থেকেই ফিরে আসতে হয়। দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২০; রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৩৭।

দেন। সে কথা একটু পরেই যথাস্থানে বলা যাবে। তার আগে 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার কার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র তা আমরা সকলেই জানি। সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বমুগ্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না। ইহা যুদ্ধ সজ্জা নহে, দেশ জয় নহে, বাণিজ্য বিস্তার নহে, ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য; ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে, মানুষ আর কোনদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উৎসবের দিন [১৩০৮], ধর্ম

এই অংশটিতে কাব্যের হৃদয়বেগ এবং ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা, দুইই সমপরিমাণে বিদ্যমান আছে। এটি পড়বার সময় কবির তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে এমনই গভীরভাবে সঞ্চারিত হয় যে, অশোকের উপর কোনো কবিতা নেই বলে আক্ষেপ বোধ করবার কোনো অবকাশ থাকে না। বস্তুতঃ 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটির মূলে রয়েছে যে ব্যগ্র হৃদয়বেগ, এই অশোক প্রশস্তিটির মধ্যেও তারই স্পন্দন অনুভূত হয়। দুটি প্রশস্তি রচনারই উপলক্ষ্য হচ্ছে উৎসব দিনের পক্ষে স্বাভাবিক শ্রদ্ধামিশ্রিত আনন্দ-নৈবেদ্য রচনার ব্যাকুলতা। অথচ সে শ্রদ্ধা ও আনন্দ রবীন্দ্রসুলভ গভীর সত্যনিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখানেই কাব্য ও ইতিহাস পরস্পরের অনুষঙ্গী হয়েছে।

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র;
অশোক মন্ত্র তব।

দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রামায়ণে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

[১৩০৯ বৈশাখ] গীতবিতান ১ম সংস্করণ, পৃ ২৪৭

হৃদয়ানুভূতির আবেগঢালা এই গানটি রচনার কালে [১৯০২] রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অশোকের পুণ্যচরিত ও তার মহাজীবনের স্পর্শপূত রাজাসনের কথা জাগরুক ছিল কিনা, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে অশোকাদর্শের কথা সে সময়ে তাঁর মনে থাকা যে অসম্ভব ছিল না, সে কথা বলা যায়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, ১৯০১ সালে ভিনসেণ্ট স্মিথের Asoka এবং সত্যেন্দ্রনাথকৃত 'বৌদ্ধধর্ম' প্রকাশের পরেই শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অশোকের মহান্ জীবনাদর্শের প্রতি।

৬

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে অশোকের শ্রান্তিহীন সেবাপরায়ণতা ও রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিয়োগের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এই মঙ্গলনিষ্ঠতা শুধু যে বিশ্বের দুঃখনিরসন তথা সেবার ব্রতকেই প্রেরণা যোগায় তা নয়, যথার্থ সৌন্দর্য-সৃষ্টির কামনাতেও গতি ও শক্তি দান করে এই মঙ্গলবুদ্ধি। এ বিষয়টা অতি বিশদভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে ১৯০৬ সালে রচিত 'সৌন্দর্য বোধ' নামক প্রবন্ধটিতে। তাতে দেখি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ার শিল্পসৌন্দর্যের প্রসঙ্গে অশোকের মঙ্গল সাধন ব্রতের কথাই উত্থাপন করেছেন [বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌষ]। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক

সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনো জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবন যাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতর কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেই-খানেই, সেই পরম মঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই।

—সৌন্দর্যবোধ [১৯০৬], সাহিত্য

অশোক শুধু যে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের মঙ্গলময় স্মরণক্ষেত্রকেই কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন তা নয়। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের স্পর্শপূত প্রত্যেকটি স্থানকেই অশোক সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা স্মরণীয় করে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৌতম-বুদ্ধের জন্মক্ষেত্র লুম্বিনি গ্রাম এবং ধর্মচক্রপ্রবর্তনক্ষেত্র সারনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭

অনেকস্থলেই রবীন্দ্রনাথ অশোকের নাম করেন না, কিন্তু অশোকের কথা স্মরণ করেই যে তিনি মন্তব্য করেছেন, তাও অস্পষ্ট থাকে না। ১৯১২ সালে রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধের [প্রবাসী ১৩১৯ বৈশাখ] একস্থানে তিনি মন্তব্য করেছেন—

যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন, তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ-এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই প্রায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা [১৯১২], পরিচয়।

'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' বলতে যে অশোকের রাজত্ব কালই সূচিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এ অনুমানের পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, ধর্মসমাজের এই বিভাগের উল্লেখ। অশোকের অনুশাসনগুলিতে পুনঃ পুনঃই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের কথা পাওয়া যায় এবং এই শব্দ দুটিও প্রায় সর্বত্রই একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। যেমন, তৃতীয় শিলানুশাসনে আছে 'ব্রাহ্মণসমনানং সাধু দানং'। আর এ

কথাও সত্য যে, অশোক অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ছাড়া অন্যপ্রকার সমাজভেদের কথা নেই বললেই হয়; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বিভাগগুলির যে কিছুমাত্র উল্লেখ নেই তাও সত্য। তবে অশোকের আমলে ব্রাহ্মণ শ্রমণ ছাড়া 'আর সমস্ত ভেদই লুপ্ত-প্রায়' হয়েছিল কিনা, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়রা জনসাধারণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল কিনা এ কথা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। যা হক, 'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' যে অশোকের রাজত্বকালেরই জ্ঞাপক তাতে দুই মত হতে পারে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ অশোককে বিশেষভাবে বৌদ্ধনৃপতি এবং তাঁর রাজত্বকালকে বিশেষভাবে বৌদ্ধযুগ বলে মনে করতেন, এই অনুমানের হেতু আছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে অশোককে The Buddhist Emperor of India এই বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন; রিস্ ডেভিড্‌সও তাঁর বই এর নাম দিয়েছেন 'Buddhist India;' সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' বইতে অশোককে বৌদ্ধরাজা রূপেই উপস্থাপন করেছেন। আমার মনে হয় এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথও বৌদ্ধযুগ বলতে বিশেষভাবে অশোকের রাজত্বকালের কথাই মনে করতেন। এ রকম যে মনে করতেন তার প্রমাণ দিচ্ছি।

৮

১৯১২ সালেই ইউরোপ যাত্রার প্রাক্‌কালে 'যাত্রার পূর্বপত্র' নামে এক প্রবন্ধে [তত্ত্ববোধিনী : ১৩১৯ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।—

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াশক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোন কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই বিকাশের দিকে উত্তম লাভ করে।

—যাত্রার পূর্বপত্র [১৯১২], পথের সঞ্চয়

এখানে 'বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কাল' বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বোঝাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প ও সাম্রাজ্য শক্তির চরম বিকাশের কথাতেও এই অনুমানই সমর্থিত হয়। উক্ত প্রবন্ধেরই আর এক অংশে এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর সমর্থন পাওয়া যায়।—

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে যখন প্রেমের সেই ত্যাগ ধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা সম্প্রতি ইউরোপে দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা, এমনকি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন ইউরোপের খ্রীস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল, ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে?

—যাত্রার পূর্বপত্র [১৯১২], পথের সঞ্চয়

নামতঃ উল্লিখিত না হলেও অশোকের রাজত্বই যে এই অংশটুকুর লক্ষ্য সে কথা বলে দেবার অপেক্ষাও নেই। কাব্যের আবেগস্পর্শহীন সরল পরিস্রুত ভাষায় অশোক-রাজত্বকালের ইতিহাসকে অতি সংহত আকারে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটুকু পড়তে কোনো কোনো স্থলে অশোকের বাণী যেন কানে ধ্বনিত হতে থাকে। অশোকানুশাসনের অনেক কথাই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। যেমন—

সর্বত বিজিতম্‌হি দেবানম্‌প্রিয়স রাজ্ঞো এবমপি প্রচংতেসু···দ্বে চিকীছা কতা, মনুসচিকীছা চ পসু চিকীছা চ। ওসুধানি চ যানি মনুসপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। মূলানি চ ফলানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেসু কুপা চ খানাপিতা, ব্রছা চ রোপাপিতা পরি ভোগায় পসুমনু সানং॥

দ্বিতীয় শিলানুশাসন।

এর অর্থ॥ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা [অশোকের] রাজ্যের সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত [অর্থাৎ প্রতিবেশী] রাজ্যগুলিতেও মানুষ এবং পশুর জন্য দ্বিবিধ চিকিৎসাব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ এবং পশুদের উপযোগী তরু-গুল্মাদিও যেখানে যেখানে নেই সেই-

সব স্থানেই এনে রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ফলমূল ও যেখানে যা নেই সেখানে তা এনে রোপণ করা হয়েছে। পশু ও মানুষের পরিভোগের জন্য পথে পথে কূপ-খনন ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে॥

অশোক যে সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-সাধনাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা তাঁর অনুশাসনের নানা স্থানেই পাওয়া যায়। আর অস্ত্রশক্তির দ্বারা দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মশক্তির দ্বারা বিশ্ববিজয়ই অশোকের অনুশাসনাবলী তথা তাঁর জীবনাদর্শের মূলকথা, তাও সর্বজন বিদিত। এ সব কথার সমর্থনে অশোকবাণী বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শিলানুশাসন থেকে দু একটি উক্তির উদ্ধৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যেমন, "এবে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবনং প্রিয়স য়ো ধ্রর্মবিজয়ো।......স হি হিদলোকিক পারলোকিকে।" অর্থাৎ, অশোকের মতে ধর্মবিজয়ই শ্রেষ্ঠবিজয়, যাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই কল্যাণ সাধন হয়।

তৎকালে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের অকাতর দুঃখবহনের ফলে কিভাবে 'বর্বরজাতিয়দের সদ্‌গতি' সাধিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের (L. J. Saunders) অভিমত উদ্ধৃত করি।—

The missions of king Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history; for they entered countries for the most part barbarous and full of superstition, and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven. (—L. J. Saunders,)

—The story of Buddhism [১৯১৬], পৃ ৭৬

বৌদ্ধযুগে অর্থাৎ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে প্রেমমূলক ত্যাগধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, আধুনিক যুগে তার প্রতিরূপ দেখা যায় সাম্প্রতিক ইউরোপের খ্রীস্টান সভ্যতার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পক্ষেও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সমর্থন পাওয়া যায়।

অশোকের রাজত্বে [খ্রী-পূ ২৭২—৩২] চিকিৎসা ও আরোগ্যদানের দ্বারা মানুষ ও পশুর সেবার যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং তার প্রভাবও স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল। অশোকের তিরোধানের ছয় শত বৎসরেরও অধিককাল পরে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে

[খ্রী ৩৮ -৪১৩] চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এদেশে ছিলেন মোট ছয় বৎসর [খ্রী ৪০৫—১১], তার মধ্যে তিন বৎসরই কাটান মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময়ে পাটলিপুত্রে একটি অতি উৎকৃষ্ট দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল; এটি পরিচালিত হত দেশের শিক্ষিত উদার হৃদয় ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্যে; রাজ্যের সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় লোকেরা এখানে আসত সর্ববিধ রোগের চিকিৎসার জন্য; রোগের উপশম না হওয়া পর্যন্ত রোগীরা এখানেই থাকত এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মত ওষুধ ও পথ্য দুই-ই পেত বিনামূল্যে; রোগীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এই।—It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, *anticipating the deeds of modern christian charity,* speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of *the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.*

Early History of India [৪র্থ সংস্করণ] পৃ ৩১২—১৩

আলোচ্যমান প্রসঙ্গের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথাগুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। যা হক স্মিথের এই অভিমত থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আধুনিক ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রেম ত্যাগের মহান্ আদর্শ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের যুগেই এদেশের সমাজে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ 'যাত্রার পূর্বপত্র' থেকে যে দুটি অংশ উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে কল্পনা ও ভাবাবেগের স্পর্শ মাত্রও নেই, আছে নিছক ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত একান্তরূপে বাস্তব জীবনাদর্শগত গভীর চিন্তার ছাপ।

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার অশোকের আদর্শের কথা উত্থাপন করেন 'স্বাধিকার প্রমত্ত': নামক প্রবন্ধটিতে [প্রবাসী, ১৩২৪ মাঘ]। এবার মৌর্যসম্রাট অশোকের কথা উত্থাপিত হয় মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর ধর্মগত আদর্শের তুলনা উপলক্ষে।—

বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়,

একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই জন্যেই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতল মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

—স্বাধিকার প্রমত্ত : [১৯১৮] কালান্তর।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ অশোকের 'ধর্মবিজয়' আদর্শের কথা স্মরণ করেই এই মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অশোকের ধর্মবিজয়ের দুটি দিক ছিল, —একদিক তাঁর স্বরাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত, আর একদিক তাঁর পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত। প্রতিবেশী নৃপতিদের রাজ্যে 'ধর্মদূত' পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে মৈত্রীসম্বন্ধ স্থাপন এই ছিল, অশোকের পররাজ্য ধর্মবিজয়নীতির লক্ষ্য। এই ধর্মবিজিত পররাজ্যগুলিও অশোকের ধর্মসাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলে গণ্য। পক্ষান্তরে নিজরাজ্যের সর্বত্র ধর্মমহামাত্র প্রমুখ রাজপুরুষের নিয়োগ। ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার ও সর্বশ্রেণীর প্রজার সমান কল্যাণসাধনের দ্বারা ধর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা, এই ছিল অশোকের স্বরাজ্যে ধর্মবিজয়নীতির লক্ষ্য। এইভাবেই অশোক অস্ত্রবিজিত স্বরাজ্যকেও ধর্মবিজয়ের দ্বারা ধর্মসাম্রাজ্যে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আকবর অশোকানুসৃত ধর্মবিজয় নীতির এই দ্বিতীয়াংশকেই আশ্রয় করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি তার অস্ত্রবিজিত সাম্রাজ্যকেই ধর্মবিজিত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পররাজ্যে ধর্ম বিজয়ের প্রয়াস আকবর করেন নি।

উভয়ক্ষেত্রেই অস্ত্রবিজিত রাষ্ট্রসাম্রাজ্যকে মৈত্রীবিজিত ধর্মসাম্রাজ্যরূপে গড়ে তোলবার ফলও হয়েছিল একইপ্রকারের। অশোকের আমলে যেমন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়ে জাতীয় জীবনে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, আকবরের সময়েও তেমনি হিন্দু সাধু ও সুফি ফকিরদের সাধনায় জাতীয় চিত্তে ঐক্যের সত্য অধিষ্ঠান রচিত হচ্ছিল। তা ছাড়া সর্বধর্মের 'সারবৃদ্ধি' ও 'সমবায়' নীতির দ্বারা অশোক যেমন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আকবরও তেমনি তাঁর সুল্‌হ্‌-ই-কুল [সর্বধর্মে সমদৃষ্টি] নীতি, জিজিয়া কর বর্জন এবং ইবাদতাখানা [সমবেত উপাসনা-গৃহ] প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন নির্বিশেষে সর্বজনীন মিলনভূমি রচনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আকবরের 'দীন ইলাহী'র আদর্শও

স্মরণীয়। ধর্মসাম্রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ সর্বজনের কল্যাণসাধন। এই ক্ষেত্রেও অশোক ও আকবরের নিরলস প্রয়াসের বর্ণনায় ইতিহাস মুখর। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

'স্বাধিকার প্রমত্তঃ' প্রবন্ধ প্রকাশের [১৩২৪, মাঘ] কিছুকাল পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি রচনাতেও অশোক এবং আকবরের কথা একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে বিধাতার রচিত ইতিহাসের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে।—

> বিধাতার রচা ইতিহাসে আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুই কথায় মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে-রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য।
>
> —গল্প বল : প্রবাসী ১৩২৭ বৈশাখ

এই রচনাটি পরে সংকলিত হয়েছে 'লিপিকা' গ্রন্থে [১৯২২] 'গল্প' নামে। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার সত্য দৃষ্টান্ত হিসাবেই ভারত-ইতিহাস থেকে অশোক ও আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। 'স্বাধিকার প্রমত্তঃ' প্রবন্ধে প্রকাশিত অভিমতের সঙ্গে এই উক্তির যে সংগতি দেখা যায়, তা তাৎপর্যহীন নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মপদং'-নামক প্রবন্ধের [বঙ্গদর্শন, ১৩১২] একটি উক্তিও স্মরণযোগ্য।—

> আমাদের দেশে মোগল শাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে; রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।
>
> —ধর্মপদং [১৯০৫] ভারতবর্ষ : প্রাচীন সাহিত্য

শিবাজীর ধর্মাদর্শও যে অশোক-আকবরের মতো সর্বংসহানীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রচেষ্টাকে ধর্মচেষ্টার অঙ্গীভূত করা অর্থাৎ অস্ত্রার্জিত রাজ্যকেও ধর্মার্জিত রাজ্যে পরিণত করাই যে ভারতবর্ষের আদর্শ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অশোক, আকবর ও শিবাজীর ইতিহাসে। এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, অস্ত্রার্জিত রাজ্যকে ধর্মরাজ্যে পরিণত করার আদর্শ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় অশোকের জীবনসাধনার ফলে। আর এই

আদর্শ ভারতবর্ষের চিত্তকে এমনই গভীরভাবে অধিকার করেছিল যে এ দেশের কল্পনালোকেও রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আদর্শায়িত রাজা 'ধর্মরাজ'-রূপে চিত্রিত ও অভিহিত হয়েছেন। এ হচ্ছে—বাস্তবানুসারী কল্পনার এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রেও এই আদর্শের অনুবর্তন বন্ধ ছিল না। তাই আকবর ও শিবাজীর রাষ্ট্রচেষ্টা অতি সাম্প্রদায়িক ধর্মনীতিকে আশ্রয় করতে ভোলেনি। এই সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ধর্ম প্রতিষ্ঠ রাজ্যকেই আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় কল্যাণরাষ্ট্র।

১০

'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ অশোকের সময়ে এবং তৎপরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের ত্যাগধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করে ভারতীয় ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথে উত্তীর্ণ হয়ে মানবকল্যাণের জন্যে অকাতরে দুঃখ বহন করেছেন এবং ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করেই ভক্তগণকে 'বীর্যবান্ মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা' দান করেছিল। বুদ্ধদেব ও অশোকের ধর্মপ্রেরণার প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত দীর্ঘকাল পরেও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৩৫ সালে [বাংলা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৪, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি] কলকাতার শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধজন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তাতেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ভাষায়। ভাষণটি "বুদ্ধদেব' প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় [প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ৩০২-০৩]। তাতে তিনি বলেন—

ভগবান্ বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোক সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের মানব ইতিহাসে, তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে।…তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন যা দুঃসাধ্য যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্বমহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান্ পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তাঁর জয়ধ্বনি,—শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তে, নির্জন গুহায়।

এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ। অহিংস্র ধর্মের মহিমা প্রকাশ করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড় রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে ?

—বুদ্ধদেব [১৯৩৫], বুদ্ধদেব

এই যে সকল কালের সকল মানুষের কল্যাণসাধনার প্রেরণা, অশোকের অনুশাসনে তার প্রকাশ ঘটেছে বার বার। যেমন— নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতংপা" [৬ষ্ঠ শিলানুশাসন], অর্থাৎ সর্বলোকের হিত সাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নেই। বুদ্ধের বাণীতে এই যে সকল মানুষের স্বীকৃতি, তাকে সর্বতোভাবে রূপ দিয়েছিলেন অশোক, আর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বাইরে দেশ-দেশান্তরে তাকে ব্যাপ্তিও দিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু এ কাজ সহজ ছিল না। অশোক নিজেই বলেছেন, —"কলানং দুকরং। যো আদিকরো কলাণস সো দুকরং করোতি" [৫ম শিলানুশাসন], অর্থাৎ কল্যাণ দুষ্কর, যিনি আদি কল্যাণকর তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন। বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই যে,—এ ধর্ম দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাতে বীর্যের স্থান নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কঠিন বীর্যের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। যে প্রেমময় ত্যাগের আবেগ মানুষকে মানবকল্যাণের জন্য দেশ-দেশান্তরে দুর্গমে দুস্তরে অভিযান করতে প্রেরণা দেয়, নিজের প্রাণ ও আরামকে তুচ্ছ করে দুঃখের মহত্ত্বকে বরণ করতে শিক্ষা দেয়, সেই ত্যাগপ্রতিষ্ঠ প্রেমের বীর্য-বত্তার তুলনা কোথায় ? এই প্রেমের বীর্যই দুঃসাধ্য সাধনে, সংগ্রাম জয়ে ও সমস্ত বন্ধন ছেদনে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই 'অজেয় প্রেমের' প্রভাব ও প্রেরণা কতখানি, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর 'বোরোবুদুর' ও 'সিয়াম' কবিতায় [পরিশেষ কাব্যে]। ভগবান বুদ্ধ মানুষের অন্তরে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন কঠিন সাধনা ও দুঃসাধ্য প্রকাশের দিকে। সে প্রেরণা—

মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে,...
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে, মন্দিরে, মূর্তিতে।

—সিয়াম, প্রথম দর্শনে [১৯২৭], পরিশেষ

রবীন্দ্রনাথের অভিমতে এ সমস্ত কীর্তির চেয়েও মহত্তর রাজাধিরাজ অশোকের

চরিত্রমহিমা, তাঁর ত্যাগনিষ্ঠা ও কল্যাণব্রত, আর এই জন্যই মানুষের ইতিহাস জগতের শ্রেষ্ঠতম রাজার মর্যাদা নিবেদন করেছে তাঁকেই। অশোক নিজের অন্তরের হিংসাকে দমন করে সর্বজগতে অহিংসা প্রেম ও কল্যাণের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্রত ধারণ করলেন। বুদ্ধের চরণে এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য আর কি হতে পারে? মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে সমুদ্রকূলে বিচিত্র কর্মকীর্তি প্রতিষ্ঠার চেয়েও এই চিত্ত-মার্জনার ব্রত যে মহত্তর, দুঃসাধ্যতর এবং অধিকতর ত্যাগ ও বীর্যবত্তার পরিচায়ক, তাতে কি সন্দেহ আছে?

১১

১৯৪০ সালে হিল্‌ডা সেলিগম্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা ভারতবর্ষের মৌর্যরাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। বইটির নাম 'When Peacocks called'। রবীন্দ্রনাথ এটির একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেন মৃত্যুর অল্পকাল মাত্র পূর্বে। ওই ভূমিকাটিতেও অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত অভিমতই সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃঢ় ভাষায় পুনঃপ্রকাশ পেয়েছে।—

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of *a great humanism which came with King Asoke of India.* My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through essage which has a *perennially modern* significance.

—Foreward (1940), When Peacocks called.

বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথাগুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবের মধ্যেও অশোক যে মহৎ মানবিক আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আজও তা জগতের অভীষ্টস্থানীয় হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎ-ল অশোকের কর্মপ্রেরণা বিশ্ববাসীকে যে 'বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা' গ্রহণ

১। সেলিগম্যানের এই উপন্যাসখানি সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভ করেছে এবং এটির একটি ভারতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে [১৯৫১]। প্রকাশক—হিন্দকিতাব, বম্বে।

করতে আহ্বান করেছিল, আজকের দিনেও তার মহনীয়তা কিছুমাত্র কমেনি। কারণ বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অশোকের সাধনাপুষ্ট ওই মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ "চিরকালের আধুনিক' অর্থাৎ চিরন্তন।

তাই দেখি মহৎ মনুষ্যত্বের প্রেরণাদাতা হিসাবে অশোকের সম্বন্ধে ১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৯৪০ সালেও তাঁর সে শ্রদ্ধা সমভাবেই উজ্জ্বল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের লেখনি থেকে একমাত্র বুদ্ধদেব ছাড়া ভারতবর্ষের অধুনাপূর্ব যুগের আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিই বোধ করি অশোকের মত এমন অকুণ্ঠ ও অজস্র প্রশস্তির অঞ্জলি লাভ করতে পারেননি॥ *

* 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকায় [পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৬১ প্রবারণা পূর্ণিমা, পৃ ৩৩-৩১] প্রকাশিত 'রবীন্দ্র সাহিত্যে অশোক' প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক অংশতঃ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত রূপ। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—

[১] মহাসম্রাট অশোক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগজ্জ্যোতিঃ, তৃতীয় বর্ষ—প্রথম সংখ্যা [১৩৫৯ প্রবারণা পূর্ণিমা], পৃ ৩-৪, এবং ইতিহাস, তৃতীয় বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা [১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ] পৃ ২১৭-২২।

[২] রবীন্দ্র সাহিত্যে অশোক—প্রবোধচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ১৮৯-৯৭ এবং মাঘ-চৈত্র, পৃ ১৩৯-৪১।

রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গী : শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

(রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প তিনটি তাঁহার 'তিন সঙ্গী' নামক সংগ্রহ গ্রন্থে ১৩৪৭ পৌষ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তিনটি গল্পের রচনাকাল 'রবিবার' [১৩৪৬] 'শেষ কথা' [১৩৪৮] ও 'ল্যাবরেটরী' [১৩৪৭]। এই গল্প তিনটি তাঁহার ছোট গল্পের স্বর্ণযুগ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে লেখা।) ইতিমধ্যে বাঙলার সমাজ-জীবনে ও প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোলোকে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের জীবন আর কালপরম্পরাগত সমাজ ঐতিহ্যের বন্ধনে সুরক্ষিত নহে। তাহাদের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে চির-প্রথাগত সমাজনীতিকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত অভিরুচি ও ঔচিত্য বোধের আশ্রয়ে স্ফূরিত হইতেছে। পূর্বে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগণের যে বিদ্রোহ তাহার মধ্যে অনেকখানি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনা সাঞ্চত ছিল। এখন সংঘর্ষ কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আদর্শমূলক। এই সংঘর্ষ হইতে সমাজের মধ্যবর্তিতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্বে সমাজের সমষ্টিগত বিবেক ও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিবোধ বিরোধকে একটা সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করিয়া উহার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও অনেকটা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। কিন্তু সমাজ-নিয়ন্ত্রণ শক্তিহীন হইলে ব্যক্তিত্ব-মূলক সংঘর্ষ অসংখ্য বৈচিত্র্যের শাখাপথে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যক্তিক মতানৈক্য ও আদর্শ ভেদ সমস্ত পূর্বানুমানকে বিপর্যস্ত করিয়া অপ্রত্যাশিত নূতন নূতন বিষয় অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সংঘাতের পরিধি যতই বিস্তৃত হইল, ইহার গভীরতা সেই পরিমাণে কমিতে লাগিল। চিরকালের সম্পর্কের মধ্যে বহু-পরিমাণ ভাবাবেগ সঞ্চিত থাকে, কেননা এই সম্পর্কের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব সংস্কার আমাদের মনকে গভীর রস অনুভব করিবার জন্য প্রস্তুত রাখে। পিতা-পুত্রে বা স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ও তজ্জনিত বিচ্ছেদ আমাদিগকে যুগ যুগ হইতে সাঞ্চত করুণ রসে অভিষিক্ত করে এবং লেখকও এই অতীত ভাবাসঙ্গের সহায়তায় সহজেই আমাদের মনকে প্রভাবিত করিতে পারেন। কিন্তু অতীত ঐতিহ্যমুক্ত,

পূর্বসঞ্চিত ভাবরসের সহিত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি-সংঘর্ষ নিজ একক, অসমর্থিত উৎকর্ষেই আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে। ইহাকে আমাদের নিকট গ্রহণীয় করিতে হইলে আরও কঠোরতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই জাতীয় বিরোধমূলক গল্পে সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম মানস প্রতিক্রিয়া বর্ণনা ও মননশীল মতবাদ বিচারই চমৎকৃতি বোধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে—গভীর রসাবগাহনের সেরূপ সুযোগ ঘটে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যেমন অর্জুন ও ভীম শরক্ষেপের দ্বারাই নিজ নিজ প্রণতি ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক গল্পলেখকও সেইরূপ বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রয়োগেই আমাদের চিত্ত জয় ও প্রশংসা আদায় করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পগুলিতে বাঙালী সমাজের এই সংহতিলোপ ও ইহার যদৃচ্ছাক্রমে গঠিত ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীতে বিভাজনই প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্ব যুগের শেষ পর্যায়ের কিছু কিছু গল্পে—'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'নামঞ্জুর গল্প' প্রভৃতিতে এই পরিবর্তনের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসেও শিথিলতর সমাজ ও পরিবার পরিবেশের পট-ভূমিকায় একক বা দ্বৈত জীবনের ব্যক্তি সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তথাপি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'তিন সঙ্গী'-তে আমরা যেন খানিকটা বিস্ময় বোধ না করিয়া পারি না। পরমায়ুর শেষ বিন্দুতে সংলগ্ন লেখন যেন অতি দ্রুতবেগে আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খলা ও মানস নৈরাজ্যের নাগাইল ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, দীর্ঘ-অনুশীলিত স্বভাব-সুষমাকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংক্রিয়, অস্থির উৎকেন্দ্রিকতার অবলম্বনে সমকালীন যুগের ছন্দোহীন জীবনকে যেন তীক্ষ্ণ মননের সূচ্যগ্রে গাঁথিতে চাহিতেছেন। অতীত সমাজজীবনের শেষ রসবিন্দু শোষণ করিয়া তিনি যে সমস্ত অপূর্ব গল্প রচনা করিয়াছেন, এই অন্তিম গল্পগুলি যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণাসম্ভূত।

'রবিবার' গল্পের ভূমিকায় অভীকের বংশপরিচয় ও কুলাচারের স্পর্ধিত উল্লঙ্ঘনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পিতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে। এই ভূমিকাটুকুর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। অভীকের উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ একেবারেই বংশের ঐতিহ্য গৌরবের স্মৃতি লাঞ্ছিত নহে। তাহার বাঁধন কাটিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় নাই। বাঁধনের কলঙ্ক চিহ্নও তাহার দেহে বা মনে কোথাও দাগ কাটে নাই। সে যে বড়লোকের ছেলে ও ধনী পরিমণ্ডলের সাহচর্যে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য বরণে তাহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই বা পূর্ব-অভ্যাসের কোনো বাধা নাই এইটুকু

জ্ঞাতব্যই তাহার সম্বন্ধে আহরণ করা যায়। তাহার নাস্তিকতার একটু প্রয়োজন আছে, কেননা বিভার সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক জটিলতার সূত্রপাত হইয়াছে, বিভার ধর্মবোধের সঙ্গে ‘সামঞ্জস্য তাহার একটা প্রধান সূত্র। অবশ্য অভীকের নাস্তিকতা খুব মারাত্মক ধরনের নহে, কেননা দুর্গা পূজার আয়োজনে তাহার কোন নৈতিক বাধা নাই এবং বিভার সঙ্গে তাহার এই বিষয়ে মতভেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণও নয়।

অভীকের সঙ্গে বিভার সম্পর্কটি পরিস্ফুট হইয়াছে একটি বৃহৎ ও মননদীপ্ত সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে। তাহাতে অভীকের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অভীকের নাস্তিকতা বিভার সঙ্গে তাহার মিলনের অনতিক্রম্য বাধা। এই বাধার উপর অভীক নানাদিক হইতে আঘাত হানিয়াছে, কখনও যুক্তি, কখনও বিভার প্রেমের ও সহানুভূতির নিকট আবেদন। কিন্তু বিভা অভীকের আকর্ষণ স্বীকার করিলেও নিজ সংকল্পে অটল রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়াও কথা কাটাকাটি চলিয়াছে। অভীক চিত্রকর, কিন্তু তাহার চিত্র প্রথানুগামী না হওয়ায় দেশের আইনে-বাঁধা সমালোচক মহলে না মঞ্জুর। বিভাও তাহার স্বাধীন চিত্ততার জন্য অভীকের ছবির স্তাবক গোষ্ঠীতে যোগ দেয় নাই। বিভার অনুমোদন পাওয়ার জন্য অভীকেব আছে একটা দুর্বলতা ও উহার সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে সে উহার প্রশংসা-অর্জনে বিশেষ উৎসুক। বিভার সত্যনিষ্ঠা এখানেও অটল, যদিও সে অভীকের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠায় আস্থাশীল। তৃতীয়, অভীকের আসার সদ্যোকারণ হইল একটি মৃত বান্ধবীর উপহার ঘড়ি বিক্রয় করিয়া আট শত টাকা প্রাপ্তি। এই টাকায় সে একটা নূতন গাড়ী কিনিয়া তাহার ভক্ত ও অনুরাগিণী শীমাকে ভাল মোটরে চড়াইবে। এই প্রসঙ্গে অভীকের জীবনে নারীর আকর্ষণ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে একটি বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। অভীক বিভার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিতে তাহার জীবনে নারীসঙ্গের প্রেরণার কথা একটু জোর করিয়া বলিয়াছে। বিভা ইহাতে নারীর অমর্যাদাই দেখিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অভীক প্রার্থিত টাকা না লইয়া, কিন্তু বিভার হারটি হস্তগত করিয়া বিদায় লইয়াছে ও বিলাত যাত্রার স্টীমার হইতে হার চুরি স্বীকার করিয়া ও বিভাকে ভালবাসিয়া সে যে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানাইয়াছে। তাহার চিঠির উপসংহারে সে যে ফিরিয়া আসিয়া বিভার মতই মানিয়া লইবে ও তাহার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিবে এই আশ্বাসও দিয়াছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটিতে একদিনের কথোপকথনে একটা বহু দিনের অনিশ্চিত সম্পর্কের যথার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য তর্কের দ্বারা যতদূর বোঝাবুঝি সম্ভব তাহা হয়তো সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণের অন্তরালে উভয়ের চরিত্র কতদূর স্পষ্টীকৃত হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাস্য। অভীকের খামখেয়ালী আচরণ ও রুচির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু ধরা পড়িয়াছে কি? সে দুর্গাপূজায় তাহার অন্যান্য নাস্তিকতাধর্মের খানিকটা বিসর্জন দিয়াছিল, এখন প্রণয় দেবীর পূজাবেদীতে বাকীটা বলি দিল। বিভা অনেক ভাল কথা বলিয়াছে ও ততোধিক ভাল কাজ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প 'শেষ কথা'-য় পূর্ব পর্যায়ের রোমান্টিক সুর ও পরিবেশ খানিকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। গল্পের ভূমিকায় নায়কের যে দীর্ঘ আত্মপরিচয় তাহা অবশ্য রোমান্স-বিরোধী, আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার বস্তু গবেষণা-সম্পৃক্ত। কিন্তু ছোটনাগপুরের আরণ্যভূমি যেমন একদিকে ভূতত্ত্ববিদের কর্মক্ষেত্র, তেমনি রোমান্সবিলাসীও সেই একই পরিবেশে নিজ প্রণয়াবেশের বিলাসকুঞ্জ আবিষ্কার করিতে পারে। এখানে যেমন বৈজ্ঞানিক মূল্যবান পাথর খোঁজে, তেমনি প্রেমিক মানসপ্রিয়ারূপ স্ত্রীরত্নকেও খুঁজিয়া পায়। এখানে এই যুগ্ম অনুসন্ধান-পালা এক সঙ্গে চলিয়াছে। প্রৌঢ় বিজ্ঞান-সাধক নবীনমাধব এখানকার পঞ্চবটী বনে এক বনলক্ষ্মীর সন্ধান পাইয়াছে—অথবা বনলক্ষ্মীই তাহার অন্যমনস্কতাকে জয় করিবার জন্য তাহার যাতায়াতের পথে আপনাকে খুব দুষ্প্রাপ্য করে নাই। এই বনলক্ষ্মীর এক ব্যর্থ প্রণয়ের অতীত ইতিহাস আছে; তাহার জ্যোতির্মণ্ডলের চারিদিকে একটা ব্যথাভরা অভিজ্ঞতা এক তীক্ষ্ণ আলো-ছায়ার বিভ্রান্তিকর রহস্যলোক রচনা করিয়াছে। শিকারী লক্ষ্যবিদ্ধ চিত্র বাঘিনীর মত সে যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হয় তেমনি আমার অরণ্যচ্ছায়ায় আত্মগোপনও করে, তাহার মন প্রকাশ—অবদমনের সন্ধিস্থলে দ্বিধাদোদুল। তাহার অভিভাবক অধ্যাপক অনিলকুমার সরকার তাঁহার একমাত্র স্নেহপাত্রী পৌত্রীর হৃদয়-ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিবার জন্য দেশবিশ্রুত অধ্যাপনা-খ্যাতির মায়া কাটাইয়া এই নির্জনবাসে তাহার অনুগমন করিয়াছেন।

এই পটভূমিকা যেরূপ বিস্তৃত, উহার নাট্য ঘটনাটি তাহার তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে "ছোট গল্পের আদি ও অন্তে বিশেষ ব্যবধান থাকে না।" নায়ক-নায়িকার প্রথম আলাপ উভয় পক্ষীয় লজ্জা-সঙ্কোচ-

দ্বিধাগ্রস্ততা কাটাইয়া একদিন ঘটিল ও দ্রুতবেগে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উন্নীত হইল। কিন্তু নায়িকা হাস্যপরিহাসে যতটা মুখর, তর্কযুদ্ধে যতটা অগ্রসর, হৃদয় নিবেদনের দিকে ততটাই মন্থর ও অনিশ্চিত। পূর্ব গল্পের ন্যায় এখানেও সংলাপ ও বর্ণনা মনন-তীক্ষ্ণ ও প্রকাশদ্যুতিভাস্বর। অচিরার অতি মুখরতা ও বাক্‌-বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে তাহার দাদু যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—তাহার স্বভাবভীরুতা ও লজ্জাশীলতারই ইহা একটা ছদ্ম প্রকাশ ও তাহার ব্যর্থ প্রেমের আঘাতই তাহার এই আচরণগত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অচিরা ও নবীনমাধবের অকস্মাৎ-অঙ্কুরিত প্রেম অচিরার বিমুখতাতেই আর বিকশিত হইতে পারিল না। তাহার নিজের আপত্তি এই যে দ্বিতীয় প্রেমে সতীত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়—প্রথম ভালবাসা বিশুদ্ধ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাব-নির্যাস, দ্বিতীয়ে ব্যক্তিগত আসক্তির খাদ মিশিয়াছে। আর নবীনমাধবের দিক হইতে এই নারীপ্রেম তাহার জ্ঞানসাধনার আদর্শের পরিপন্থী। সুতরাং অনেকটা লাবণ্য-অমিতের বাস্তব-অসহিষ্ণু আদর্শ ভাবসর্বস্ব প্রেমের ন্যায় এই প্রেমও আত্মসংহরণের দিব্য পরিণাম নিবাচন করিয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে পারস্পরিক ঋণ স্বীকারের ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্য-উপসংহারের অভাবনীয়তার এ ক্ষেত্রে অভাব।

উৎকট অসাধারণত্বের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে তৃতীয় গল্প 'ল্যাবরেটরি'-তে। ইহা অনেকটা ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসের মতই আয়ত পরিসর। গল্পের আরম্ভ নন্দকিশোরের দুঃসাহসিক ও নীতিবাধামুক্ত বিজ্ঞানচর্চা ও উচ্চতম মানের বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ণনায়। এই সাধনায় রত থাকার কালে তাহার সঙ্গে আলাপ হইল পাঞ্জাবী-যুবতীসোহিনীর। এই মেয়েটি বুদ্ধিতে যেমন ধারাল, চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যে সেইরূপ অসাধারণ। নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর বিজ্ঞানাগার-পরিচালনাই সোহিনীর জীবনে প্রধান ব্রত হইল ও সমগ্র গল্পটি এই ব্রত উদ্‌যাপনেরই ইতিহাস।

স্বামীর সঙ্কল্পপূরণ যদি সোহিনীর ব্রত, তবে মেয়ে নীলার অভিভাবকত্ব ছিল তাহার সমস্যা। নীলার মোহাবিষ্ট ও শাসনাতীত যৌবন-চাঞ্চল্যকে কঠোরভাবে নিয়মিত-অবদমিত করার কাজেই তাহার মাতৃকর্তব্য নিয়োজিত হইল। কিন্তু তাহাতে মেয়ের চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ দৃঢ়ভাবে অবরুদ্ধ হইলেও তাহার মনের উচ্ছৃঙ্খল অভিলাষ কোন সংযমের বন্ধন স্বীকার করিল না। সোহিনী নীলার জন্য বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ছাত্র রেবতী ভট্টাচার্যকে বশীভূত করিতে চাহিল ও এই ভাবী জামাতার হাতে যৌতুকস্বরূপ বিজ্ঞানমন্দিরের দায়িত্ব অর্পণ করিতে মনস্থ

করিল। রেবতীকে হাত করিবার জন্য সোহিনী তাহার পূর্বশিক্ষক মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে আদর-আপ্যায়নসহ প্রেমাভিনয় করিতেও ইতস্তত: করিল না। উদ্দেশ্যের সাধু একনিষ্ঠতার পর্বে দেহের দ্বিচারিণীত্বের অপবাদ স্বীকার করিতেও সে প্রস্তুত। এখানেই তার চরিত্রের মৌলিক গৌরব। রবীন্দ্রনাথ সতীত্বের এই নূতন আদর্শের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রসস্তিজ্ঞাপন করিয়াছেন। উভয়ের বাক্-বিনিময় রচনার শাণিত সরসতায় উপভোগ্য। রেবতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে সোহিনী তাহার সমস্ত মোহিনী শক্তির একত্র সমাবেশে এক ঐন্দ্রজালিক ভাবাবহ সৃষ্টি করিল। মাতার স্নেহ, পূজারিণীর ভক্তি, বৈজ্ঞানিক ঘরনীর বিজ্ঞানবিদ্যার বৈদগ্ধ্য, নীলার নেপথ্য বিধানে মায়াজাল বিস্তার—এ সমস্তই রেবতীর উদাসীন চিত্ত জয়ের অভিচার-মন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইল। রেবতীর পিসিমার শাসনস্তিমিত মনকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়া জানাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব অধ্যাপক চৌধুরীই গ্রহণ করিলেন এবং তাহার এই কাযের পুরস্কারস্বরূপ সোহিনী তাহার চুম্বনের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। রেবতীর মনের ভিজে কাঠে আগুন ধরে, কিন্তু দীপ্ত হয় না।

কিন্তু এই চমৎকার ব্যবস্থাপনায় ফাটল ধরাইল নীলার দুর্দম তারুণ্য। যে কাজের জন্য—এত পরিশ্রমে সমিধ্-সংগ্রহ হইল তাহার বিঘ্ন ঘটাইল সে। মায়ের শাসনের বিরুদ্ধে সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ও মায়াবিনী অপ্সরীর রূপ ধরিয়া জ্ঞানতাপস রেবতীর তপশ্চর্যা ভঙ্গ করিতে লাগিল। এই সময় সোহিনীকে অম্বালা চলিয়া যাইতে হইল, কিন্তু যাইবার পূর্বে রেবতীও নীলার প্রতি সে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গেল।

এই নিষেধাজ্ঞায় বিশেষ কোন ফল হইল না। নীলা যে মোহিনী বিদ্যায় মাতাকেও ছাড়াইয়া যায় তাহার প্রচুর প্রমাণ মিলিল। সে নানা মায়াজাল বিস্তার করিয়া রেবতীকে জ্ঞানসাধনার ব্রতচ্যুত করিল ও সস্তা আমোদ-প্রমোদ ও অলীক খ্যাতির মোহে তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। সরল ও অনভিজ্ঞ রেবতীর প্রতি মিথ্যা প্রেমনিবেদনেও তাহার কোন সংকোচ দেখা গেল না। মা ও মেয়ে খানিকটা একই ধাতুর তৈয়ারি, তবে মাতার আদর্শনিষ্ঠা মেয়ের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। রেবতীকে বাঁদর-নাচানোর অধ্যায়গুলি উপভোগ্য হইলেও গল্পের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিথিল-সংসক্ত ও অতি পল্লবিত।

সোহিনী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যাপারের আশু সমাধান করিল। রেবতীকে ল্যাবরেটরি হইতে দূর করিল। নীলার পিতৃসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের আশা

তাহার পিতৃত্ব-রহস্য প্রকাশ করিয়া একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। যেমন পূর্বপর্যায়ের একটি গল্পে কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে পূর্বে মরে নাই। তেমনি সোহিনী তাহার অসতীত্ব ঘোষণা দ্বারাই তাহার সতীত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিল। এই অসতী-সতীর নিষ্ঠা ও সাহস যেমন রবীন্দ্রনাথের এক নূতন নীতি-বাদের পরিচয়ে আমাদিগকে বিস্মিত করিল, সেইরূপ রেবতীর নীরবে পিসিমার আজ্ঞানুবর্তিতা গল্পের সমস্ত ঘোলা জলকে এক মুহূর্তেই থিতাইয়া দিল। এক অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্যের অতর্কিত ধাক্কার মধ্যেই গল্পের যত্ন রচিত প্রাসাদটি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই গল্পের মধ্যে এক সোহিনীর চরিত্রের মধ্যেই খানিকটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। কিন্তু এই চরিত্রকে সম্পূর্ণ ফুটাইবার জন্য যে প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলা বিন্যাসের প্রয়োজন তাহার আয়োজন হয় নাই। যে ঘূর্ণিবায়ুর বেগে কাহিনীটি অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে ইহার পূর্ণ তাৎপর্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়াছে। সোহিনী চরিত্র নিজ গতিবেগে আপন পরিবেশ গড়িয়াছে; তাহার ব্যক্তিত্বের অবাধ সম্প্রসারণের পথে একমাত্র বাধা তাহার মেয়ে নীলা। নীলার এই বাধাও কোন আদর্শগত সংঘাতসম্ভূত নহে, শুধু নিজের খেয়ালখুশি মত নিজ প্রবৃত্তির অবাধ চরিতার্থতার দাবীতে মাতৃ শাসনের উল্লঙ্ঘন। সোহিনীর ন্যায় চরিত্রকে পূর্ণরূপে জীবন্ত করিতে হইলে প্রয়োজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর ও পর্যাপ্ত সংঘাত-কারণের। উভয়েরই আপেক্ষিক অভাবের জন্য গল্পটি যুগ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হইতে পারিল না। কেবল যে উতলা বাতাস যুগমানসকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, তাহারই একটু ইঙ্গিত দিয়া সন্তুষ্ট রহিল।

প্রকৃতির প্রতিশোধ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, তা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) এটা উক্ত হয়েছে রবীন্দ্ররচনাবলীতে ঐ নাটকের সূচনায় কবির মন্তব্যে। কিন্তু কবির এই উক্তিটা একটু বিচারনীয়, কারণ রুদ্রচণ্ড নাটক পূর্বে রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল (১৮৮১)। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের অস্তিত্বই যেন অস্বীকার করেছিলেন জীবনস্মৃতিতে। অথচ এই মাসে প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যের সবিশেষ আলোচনা করেছেন,—রুদ্রচণ্ডের নামোল্লেখ নেই।

সুতরাং প্রকৃতির প্রতিশোধকে প্রথম নাটক বলা যায় না, গানে ঢালা নাটক বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) ও কাল মৃগয়া (১৮৮২) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটি লেখা হয় কারোয়ারে ; কারোয়ার রত্নগিরি জেলার শহর আরবসাগরের উপর কালী নদীর তীরে অবস্থিত। তখন এটি ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, এখন কন্নাড়ভাষীদের প্রাধান্য হেতু এ অঞ্চল মহীশূর রাজ্য-ভুক্ত হয়েছে। কারোয়ার থেকে ফেরবার পথে স্টীমারে বসে "হ্যাদে গো নন্দরানী" গানটি লেখেন, নাটক মধ্যে পরে ভরিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবন 'যাত্রা'র পথে 'হৃদয়ারণ্যে' দিশাহারা হন—সন্ধ্যা-সংগীতের কবিতাগুলি সেই মনোবিকারের ক্রন্দন। প্রভাত সংগীতের মধ্যে 'নিষ্ক্রমণ' হলো—ছবি ও গানে 'লোকালয়' দেখা দিচ্ছে। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে, লোকালয়ে এসে যেন নিখিল 'বিশ্ব'কে পেলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে যথার্থ 'লোকালয়ে' জনতাকে দেখা গেল। এর পূর্বে রচিত গীতিনাট্য দুটিতে পটভূমি অরণ্য—সেখানে সহজ মানুষের ভীড় নেই, দস্যু ও আরণ্যকদের বাসভূমি। প্রকৃতির প্রতিশোধের ঘটনারাজি জনহীনগুহা ও নগরের চলমান জনতার কোলাহলময় পরিবেশের মধ্যে আনাগোনা করছে। দুইটি বিরুদ্ধ পরিবেশ। সন্ন্যাসী পুরুষঃ মহান্তঃ-এর ধ্যানে নিমগ্ন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটা মনগড়া তুরীয় অবাস্তবতার মধ্যে তাঁর বাস। তিনি প্রকৃতিকে

জয় করেছিলেন ভেবেই আত্মতৃপ্ত। তাই নগরের জনতার লঘুতা, তাদের ব্যবহার প্রভৃতি দেখে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এর মধ্যেও কোথায় যেন আনন্দ আছে যার অংশ তিনি গ্রহণ করতে অপারগ।

এই নাটকে বলতে পারা যায় দুইটি চরিত্র—সন্ন্যাসী ও জনতা। অস্পৃশ্য বালিকা এই জনতারই ছিটকে পড়া টুকরো। এই ক্ষুদ্র বালিকাই সন্ন্যাসীর জীবনে তাঁর সাধনার অবাস্তবতা যেন প্রকাশ করে দিল। "প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম বাস্তব জনতা কথা বলছে। ইতিপূর্বে রচিত বউঠাকুরাণীর হাটের মধ্যে সাধারণ মানুষ আছে বটে, তবে ঐতিহাসিক দূর-প্রেক্ষণাতে তাদের নিকটে পাওয়া যায় না, তারা ঐতিহাসিক হয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ কোনো অতীত কাহিনী নয—এ শ্রেণীর ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। সন্ন্যাসীও বেঁচে আছে; রঘুর দুহিতা স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাতে জল চলনীয় হলেও ব্যবহারিকতায় অনেক স্থলে এখনও অচল।

বৃহত্তর জাগতিক ক্ষেত্রে রঘুর দুহিতারা 'আপার্টহীড্',—রাষ্ট্র সংঘের বহু সাধুসংকল্পকে বানচাল করে শাদাকালোর ভেদকে ব্রাহ্মণ শূদ্র বা ব্রাহ্মণ পঞ্চমের ভেদের মতই কায়েম করার জন্য অনেকেই চেষ্টান্বিত।

প্রকৃতির প্রতিশোধের জনতা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে; তাদের আদিকালের ঠাকুর দেবতা ও নয়াকালের গুরু অবতারদের নিয়ে সুখেই আছে। সুতরাং প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে আমরা একটা শাশ্বতরূপকেই পাই।

অস্পৃশ্যতা বর্জন নিয়ে আন্দোলন ভারত সমাজে এসেছে গান্ধীজির পুনাপ্যাক্টের পর (১৯৩২)। অবশ্য খ্রীস্টানরা ও ব্রাহ্মরা এবিষয়ে বহুকাল থেকে চেষ্টা করে আসছেন—কিন্তু তা কখনো দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হতে পারেনি, কারণ সে আন্দোলন এসেছিল ধর্মের দিকে তাকিয়ে, কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এটা ত্বরান্বিত করার প্রশ্ন ওঠেনি। কয়েক বৎসর পূর্বে "অচ্ছুৎকন্যা" নামে একটা হিন্দী ফিলম্ খুব জনপ্রিয় হয়—সরকার থেকেও সেটি অভিনন্দিত হয়। কিন্তু ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রঘুর

দুহিতার করুণ পরিণাম দেখিয়েছিলেন, তখন এই নাটকের এই সামাজিক বিপ্লবের দিকে কারও দৃষ্টি যায় নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন 'জীবন-স্মৃতি' লেখেন (১৯১০) তখন তিনি এই নাটকের আধ্যাত্মিক দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু এর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি তাঁর নিজেরই মন যায় নি। আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে—রবীন্দ্রনাথের মনে অচ্ছুৎকন্যার কথা কেন ও কিভাবে উদিত হলো।

পান্থগণ সরে যাও। হেরো আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।
ছুঁ সনে ছুঁ সনে সরে যা
অশুচি…ম্লেচ্ছকন্যা তুই কেন চলিস্ এ পথে।"

উত্তর ভারতে অচ্ছুৎদের চলবার কোনো বাধা ছিল না। সেটা ছিল দক্ষিণ-ভারতের তামিলনাড়ে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, শূদ্র চতুর্থ। চতুর্থ বর্ণের বাইরে তামিলদের দেশে পঞ্চম বলে অস্পৃশ্য উপজাতিদের পক্ষে পথে চলতে হলে ঘণ্টাধ্বনি করতে হতো। দূরে ব্রাহ্মণ দেখলে অচ্ছুৎকে রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে সরে যেতে হতো। কোন জাত ব্রাহ্মণের কত গজ দূরে দাঁড়াবে তার বিধিবিধান কঠোর ভাবে মানানো হতো। সেদিনের বদল হয়েছে সত্য। তার পাল্টা জবাবের পালা সুরু হওয়ায় 'পঞ্চম' এখন প্রথম হয়েছে, প্রথমরা পড়েছে নীচে। যে অপমান তারা এতদিন সয়েছিল বর্ণ হিন্দুর কাছ থেকে, তা সুদে আসলে উসুল হচ্ছে এখন; রূপের বদল হয়েছে, গুণের হয়নি। এও যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ!

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক সমস্যার কথা তুলেছেন, তা পরবর্তী যুগে বহু কবিতার মধ্যে মূর্ত হয়েছে। চৈতালী কাব্যে 'দেবতার বিদায়' কবিতাটি স্মরণীয়। 'ধূলিমাখা দেহে বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন "মন্দিরে আশ্রয়ার্থে প্রবেশ করলে প্রধান ভক্ত তাকে বলেছিলেন—"আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যারে।"

'চক্ষের নিমেষে ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।'
'দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্রবেশে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

দেবতার বিদায় কবিতাটি যেদিন লেখেন, সেদিন (২৬মার্চ ১৮৯৬) 'পুণ্যের হিসাব, ও 'বৈরাগ্য' নামে আরও দুইটি কবিতা লিখতে দেখি: 'পুণ্যের হিসাবে' দেখা গেল

যে সাধু 'যতদিন ডুবে ছিল সংসারের পাঁকে' ততদিন তার পুণ্যের খাতায় জমা পড়েছে। সাধু অবস্থায় তার খতিয়ান পাতা শূন্য!

সাধু মহারেগে বলে—যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখা দেবপূজা খাতে?
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড়ো শক্ত বুঝা
যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।

সংসারকে রবীন্দ্রনাথ এড়াতে চান নি, এড়াবার জন্য পরামর্শও দেননি। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' নৈবেদ্যের এই পংক্তিটি খুব সুপরিচিত উক্তি। প্রাচীনকালের জনক রাজা, মধ্য যুগের রায় রামানন্দ, আধুনিক যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংসারে থেকেও বিমুক্তির সাধনা করেছিলেন। যার কিছু নেই তার বৈরাগ্য, যার শক্তি নেই তার ক্ষমা—নপুংসকের প্রেমপ্রলাপ সদৃশ। পুণ্যের হিসাবের উত্তর মেলে বৈরাগ্য কবিতায়—সংসার বিরাগী গৃহত্যাগ করছে সে মনে করে সংসারে তাকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কহিল "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।
দেবতা কহিল 'আমি'; কেহ শুনিল না।"

এই সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন কালেই তার খতিয়ান পাতায় পুণ্যের হিসাব জমেছিল।

সংসার ত্যাগ করলে "দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন 'হায়
আমাদের ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী যেদিন গৃহজীবন ছেড়ে তুরীয় অদ্বৈতানন্দের আশায় গুহাবাসী হয়েছিলেন, সেদিন দেবতার দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাননি। আজ একটি অচ্ছুৎকন্যার স্পর্শে তাঁর জীবনে নূতন আলো এলো। বহুকাল পরে যখন অচ্ছুৎ জাতির মানুষকে কাছে টানবার প্রয়োজন হলো রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, তখন [১৯৩২] রবীন্দ্রনাথ 'শুচি' নামে একটি গদ্য কবিতা লেখেন [পুনশ্চ]:—

"রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ, সারাদিন তাঁর কাটে
জপেতপে। দেবতাকে ভোজ্য করেন উৎসর্গ—
তিনি তা স্পর্শ করেন না। দেবতা বলেন
আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায়নি

আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারি পাদোদক নিয়ে
প্রাণ প্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।"

রামানন্দ-জীবনকথা সুপরিচিত; তিনি ডাক দিয়ে কাছে টানলেন ও চণ্ডাল নাভাকে, মুসলমান জোলা কবীরকে। এরা সবাই রঘুর দুহিতার ন্যায় অস্পৃশ্য, বর্ণ হিন্দুর কাছে।

কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,

'প্রভু জাতিতে আমি মুসলমান
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু
তাই অন্তরে আমি নগ্ন
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে উন শেষ দৃশ্যে সন্ন্যাসীকে জনতা প্রণাম করছে।

সন্ন্যাসী বলে "কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই ওঠো
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহ মাঝে নিয়ে যাও মোরে।"

রামানন্দ বলেছিলেন "আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম, আজ তাকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।"

রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা : অমিয় চক্রবর্তী

বিশ্ব সৃষ্টিকে উল্টো দিক থেকে দেখলে কেবল তাঁর বিচিত্র শক্তির দিকেই চোখ পড়ে, সেখানে সমস্তই আপেক্ষিক এবং আকস্মিক বলে ভ্রম হয়, চরমের আনন্দময় উপলব্ধির অভাবে সমগ্রের রূপ আমাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। এরকম অবস্থায় কাব্যের মূলগত আনন্দে প্রবেশ না হওয়ায় মনে ভাবতে পারি বিচ্ছিন্ন শব্দের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষেই বুঝি কাব্যের পরিচয়, অর্থাৎ কোনো উপকরণ আছে এবং গতি আছে, হয়ত কৌশলের খেলাও থাকতে পারে, কোথাও কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু জ্ঞানী তাঁর উপলব্ধির যোগে কাব্যের ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে পারেন বলে তাঁর কাছে বস্তুর বন্ধন আর থাকে না, পরম আলোকে তিনি অন্তরের ঐক্যটিকে বিচিত্র সম্বন্ধের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে দেখতে পান। সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পূর্ণের মহাপট ভূমিকায় রূপ পর্যায়ের বিচিত্র ধারা তাঁদের কাছে অন্তরের সামঞ্জস্যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে ব'লে তাঁরা বাধাকে নিয়মকে একান্ত করে দেখেন না, মানুষের কাছে তাঁরা একটি পরম মিলনতত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হন, সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে দেখার মরীচিকা ভ্রান্তি বশত মানুষের যে এত যন্ত্রণা, সেই দুঃখের কারণ তাঁরা ভিতর থেকে দূর করে দেন।

যুগে যুগে মহাপুরুষ লোকালয়ে এসেছেন এই বাণী নিয়ে, কালের বিভিন্নতায় তার প্রকাশ এবং প্রয়োগ ভিন্নরূপ নিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের যুগে ঋষি যখন দিব্য-ধামবাসী অমৃতের সন্তানকে ডেকেছিলেন, বুদ্ধদেব অপরিমেয় মানরক্ষার দ্বারা মানুষকে দুঃখপারের পথ দেখিয়েছিলেন, খৃষ্ট এক পিতার পুত্ররূপে সকলের প্রেমকে অন্তরের দিকে উদ্বোধিত করেছিলেন, মানুষের কাছে অস্তিত্বের এই আনন্দময় মিলনের সম্বন্ধটিই নির্মল, সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সেই বাণী আজ নবযুগের দ্বারে এসেছে, তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে, কাব্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে সবমানবের মিলনতত্ত্বটি পরম প্রকাশিত হয়েছে।

কালের ক্রমপরিণতি বশত সত্যকে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিতে হয়—তার মধ্যে

বর্তমানের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সেই যোগ থাকা চাই যাতে মানুষ তাকে সহজে আপন বলে চিনতে পারে, আপন করে চিনতে পারে। আজকের দিনে মানুষ যেখানে বাধা বিরুদ্ধতায় পীড়িত, যেখানে মোহাবরণে তার সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন, সেই বেদনায় বিশ্বভারতী শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছে, তাকে আলো দেখিয়েছে। মানুষের শক্তি এবং তার প্রয়োগ ক্ষেত্র আজকের দিনে বহু প্রসারিত, নিবিড়তর, কিন্তু তার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণরূপে পরম অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না বলে তার চিত্ত আজ ভারগ্রস্থ, সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না, তার নিজের বিচিত্র শক্তির বেগ সৃজন-লীলার আনন্দে যুক্ত হতে না পেরে প্রতিনিয়ত নিজেকেই মর্মাহত করছে। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, মানব সভ্যতার ভিতরেও শক্তির জাগরণ অনন্তের উপলব্ধি নিয়ে সত্যে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তার অন্তরে অন্ধ-আন্দোলনের অন্ত নেই, তখন বিচিত্র শক্তির বিবিধ অপব্যয়, আত্মবিরুদ্ধতা, অকারণ উত্তেজনা, তীব্র অবসাদ। চরমের স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার এই দৈন্য দশা ঘুচে যায়, তবে জ্ঞান ও কর্ম, প্রেরণা ও প্রকাশ অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে বিবৃত হয়ে সুষমায় অভিব্যক্ত হতে থাকে, তার সমস্ত বেদনা পরম চেতনায় ধন্য করে তোলে। মানব ইতিহাসে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি, উদ্বেগ, এত বিচিত্র বহুমুখী উদ্যমের সংঘর্ষজনিত উগ্র উত্তেজনার আবর্তন কখনো এমন একান্ত, সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়নি—এতেই বোঝা যায় মানব সভ্যতা একটি নবজাগরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, তার এত-দিনকার সঞ্চিত শক্তি সত্য সমন্বয়ে মুক্তিপথ খুঁজছে, অতীতের খণ্ড বিভক্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় সে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না, অথচ আত্মার যে বড় আশ্রয়ের যোগে তার শক্তি সত্যে সৃজিত হয়ে উঠতে পারে তাকেও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দৃঢ় করে অধিকার করতে পারছে না। প্রাচ্য মহাদেশে বহু সাধকের আবির্ভাবে জনমনে চরমের ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু কর্মের মধ্যে দিয়ে এর সত্যতা রাখতে পারেনি ব'লে বারে বারে তার ইতিহাস কখনো আবদ্ধ চেতনাকে তীব্র করে পাওয়ার চেষ্টা, আবার ঐকান্তিক সাধনার প্রতিক্রিয়ারূপে কখনো অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের স্থানে অসংযত ভাব বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে—দুয়েরই মূল সত্যের সঙ্গে কর্মময় যোগের অভাব। আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করেছি মন্ত্রে, পশ্চিম-দেশের লোক স্বভাবতঃই সচল এবং ক্রিয়াশীল বলে তারা যন্ত্রের প্রতি আস্থাবান, তারা বিশ্ব ব্যাপারে শক্তিকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছে এবং তাকে নিজের অনুকূল করে তোলার সাধনায় জড়জগতে জীবজগতে ওরা জয়ের পরিসর বাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু সত্যকে প্রয়োগ করতে না পারলে যেমন তার প্রাণ-ধর্ম ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি চরমকে পূর্ণকে স্বীকার না করলে কর্মও সৃজনধর্মী না হয়ে কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনতন্ত্রের ব্যর্থতায় আপনার দুর্গতিকে ডেকে আনে। এই জন্যে বুদ্ধদেব বলেছেন রূপরাগ, অরূপরাগ দুইই পরিত্যজ্য; যে মৈত্রীজ্ঞানে দুয়ের সমন্বয় বিশ্বভারতীর প্রথম কথাই হচ্ছে তাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে আহ্বান করেছেন কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়, বিশ্বভারতীর আনন্দময় মিলন বাণী—পূর্বপশ্চিমকে অভিন্ন প্রেমের সার্থকতার সন্ধান দিয়েছে, ঐ প্রেমের যুক্ত আত্মজ্ঞান এবং সেই কারণেই অহঙ্কার রিপুর ক্ষয়, মঙ্গল কর্মের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মধ্যে এই আলো এলেই সে পরমের ঐক্যবোধে সৃজনের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করে, এবং তখনই সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে কর্মের বিভিন্নতায় আত্মপ্রকাশের শক্তি পায় কারণ মিলনের অর্থ স্বাতন্ত্র্য বিলোপ নয়, সত্য সম্বন্ধ। বিশ্বভারতীর আদর্শ মানবের ঐক্য বোধকে জাগ্রত করে তাকে ব্যক্তি বিশিষ্টতায় আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়ে দেওয়া। ইউরোপে আজ আত্মার দুর্বলতায় লোভকে বিবোধ করে তুলে তারই যোগে কর্মকে স্থায়ীত্ব দিতে চেষ্টা করছে, কারণ তারা অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে; তাই পশ্চিমদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এক প্রধান পুরোহিত তাঁর ইতিহাসে বিচিত্র প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানব সরলতায় আত্মা নামক নূতন এক শক্তি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা লিখেছেন। এই নূতন শক্তিকে সুবিধা মত প্রয়োগ করে বিশেষ বিশেষ দেশকে একত্র বন্ধনে যুক্ত করতে তিনি যত্নবান; আমাদের দেশে ভাব সম্ভোগ-সাধনায় সনাতন মূর্তি বিগ্রহকে ধ্যানের উপকরণ করে তুলে শক্তির প্রয়োগে আশু ফল প্রাপ্তির আশায় দেশাত্মার পূর্ণ জাগরণের চিহ্ন নেই, মোহ আছে। কিন্তু আজকের এই যুগসন্ধির দিনে কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের আহ্বানে আত্মার অবমাননা মানুষের সইবে না, আজ তার সমস্ত শক্তি সমস্ত বেদনা চরমকে স্পর্শ করতে চায়, সবচেয়ে যা বড় তার কমে আর তার অধিকার নেই। সমস্ত উত্তেজনা সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যে আজ আমরা সেই মঙ্গলময় আশার বাণী শুনতে পেয়েছি। আমাদের দুঃখের তপস্যায় ধ্রুব জ্যোতি এসে পৌঁছেচে, বিশ্বভারতী আমাদের কাছে সেই আনন্দময় মুক্তির সন্ধান এনেছে—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং। উপনিষদে বলেছেন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করা যায় ধাতু প্রসাদাৎ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নাবস্থায়; চিত্তকে শান্ত করে, বাধাকে বিরোধকে শুভ বুদ্ধির দ্বারা সংহত করে আজ আমরা বিশ্বভারতীর এই অমৃত

অমিয় চক্রবর্তী

বাণীকে সহজেই গ্রহণ করতে পারব। পূর্ণের আহ্বানে মানুষের বিচিত্র শক্তি সৃজন ধর্মী হয়ে ওঠে, তার প্রাণ মন চৈতন্যময় কর্ম বিকাশে মুক্তির স্বরাজ সাধনায় জয়ী হয়ে চলে, আশ্রম নিকুঞ্জবনে যে সত্যের প্রেরণায় জ্ঞানী তপস্বী শিল্পী কর্মী মুক্তির উৎসবে যোগ দিয়েছেন, তার আলো আজ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত অজ্ঞানের দিকে আজ শুভ জাগরণের চিহ্ন আবরণ ভেদ করে দেখা দিয়েছে। এই পূর্ণ সত্যের সাধনায় মানুষের নানা জাতির আত্মীয়তা, নানা শক্তির সমন্বয়, কল্যাণ কর্মে, ত্যাগে সাহচর্যে এইখানেই আমাদের চিরদিনের আশ্রয়, চিরদিনের মুক্তি।

আজকের দিনে আশ্রমে আমাদের এই পুষ্পিত আনন্দ উৎসবে, আচার্য দেবের জন্ম দিনে বিশ্বভারতীর মিলন বাণীকে আমরা প্রণমিত অন্তরে গ্রহণ করব, আমরা ধন্য হব।

রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম কবি প্রতিভায় ঔজ্জ্বল্য তাঁহার কথা-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য বা প্রবন্ধ ও রচনা-সাহিত্যের প্রতিভাকে ম্লান করিয়া রাখে নাই বটে, কিন্তু অনেকখানি কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকারে এবং পরিমাণে যত বড় কবি ছিলেন ততবড় কবি না হইয়া যদি শুধু যে প্রকারের এবং যে পরিমাণের গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধ রচনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতরেই তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার প্রয়োগ পরিধিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তবে ইহার যে কোন জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তাঁহার তজ্জাতীয় পরিচয় আমাদের কাছে আরও বড় হইয়া উঠিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি বলিয়াই তিনি যে শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকও এ-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যের বড় রচনাকারও। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতে যত রকম সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতরে সার্থক রচনা সবচেয়ে কম। জগতের সেই দুর্লভ রচনাকারগণের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ একজন। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাকার রূপটি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন এবং অবহিত নহি। আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা, নাটক-উপন্যাসেই দিগভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি শুধু তাহাই নহে, রচনাও তিনি এত লিখিয়াছেন, তাহার এত বৈচিত্র্য যে, এক তাঁহার রচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ছোটখাটো বাগানটির ছোটখাটো লতা-পাতা, ফুল-ফলকে লইয়া সুস্পষ্ট কাব্য করা সহজ, কিন্তু যেখানে দিগন্তজোড়া বনস্থালী বা পর্বতগাত্রে জাগিয়া ওঠে অজস্র ঋতু-উৎসব, সেখানে সব জুড়িয়া জাগে শুধু বিস্ময়।

এই কারণে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া, বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো সহজ নহে। ডুবুরি যদি অনেক ডুবিয়া বহু শুক্তির ভিতরে অল্প মুক্তার সন্ধান পায়, তবে সে তাহার মুক্তার ঔজ্জ্বল্য এবং মহার্ঘতা সম্বন্ধে যতখানি অবহিত হইবার সুযোগ পায়, ডুবে ডুবে যে শুক্তি পাইত তাহার অধিকাংশই যদি মুক্তা

হইত তবে তাহার সেই পূর্ববর্তী স্পষ্ট চেতনা সম্ভব হইত না। রবীন্দ্র রচনা-সাহিত্যেও শুক্তিতে মুক্তার সুলভতা এবং আধিক্য তাহার যথার্থ মূল্যনিরূপণে আমাদিগকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার ভিতরে নিবন্ধ, প্রবন্ধ আছে, অল্পায়তনের রচনা আছে;—এই সকলের ভিতরে ধর্ম আছে, ইতিহাস আছে,—সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধেও বহু আলোচনা রহিয়াছে—প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য, আধুনিক-সাহিত্য এবং 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা রহিয়াছে,—জীবন-স্মৃতি আছে, ছিন্ন এবং অচ্ছিন্ন পত্র আছে, পঞ্চভূতও রহিয়াছে—আর রহিয়াছে একটি ভাবস্থ বিশেষ মানসিক অবস্থানকে অবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠ রচনা। সাহিত্য-বিচারের সাধারণ পদ্ধতিতে নিবন্ধ-প্রবন্ধ-সমালোচনা প্রভৃতিকে খাটি-সাহিত্যের এলাকার কিঞ্চিৎ বাহিরে যথেষ্ট সমীহা পূবক স্থাপন করিয়া এই আত্মনিষ্ঠ রচনাগুলিকেই বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে কাজ একটু হঠকারিতা হইবে বলিয়া সংশয় হইতেছে। একটু ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রায় সকল লেখাই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বক্তব্য এবং রচনাকৌশল জুড়িয়া যেখানে একটা রস ব্যঞ্জনাই মুখ্য হইয়া ওঠে, তাহাই খাটি সাহিত্য। কোন্ লেখা কতটুকু সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে না-উঠিয়াছে তাহার বিচার চলিবে সেই লেখার ভিতরকার রস-ব্যঞ্জনার তারতম্য লইয়া। রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলিকে আমরা খাটি সাহিত্য বলিতে পারি না, কারণ সেখানে 'সাধ্য' এবং তথ্যসহকারিত্বে মননশীলতার 'সাধন' কিছু অপ্রধান হইয়া ওঠে নাই; কিন্তু তাহা মিশ্র সাহিত্য বটে; কারণ তাঁহার বুদ্ধির হিরণ্ময় রশ্মিজাল তাহার অভিজাত বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া রস ব্যঞ্জনাকে কোথাও একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা লইয়াও তিনি যেখানে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন বা আমাদের শিক্ষা সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেখানেও তিনি বক্তব্যটাকেই শুধু ভাল করিয়া বলেন নাই,—তাহাকে সুন্দর করিয়া—রসাল করিয়া বলিয়াছেন, এবং তাহাকে যতটা সুন্দর করিয়া বলিতে পারিয়াছেন তাহা ততটা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আসলে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন 'সাধ্য' বস্তু নয়, 'সিদ্ধ' বস্তু। সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তারই উপাদান। কথাটা

যত বড় কাব্যিক শোনায়, যৌক্তিক তাহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে পরম প্রেয়ো এবং শ্রেয়োবোধ তাহা একদিকে যেমন তাহাকে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধির মাধ্যাকর্ষণ বলে নিরেট পৃথিবীর মধ্যকেন্দ্রেই নিবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, তেমনই ঊর্ধ্বলোকের কোন বিশুদ্ধ শূন্যাকর্ষণও তাঁহাকে কোন রূপ রস-হীন নিস্তরঙ্গ লোকে পৌঁছাইয়া দেয় নাই। আমাদের জীবন সম্বন্ধে যে সাধারণ মূল্যবোধ তাহা প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত আমাদের অন্ন, প্রাণ এবং মনের চাহিদা দ্বারা; কিন্তু তাহারও ঊর্ধ্বে যে বিজ্ঞান রহিয়াছে এবং সর্বোপরি যে আনন্দ রহিয়াছে তাহাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকখানি পোশাকী বাহুল্যে পর্যবসিত করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে এই অন্ন, প্রাণ, মন এবং বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে আনন্দের স্পন্দনটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনের সবক্ষেত্রে তাই সৌন্দর্য এবং রসের ভিতর দিয়া এই আনন্দের লীলাটাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কবি নিজের দেহ-মন জুড়িয়া যেমন নিরন্তর অনুভব করিতেন এই আনন্দ-স্পন্দন, সমগ্র সৃষ্টির অন্তর বাহির জুড়িয়াও তেমনই দেখিয়াছিলেন সেই একই আনন্দলীলা; বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার কোন বোধই তাই সৌন্দর্যবোধ এবং রসবোধ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে নাই। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সত্তা বাঙ্ময় স্পন্দনে শুধু সৌন্দর্য এবং রস বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত যাহাদের স্বল্পতম ব্যক্তিগত পরিচয় রহিয়াছে, তাহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখার ভিতর দিয়াই যে তিনি সৌন্দর্য এবং রস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে,—তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের সকল গুরুগম্ভীর হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছতম খুঁটি-নাটি কথাকেও তিনি এত সুন্দর এবং মধুর করিয়া বলিতেন যে তাহাও লিখিয়া রাখিলেই সাহিত্য হইত। প্রত্যেকটি কথাই যে অন্তর্নিহিত রস-সত্তারই ধ্বনিময় প্রস্ফুরণ, তাই তাহারাও সাহিত্যের সামগ্রী। সমগ্র জীবনটাই একটা জীবন্ত সাহিত্য না হইলে কি কেহ কখনও এক জীবনে এত সাহিত্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন?

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্য সবটাই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। কথাটা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যিক সৃষ্টিতে আমরা হয়ত মাঝে মাঝে যে পাশ্চাত্যের গন্ধ পাইয়াছি তাহাকে নিঃসংশয়ে পরিপক্ব স্বীকরণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই; এই কারণে কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন যেমন 'বঙ্গের মিল্টন' তেমনই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গের

শেল।' এ জাতীয় একটা অপবাদ বহুদিন বাজারে চলিত ছিল ; ঠিক ভাবে হোক বা বে-ঠিক ভাবে হোক রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য পাঠ করিবার বেলা আমরা মেটার্লিঙ্ককে স্মরণ করি ; কিন্তু রচনা-সাহিত্যের বেলা কি চিন্তায়, কি ভাবে, কি কলা-কৌশলে কোনও দিক হইতেই এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও স্মরণ করিবার কারণ ঘটে না। এই বিশুদ্ধ রচনাগুলিকে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনাকারগণের রচনা-সাহিত্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এবং সে তুলনায় সাধর্ম্য অনেক খুঁজিয়া পাওয়াই সম্ভব এবং সঙ্গত ; কিন্তু সে সাধর্ম্য কোনওরূপ প্রভাবজনিত নহে—সে সাধর্ম্য শ্রেষ্ঠ রচনা-সাহিত্যের দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ সহজ সাধর্ম্য।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার ভিতরে এক রকমের লেখা রহিয়াছে, তাহা ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে নিবন্ধ-প্রবন্ধ। এ জাতীয় লেখার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। দ্বিতীয় প্রকারের লেখা সাহিত্য-সমালোচনা এবং সাহিত্য ও শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। তৃতীয় তাঁহার জীবন-স্মৃতি এবং আত্ম-বিষয়ক অন্যান্য লেখা। চতুর্থ প্রকারের লেখা 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত ধর্মের ব্যাখ্যান ও ধর্মোপলব্ধি সম্বন্ধে ছোট ছোট অসংখ্য লেখা। পঞ্চম তাঁহার 'পঞ্চভূত' ; ইহা মূলতঃ রচনা-সাহিত্য, তবে একটি অভিনব কৌশলে রচিত। ষষ্ঠ—তাঁহার খাঁটি সাহিত্যিক রচনা। 'বিচিত্র-প্রবন্ধে'র প্রায় সবগুলি লেখা এবং 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত কয়েকটি লেখা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সপ্তম তাঁহার কতগুলি গদ্য রচনা যাহা তাঁহার গদ্য-কবিতারই প্রাক্‌রূপ। অষ্টম রবীন্দ্রনাথের 'পত্র-সাহিত্য'। ইহার ভিতরে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী অবলম্বনে পত্রই বেশী ; তবে বিবিধ বিষয়ক পত্রাবলীও কম নহে। ইহা ব্যতীতও স্পষ্ট কোন শ্রেণীভুক্ত নয় এমন লেখাও রবীন্দ্রনাথের বহু রহিয়াছে।

বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির কথাই ধরা যাক। এখানে অবশ্য রস-পরিবেশন অপেক্ষা তথ্য যুক্তি সমন্বিত সত্য প্রচারকেই যথা-সম্ভব কান্তা-সম্মিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিবার। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নিবন্ধ-প্রবন্ধের ভিতরে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রস পরিবেশনের চেষ্টা গৌণ হইলেও একথা সত্য যে এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মন খুশিতে ভরিয়া ওঠে। এই 'খুশিটির' স্বরূপ কি? এ-খুশিটি একটি বিমিশ্র খুশি। কোথায় যে সে কতটুকু বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রসাদ-জনিত হ্লাদবৃত্তি—আর কোথায় যে সে কবি-হৃদয়ের সহিত পাঠকহৃদয়ের সংবাদ-

জনিত সন্তোষ তাহা নির্ণয় করা শক্ত। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় লেখার ভিতরেও বিশুদ্ধ বুদ্ধির চরিতার্থতা-জনিত আহ্লাদই প্রধান নয়, কারণ ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ-বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার যত নিবন্ধ-প্রবন্ধ তাহা কোথাও তথাকথিত দার্শনিকতা হইয়া উঠে নাই। আসলে একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই জাতীয় সকল লেখার ভিতরেও সর্বদাই রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। এই জাতীয় সমস্ত রচনার তথ্য সরবরাহ করিয়াছে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই জীবন, তাঁহার সকল সহজাত সংস্কার বিশ্বাস এবং প্রবণতা— তাঁহার আশৈশব অনুভূতি তাহার উপরে বিশ্বজগতের সহিত সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই তথ্যগুলিকে প্রকাশ করিবার যে বিশেষ ভঙ্গিটি তাহাও রবীন্দ্রনাথের নিজেরই। রবীন্দ্রনাথের 'মানবধর্ম' বা এই জাতীয় নিবন্ধের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন, নিখুঁত ন্যায়-নিষ্ঠ কোন দার্শনিক মতবাদের ছাঁচের ভিতরে আমরা তাহাকে ঠিক ঠিক ঠেলিয়া পুরিতে পারি না; ইহার কারণ, এ ধর্মের সকল তথ্য ও তত্ত্ব সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন হইতে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ রহিয়াছে, অদ্যকার দিনে আমাদের এ-সম্বন্ধে যে সকল তথ্যের উৎস —অর্থাৎ ইউরোপীয় এবং মার্কিন শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতগণের সকল কৃশকায় ও স্থূলকায় গ্রন্থরাজি—সেই উৎস হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন তথ্যই সংগ্রহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরেই, বিদ্যার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় নিত্য-ধর্মঘটকারী একটি দুরন্ত ছাত্র ছিল, আর ছিল সেই দুরন্তের প্রতি অসীম কৃপাবান্—অতএব অসীম ক্ষমাবান্ এবং তদতিরিক্ত স্নেহবান্ একটি শিক্ষক; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য এবং যুক্তি প্রায় সবই সংগৃহীত অন্তর্নিবাসী গুরুশিষ্যের সংবাদ হইতে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া শুধু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলাই ছিল তাঁহার জীবন-ধর্ম। আর এই সৃষ্টির স্বরূপ কি? উপনিষদে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ বিষয়ে বলা হইয়াছে—"সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে ভাবিলেন,—আমিই সৃষ্টি, যেহেতু এই সকল আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। এই জন্য তাঁহার সৃষ্টি নাম হইল। যে সৃষ্টিতত্ত্বকে এইভাবে জানে সেও এই প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে স্রষ্টৃত্ব লাভ করে।"* আদিকবি প্রজাপতি ব্রহ্মার এই

---

* সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ, সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং, ভবতি য এবং বেদ।—বৃহদারণ্যক ১।৪।৫

সৃষ্টিতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন,—তাই রবীন্দ্রনাথের যত কাব্যসৃষ্টি তাহার রবীন্দ্রনাথই। এই স্রষ্টৃধর্মই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধর্ম; রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলিও এই সাধারণ সাহিত্য-ধর্ম হইতে একেবারে বিচ্যুত হইতে পারে নাই, তাই এগুলির ভিতরেও রহিয়াছে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথেরই প্রকাশ।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রবন্ধ জাতীয় লেখার সহিতও আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই, রবীন্দ্রনাথের সহিতও আমরা তত‌ই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। একদিকে জীবন হইতে সংগৃহীত নব নব তথ্য এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মৌলিকতায় নব নব আদর্শে প্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলি নূতন নূতন স্পন্দনে আমাদের বুদ্ধিকে একটা অনুকূল দোলায় অথবা প্রতিকূল ধাক্কায় সর্বদা জাগ্রত রাখে এই অনুকূলতার ভিতরেই হোক বা প্রতিকূলতার ভিতরেই হোক—বুদ্ধির জাগরণের ভিতরেই আমাদের একটা আনন্দ রহিয়াছে। অন্যদিকে লেখকের বৃহত্তর ব্যক্তি-সত্তার সহিত ব্যাপক পরিচয়েও মন খুশিতে ভরিয়া ওঠে। আর এই দুই খুশির সহিত মিশ্রিত থাকে একটা অভিনব প্রকাশ কৌশলের আস্বাদন, এই সবগুলি খুশি জড়িত হইয়া থাকে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ পাঠে, এই জন্যই এই খুশির প্রকৃতিকে আমরা বিমিশ্র বলিয়াছিলাম।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুশির এই বিমিশ্রতা খুবই সাধারণ, বিশেষ করিয়া রচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সাহিত্যরসের নিখাদ বিশুদ্ধি একটা কাল্পনিক আদর্শমাত্র, বাস্তব সত্য নহে। শুধু সাহিত্যরস নহে, আমাদের জীবনের কোন রসবোধ বা অন্যজাতীয় কোন বোধ কখনও তাহার বিশুদ্ধতম রূপের দাবী করিতে পারে না, মানুষের মনোধর্মের দিক হইতেই এ-দাবী অগ্রাহ্য। শুধু আনুপাতিক তারতম্যই এ ক্ষেত্রে স্বরূপ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। রচনা সাহিত্যের বেলায় কোথায় বুদ্ধির সন্তোষ হৃদয়ানুভূতির সহিত কতটা মিশিয়া থাকে, সেই রসানুভূতির স্নিগ্ধতাই বা বুদ্ধির প্রসাদকে কতটা কমনীয় করিয়া তোলে, তাহার স্পষ্ট বিচার বা পরিমাণ করা সহজ নহে। আমরা আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়কে যেরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন একেবারে কাটা ছাটা প্রান্তবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই, উহাও অনেকখানিই কল্পনামাত্র; বাস্তবে তাহারা অনেক সময়েই সীমালঙ্ঘন করিয়া চলে। বিশেষ করিয়া রচনাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপাদান এবং হৃদয়ের উপাদান অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগী না হইয়া পরস্পর সহযোগী হইয়া ওঠে এবং এই সহযোগীত্বে তাহারা অনুপূরক।

রবীন্দ্রনাথের এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর শুধু ভার নয়, একটা মহিমা রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও মহিমার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে গহনের ভিতরে পথহারা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির বিষয়-বস্তু এমন ব্যাপক এবং বিচিত্র যে তাহার সুষ্ঠু পরিচয় জানিতে হইলে তাহা আমাদের বর্তমান আলোচনার সহিত সম্পূর্ণ 'অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্য' হইবে না।

সাহিত্যের দিক হইতে বিষয়বস্তুর মহিমা অপেক্ষা প্রকাশ ভঙ্গির মহিমা কিছু কম নয়—বরঞ্চ এই দ্বিতীয়টাকেই অনেক বড় বলিয়া মনে করেন। 'পঞ্চভূতে'র ভিতরে দেখিতে পাই—

"সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশী, না, বলিবার ভঙ্গিটা বেশী। আমি একথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভালো বুঝিতে পারি না! আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

"ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল,—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোনটা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রহিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি তাহার চলৎ-শক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

"সমীর কহিল—সাহিত্যের বিষয় মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।"

ইহার ভিতর দিয়া সাহিত্যের বিষয় ও ভঙ্গির মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতেরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধের 'বিষয়' ছাড়িয়া 'ভঙ্গি' সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির ভিতরেও দেখিতে পাই—লেখক কি বলিয়াছেন সেই চিন্তাতেই সর্বত্র আমাদের মন একান্ত আবিষ্ট হইয়া ওঠে না—কেমন করিয়া বলিয়াছেন তাহার কৌতূহল নেহাৎ কম নয়। অথচ এই কেমন করিয়া

বলার যে দুর্লভ নৈপুণ্য তাহা একটা সক্ষম প্রতিভার স্বেচ্ছাকৃত বিলাস-চাতুর্য মাত্র নহে,—সেখানে বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশ বক্রোক্তির বক্র আবর্তে পদে পদে ব্যাহত হয় নাই,—সেখানে স্বচ্ছন্দ প্রকাশকেই বক্রোক্তির আঁকা-বাঁকা পথে বঙ্কিম করিয়া তোলা হইয়াছে। আমাদের আলঙ্কারিক কুন্তক এই বক্রোক্তিকেই কাব্যের 'জীবিত' বা প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উক্তির এই বক্রতা অর্থ সহজ কথার উপরে গলদ্ঘর্ম কসরৎ করিয়া খামখা কয়েকটা প্যাচ কষা নহে, এ বক্রতা অর্থ বাচা-বাচকের সাহিত্য বা সুসঙ্গতির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশভঙ্গির একটা অভিনব চারুত্ব। সর্ব প্রকার গদ্য রচনায় এই বক্রোক্তিতে রবীন্দ্রনাথ একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় লেখায় আর একটি বিশেষ রচনাকৌশল লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাকে ঠিক রচনাকৌশল বলিতে পারি না,—ইহা রচনা-ধর্ম। এ-ধর্মটি হইতেছে অমূর্ত (abstract) চিন্তাগুলিকে সর্বদাই মূর্ত (concrete) করিয়া তোলা। এই ধর্মটি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক রচনার ভিতরেই অনুস্যূত, এবং এই ধর্ম তাঁহার সাধারণ কবি-ধর্মের সহিত যুক্ত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি যেখানে শুধু কথা বলে, সাহিত্য সেখানে শুধু কথা বলে না, যতটা সম্ভব চোখে দেখায়। এই জন্য সাধারণ সত্য বুঝাইতে সে সাধারণ লইয়াই কাজ-কারবার করে না তাহার কাজ-কারবার সর্বদা বিশেষকে লইয়া। সাহিত্যের এই বিশেষ সবসময়ই প্রতীক-ধর্মী, তাই সে একেবারে চাক্ষুষ হইয়াও বিশেষের ভিতরেই আমাদের মনকে বদ্ধ রাখিতে চায় না,—তাহার ইঙ্গিত সর্বদা সাধারণের দিকে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সর্বদা বিশেষের ভিতরে মূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'লোক-সাহিত্যে'র ভিতরে পৃথিবীর শিশুমন যে কেমন করিয়া জগতের ছড়াগুলিকে সৃজন করিয়া লইয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিম্নোক্ত অংশটি পাঠ করিলেই আভাস পাওয়া যাইবে যে মনোবিজ্ঞানের অমূর্ত কথাগুলিকেও রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যথা সম্ভব মূর্ত করিয়া তুলিয়া তাহাকে যতটা সম্ভব সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।

"স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প সর্বদাই

নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ! সেখানেও আমাদের নিত্য প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ কত গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিচ্যুত পদার্থ সকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

"যখন আমরা সচেতন ভাবে কোনও একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি—তখন এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর পরিচরে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিতধ্বনি, ছোট বড় কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন কত আন্দোলন কত গমন কত আগমন, ছায়া-লোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে,—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐকাজাল ফেলিয়া একেবারে একক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্ত তাহাকে এড়াইয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক লেখা 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভিতরেও আমরা এই রচনাধর্মের পরিচয় পাই। 'শান্তিনিকেতনে'র ভিতরে নিছক অমূর্ত তত্ত্বকেও তিনি এইরূপে মূর্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশকাল জাত অহংটাই প্রবল হইয়া উঠিয়া কি করিয়া আমাদের আত্মার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে অবরুদ্ধ করিতে চায় তাহা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অকূলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে কত স্থান ও

আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

"এই চির পরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তা হলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

"আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর অনন্ত তার সঞ্চার ক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

"এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরী হতে থাকে। এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে কেবলই আকার পরিবর্তন করছে!

"কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণ সমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না।"

['নদী ও কূল', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড]

আধ্যাত্মিক 'ধ্রুবলোকে' আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা কি করিয়া করিতে হয় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

"পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না— তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেই রকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনই সমস্তকে সংযত সংহত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে

সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়।"

['আত্মবোধ' শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড]

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকারের রচনার ভিতরে অমূর্ত ভাব এবং চিন্তা উভয়কেই পাঠকের নিকটে মূর্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রতীকধর্মী বিশেষের ভিতর দিয়া সাধারণকে ফুটাইয়া তুলিবার একটা চেষ্টা। এই প্রবণতার সহিত স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত হইয়া আছে প্রচুর উপমা এবং 'উপমানে'র (Analogy) প্রয়োগ। কথায় কথায় যে উপমা এবং 'উপমানে'র অজস্রতা রহিয়াছে, উহা রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোন অলঙ্কার নহে, উহা রচনার স্বধর্ম। আমাদের ভাষার ভিতর দিয়া যে পর্যন্ত আমাদের মনের ভিতরে ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিতে না থাকে সে পর্যন্ত আমাদের অর্থবোধও সুস্পষ্ট নহে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব, বাহিরের কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আমাদের কোন বোধই প্রত্যক্ষের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে না; আর প্রত্যক্ষবোধ ব্যতীত সৌন্দর্যানুভূতি বা রসানুভূতি সম্ভব নহে। এই জন্য আমাদের কথাকে যখনই আমরা ভালো করিয়া এবং সুন্দর করিয়া বলি তখনই আমরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কেবল উপমা (উপমা শব্দটি আমি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি) গ্রহণ করিতে থাকি। প্রত্যক্ষ বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণিত হইয়া অমূর্ত ভাব এবং চিন্তাগুলিকেও তখন অনেকখানি প্রত্যক্ষগুণসমন্বিত হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ হোক, প্রবন্ধ হোক বা খাঁটি সাহিত্যিক রচনা হোক—কোথাও এই উপমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, প্রকাশভঙ্গির সহজ ধর্মরূপে তাহা তাঁহার সমস্ত লেখায় অনন্ত প্রাচুর্যে ছড়াইয়া আছে। তৎকালীন 'স্বদেশী-সমাজে'র ('আত্মশক্তি') কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন।—

"কোন নদী যে-গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে-গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে-গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

"মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়া-শীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—

এখন বাংলার সেই পল্লী-ক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণ প্রায় সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।"

এই জাতীয় একটি উপমা ব্যতীত এত সংক্ষেপে অথচ এত সম্পূর্ণ এবং সুন্দর করিয়া 'স্বদেশী সমাজে'র একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা সহজ হইত না। বাঙলার জনসাধারণের সহিত হৃদয় বা মস্তিষ্ক কোনটারই যোগ না থাকায় ইংরেজী-বিদ্যায় কৃতবিদ্য বাঙালীগণ কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন,—

"হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলি বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা ন দেবায় ন ধর্মায় হইত—কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূর প্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরল শস্যশালী হইয়া উঠে। ইংরেজী বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফ ভারের মত—দেশীয় সাহিত্য যোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালীর ছেলের মাথাও ঠিক থাকে, এবং স্বদেশের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়।"

['বাংলা জাতীয় সাহিত্য', সাহিত্য]

উপমাটি একদিকে যেমন অর্থঘন, তেমনিই একটি প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ব্যঞ্জনাযুক্ত। নীরস কর্তব্য যে মানুষের জীবনে পদে পদে কিরূপ বন্ধন হইয়া ওঠে 'রসের ধর্ম' লেখাটির একটি উপমায় তাহার বর্ণনা সার্থক এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।—

"একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝর্নার মধ্যে তফাৎ কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

"কিন্তু ঝরণার যে গতি সে তার নিজের গতি,—সেইজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সে নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ।"

[শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড।]

রবীন্দ্রনাথের এমন দু'একটি রচনা রহিয়াছে, যেখানে শুধু উপমার প্রয়োগে অনেকখানি বক্তব্যকে একটি কঠিন বন্ধনে ঘনীভূত করিয়া তোলা হইয়াছে। এখানে কল্পনার তৎপরতা এবং স্থিতিস্থাপকতা যেমন তাহার অনন্যসাধারণতার জন্য একটা বিস্ময় সৃষ্টি করে, তেমনি তাহার সাহায্যে বক্তব্যের ভিতরে প্রতিপদে যে ইঙ্গিত আসিয়া অর্থকে গভীর হইতে গভীর—ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া তোলে তাহার মহিমাও কম নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'লাইব্রেরী' রচনাটির প্রথমাংশের ভিতরে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই লিখন ভঙ্গিটি দেখিতে পাই।

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!"

এমনি করিয়া শুধু উপমার পর উপমা দিয়াই লেখক তাহার বক্তব্যকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন!

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে আরেকটি গুণে, উহা তাঁহার সূক্ষ্ম 'রসিকতা'। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে রচনার ভিতরে যেখানে আসে সেখানে সাড়ম্বরে আগেপিছে তোলপাড় করিয়া আসে না,—অনাড়ম্বর নিঃশব্দে আসিয়া ক্ষণ-ঝলকে রচনাটিকে স্নিগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের সূক্ষ্মত্ব এইখানে যে, পাঠকমনের সচেতনতায় সর্বদা তাহার আস্বাদন নহে, অচেতনে তাহার আস্বাদন রচনার অর্থবোধের ভিতরে আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের মহিমা আনিয়া দিবে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের আরও বৈশিষ্ট্য এই, বুদ্ধির সম্বরায় ইহাকে অনেক

সময়ে বেশ কড়াপাক দিয়া স্বাদ বৈচিত্র্য ঘটান হইয়াছে। ফলে আস্বাদনের বেলায় অপটু জিহ্বার শিথিল লেহনেই ইহার সবটুকু গ্রহণ করা যায় না,—ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য রুচির একটা অনুশীলনজনিত বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইউরোপীয় বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস বা 'স্যাটায়ার' কম; তাহার কারণ ইউরোপীয় অর্থে 'স্যাটায়ারিস্ট' হইতে হইলে জীবনের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যতখানি নৈরাশ্যবাদী হওয়া দরকার রবীন্দ্রনাথ ততখানি নৈরাশ্যবাদী কখনও হইয়া ওঠেন নাই। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোর আশাবাদী, সুতরাং বর্তমানের নৈরাশ্য অনভ্যথিত মেঘের মত তাঁহার চিত্তে ফেলিতে না ফেলিতেই আবার উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—অথবা সে মেঘ যেখানে একটু দীর্ঘস্থায়ী হইতে চাহিয়াছে ভবিষ্যতের মঙ্গল আলোকের রশ্মি তাহার উপরে প্রতিফলিত করিয়া কবি সেই মেঘের উপরেই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ খুব বড়দরের 'স্যাটায়ারিস্ট' নহেন। তাঁহার পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে দুইটি জিনিস দুই দিক হইতে আসিয়া একটা বেসুরের বেদনায় তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল; এই দুই দিকেই তাঁহার বিদ্রূপের খোঁচা যা কিছু বর্ষিত হইয়াছে। দুইটি জিনিসের একটি হইল আমাদের প্রাচীন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষার সেই অংশটা যেটা বহুকাল একটা ধাঁধা পথে আবর্তিত হইয়া তাহার প্রাণবস্তুকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল, গতিশীল সহজ জীবনের সহিত যুক্ত না হইয়া প্রতিপদে বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছিল; অপরটি হইল পাশ্চাত্ত্য হইতে আমদানী নূতন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি যাহা এদেশের মাটি এবং জল-বায়ু, আকাশ-আলোর সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হইতে না পারায় একদিকে একটা কাজে-না-লাগা দুর্বহ এবং দুর্দান্ত ভার হইয়া উঠিতেছিল,—অন্যদিকে কতগুলি শিকড়হীন পরগাছা জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু আমাদের সেই প্রাচীন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, এবং নবাগত পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা—এই দুইয়ের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ নৈরাশ্যের মেঘ অপেক্ষা আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন বেশী। উভয়ের ভিতরকার মঙ্গলময় অংশটা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার জন্য অমঙ্গলের অংশটার উপর তাঁহার কশাঘাত কোথাও অতি তীব্র নহে। তাই তাঁহার ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে যে বিদ্রূপ এবং পরিহাস রহিয়াছে তাহাও কোথাও তীব্রহুলযুক্ত নহে,—মৃদু এবং স্নিগ্ধ। স্মৃতি-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুধর্মে পাপ-প্রকরণও যেমন অসংখ্য, তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার প্রায়শ্চিত্তবিধিও প্রচুর; আবার

এই প্রায়শ্চিত্তের প্রাচুর্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাইকারী পাপস্খালনের বিধানেরও কিছু অপ্রতুলতা নাই। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"......অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া ওঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা এবং সমুদ্র যাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে!

"পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপ যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া ওঠে, তেমনই যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোট-বড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমির হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশিকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটো বড়ো সকল-গুলোকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়।"

['আচারের অত্যাচার', সমাজ]

ইহা শুধু ঘটনার যথাযথ বিবরণ নহে—একটা বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তীব্রতা নাই, এ বিদ্রূপ স্মিত পরিহাস রচনাকে সরল করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রায় সর্বত্রই এইরূপ অনেকখানি স্মিতহাস্যেরই প্রকারান্তর হইয়া উঠিয়াছে—স্থানে স্থানে একটু মসলার ঝাঁজ মিশান মাত্র। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনায় কবি বলিয়াছেন,—

"কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোল বিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্যদেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দে মনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশান নাই।"

['শিক্ষার হেরফের', শিক্ষা]

ইহা ঠিক 'স্যাটায়ার' নহে—একটি সরল জীবন্ত চিত্রের ভিতরে যে পরিহাসের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহার ভিতরে গঞ্জনার তীব্রতা নাই।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় হাস্যরসের ভিতর সর্বত্রই যে বুদ্ধির কড়াপাক রহিয়াছে তাহা নহে ; কথা বলিতে বলিতে খোলা মনের মৃদু প্রশান্ত হাসিতে কথাগুলিকে মনোরম করিয়া দিবার দৃষ্টান্তও একান্ত দুর্লভ নহে। 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' প্রভৃতি ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন আগামীকল্য যে তাঁহার শুভ বিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত ; যাহা হউক তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনো প্রকার উদ্‌যোগ অথবা সে জন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোন কিছুর জন্যই কিছু মাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামীকল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে কিছুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজি-ফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে যমুনাবতী নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুমঝুম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ প্রমাণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছু আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস যে-লোক লইয়া গেছে তাহার কোনরূপ উদ্দেশ্য না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থির সংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহ দ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।"

['ছেলে ভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য]

শিশুর সমস্ত খামখেয়ালী আচরণের ভিতরে যেমন একটা নির্মল কৌতুক রহিয়াছে এই ছেলেভুলানো ছড়াগুলির ভিতরেও সেই জাতীয় একটা অসংলগ্নতার কৌতুক রহিয়াছে, কবি তাঁহার আলোচনায় ছড়াটি হইতে সেই নির্মল কৌতুক-টুকুই নিপুণ দোগ্ধার ন্যায় দোহন করিয়া আনিয়া আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন।

রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা : প্রমথনাথ বিশী

•

এই পর্যায়ে আলোচিত নাটকগুলিকে তত্ত্ব নাট্য বলা হইয়াছে, যতদূর জানি আগে এ নাম ব্যবহৃত হয় নাই; এখন এ নাম কেন ব্যবহার করিলাম সে বিষয়ে কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের কোন একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি বর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদের কোন কোন নাটক রূপক (আংশিক রূপক), কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য, কিন্তু তাহাতে নাটক বিশেষের প্রকৃতিমাত্র প্রকাশ পায় সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। এই অসুবিধার জন্যেই সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব করিতে থাকি 'তত্ত্ব নাট্য' সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক তাহা যে তত্ত্ব প্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর পাঠকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতির প্রতিশোধ বা মুক্তধারাতে পার্থক্য যতই হোক দুটির মধ্যেই তত্ত্বের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। আবার ফাল্গুনী ও কবির দীক্ষায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক—দুয়ের ঘনিষ্ঠতা তত্ত্বের প্রাচুর্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বের প্রকটতা ও প্রাচুর্য এই সব নাটকের শ্রেণী-লক্ষণ।

আরও একদিক হইতে বিচার চলিতে পারে। মুক্তধারা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে গল্পসূত্রের মিল আছে, কোন কোন চরিত্রও দুই নাটকে অভিন্ন; তৎসত্ত্বেও নাটক দুটি যে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্তে কাহিনীর প্রাধান্য আর মুক্তধারায় প্রাধান্য তত্ত্বের। রাজা ও রাণীর রূপান্তর তপতী। কিন্তু তপতীকে তত্ত্ব নাট্য পর্যায়ের মনে করা চলে না, তত্ত্ব এখানে কাহিনীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিও কাছ ঘেঁষিয়াই গিয়াছে।

এই শ্রেণীর নাটকগুলি পড়িলেই বা অভিনয়কালে দেখিলেই পাঠক বা দর্শকের মনে এই বোধ জন্মিবে যে কাহিনী এখানে পুরোভাগে স্থাপিত হইলেও প্রাধান্য তাহার নয়, কাহিনীর পশ্চাতে তত্ত্বটি বিরাজ করিতেছে তাহাই মুখ্য, তাহাই প্রধান, শিখণ্ডীর অন্তরালস্থিত অর্জুনের মতো তাহারই নিশিততম বাণটি পাঠকের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এখন তত্ত্বরূপই যদি ইহাদের প্রধান রূপ হয়, তবে সেই প্রাধান্যের দ্বারাই ইহাদের পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে আবার নূতন নামের আমদানী কেন—পুরাতন একটা দিয়া কি কাজ চলিতে পারে না? কেন চলিতে পারে না অংশত আগেই বলিয়াছি। রূপক, সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী কোন নামের দ্বারাই সমগ্রের রূপ প্রকাশ পায় না। সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী বলিতে মুক্তধারা, রক্ত করবী ও রক্তের রাশিকে বুঝায়। এমনকি অচলায়তনকে বুঝাইতে পারে—কিন্তু আর কোনটির বেলায় কি ঐ নাম খাটিবে? রূপক বলিতে রাজা ও ডাকঘরকে বুঝাইতে পারে (আমার মতে আংশিক রূপক মাত্র); কিন্তু শারদোৎসব ও প্রকৃতির প্রতিশোধের বেলায় কি হইবে? সমস্যা নাটক ব্যবহারেও ঐরূপ অসম্পূর্ণতা দোষ দেখা দিবে। এইসব বিষয়ে বিচার করিয়াই আমাকে একটি সামান্য নাম অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে—তত্ত্ব নাট্যের চেয়ে যোগ্যতর নাম খুঁজিয়া পাই নাই, নামটি গদ্য গন্ধী হইতে পারে, অতিরিক্ত পরিমাণে বাস্তব ঘেঁষা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র শ্রেণীটির রূপটিকেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। "তত্ত্ব নাট্য" বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণীর নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনী প্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, সেই সঙ্গে আরও বুঝি যে এক শ্রেণার মধ্যে উপশ্রেণীগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন তত্ত্ব নাট্যের বেড়াজালে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদই ধরা পড়িবে। কি এবং কি নয় এবং কোন্ কোন্ সূক্ষ্ম প্রভেদ ইহার অন্তর্গত প্রভৃতি অনেক রহস্যই নামটিতে প্রকাশ পায়। এই সব কার্যকারিতাই এই নামটির যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

(২)

পর্ব বিভাগ—

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাট্যগুলিকে তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর।

এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা।

প্রথম পর্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া এই পর্বে রচিত আর কোন নাটকে কিম্বা আর কোন রচনাকে তত্ত্ব প্রধান বলা চলে না। অবশ্য বিসর্জন, রাজা ও রাণী এবং কাব্য নাট্যগুলি আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে ঠিক তত্ত্ব নাট্যের বিপরীত। এই যুগটাতে রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডিতে, প্রহসনে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাস ও সজীব বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিকেই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে নাটকের যে আকৃতি ও প্রকৃতি দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসঙ্গ, তাহার কোন দোসর এ পর্বে মেলে না। এরকম ক্ষেত্রে এই সময়টাকে তত্ত্ব নাট্যের প্রথম পর্ব বলা যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তীকালে তত্ত্ব নাট্যসমূহের পূর্বাভাস, নিঃসঙ্গ এই নাটকখানি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা তারকার মতোই আসন্ন তারকারাজির অগ্রদূত। তবু ইহার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে কবির মতে এই নাটকখানার মধ্যেই তাঁহার জীবনতত্ত্বের বীজ নিহিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধ কবির জীবনতত্ত্ব বীজের চেয়ে অধিক প্রকট নয়। ইহা নাট্যাকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে অনেক পরে—যে সময়টাকে তত্ত্ব নাট্যের দ্বিতীয় পর্ব বলিয়াছি।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯০৮ সালে যখন শারদোৎসব নাটক প্রকাশিত হয়, তখন কবির বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। এই জীবনটা রবীন্দ্রজীবনে নানা কারণে বিশেষ অর্থপূর্ণ। কবির জীবন প্রতিভা তখন মোড় ঘুরিবার মুখে। এটাকে তাঁহার পূর্ণতর বিকাশের প্রস্তুতির সময় বলা যাইতে পারে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি প্রচলিত ধরনের ট্রাজেডি ও প্রহসন লেখা ত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তিনি নাট্য রচনায় স্বকীয় রীতিটি পুরাপুরি সন্ধান করিয়া পান নাই। যেমন নাট্য বিষয়ে তেমনি রচনার অন্য শাখা সম্বন্ধেও বটে—একই সত্য প্রযোজ্য। ক্ষণিকা ও কল্পনার পালা অনেককাল শেষ হইয়া গিয়াছে—অথচ গীতাঞ্জলি তখনো রচিত হয় নাই, মাঝখানে আছে খেয়া। খেয়ার সঙ্গে নৈবেদ্যকে জড়িত করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় নৈবেদ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা খেয়ায় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—যদিচ এখনো আমরা গীতাঞ্জলি পর্বের দেখা পাই না। নৈবেদ্য কাব্যের

আকৃতিটা পূর্বতন রীতির সাক্ষ্য দেয়—প্রকৃতিতে তাহা পরবর্তীকালের সূচক। খেয়া কাব্যের স্বল্পভার ভূষণ বিরল, মন্দাক্রান্তা ছন্দে ও শিল্পে আসন্ন পরিবর্তনকে অত্যাসন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। খেয়া কাব্য পূর্বতন ও পরতন আত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে খেয়া পারাপার করিতেছে। ঠিক এই সময়টাতে তিনি পুনরায় তত্ত্ব নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গঠন রীতির বিচারে এগুলি প্রকৃতির প্রতিশোধের চেয়ে অনেক ঘন পিনদ্ধ, প্রকৃতির প্রতিশোধে যে তত্ত্ব নীহারিকারূপে অস্পষ্ট ও অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছিল, এখানে তাহা অনেক প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল, আর বিশ্বপ্রকৃতি মানব প্রকৃতির প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বিসর্জন এবং রাজা ও রাণীর মানব প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। শিল্প হিসাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি যে লক্ষণ ও ধর্ম, রাজা, ডাকঘর ও শারদোৎসবেরও প্রায় সেই লক্ষণ ও ধর্ম—এমনকি অচলায়তন নাট্য বিষয় কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহাকেও অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। সেকালে রবীন্দ্রনাথের যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করিতেন রূপান্তর তাঁহারাও এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে খেয়া, গীতাঞ্জলি আর ডাকঘর, রাজা সমান দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছিল। কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্বে পাই অনেক কয়খানি নাটক। ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবীর দীক্ষা। ফাল্গুনীর রচনা কাল ১৯১৬, তখন কবির বয়স পঞ্চান্ন বৎসর।

এই পর্ব সম্বন্ধে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম, বলাকা যেমন কবির প্রতিভার মোড় ঘুরিবার আর একটা সময়, ফাল্গুনীও তাহাই। বলাকা ও ফাল্গুনীকে একত্র বিচার করিতে হইবে। যথাস্থানে তাহা করিয়াছি এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাট্যগুলি এই দুই পর্বে লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্য কোন্‌খানা সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতভেদ হইবে। আমার নিজের ধারণা নাট্য হিসাবে এবং তত্ত্ব নাট্য হিসাবে মুক্তধারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এই লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাভ নাই।

আর এই পর্ব সম্বন্ধে তৃতীয় সাধারণ লক্ষণ এই যে, এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি প্রায় সমুদায় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্ব ভারাক্রান্ত এবং সেই

কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পূজা, উপন্যাসে যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্ব শিল্পের স্বর্গ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্র সাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই কেবল নাটক নয়—তত্ত্ব প্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবির তেইশ বৎসর বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধে যাহার সূচনা দেখিয়াছিলাম কবির শেষ জীবনে আসিয়া তাহা যেন সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। মাঝখানে অনেক ব্যতিক্রম অনেক বিপরীত স্বভাবকে তাঁহার অতিক্রম করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সক্ষম হইয়াছে—তাহাও তেমনি সত্য।

৩

এবার তত্ত্ব নাট্যগুলিতে আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে তত্ত্ব নাট্যের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মনীষার ব্যাপকতা সম্বন্ধেও একটি ধারণা জন্মিবে—সেই সঙ্গে দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন পর্বে নূতন নূতন সমস্যাকে কিভাবে শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বভাবত দুরন্বয় তত্ত্ব ও শিল্পের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থক অনুধাবনের ফলে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দু'জনারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তত্ত্ব নাট্যগুলিতে আলোচিত সমস্যাসমূহকে নির্গলিত করিয়া লইলে তিনটি মূল সমস্যায় গিয়া দাঁড়ায়। সে তিনটি বিষয় এই—

(১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক

(২) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক

এবং (৩) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক;

এইসব সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিষয়ে সকলে একমত হইবেন এমন আশাকরা অন্যায়, দৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কেও দ্বিমত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেসব ক্ষেত্রে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহাও কাহাকেও স্বীকার করিয়া লইতে বলি না—কিন্তু একটি প্রসঙ্গে সকলকেই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় একমত হইতে হইবে, সেটি তাঁহার চিন্তাক্ষেত্রের সর্বময় ব্যাপকতা। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিনটি সত্তা লইয়াই জগৎ গঠিত, দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগৎও তাহার

সমব্যাপক। এই ব্যাপ্তির অসীমতাই, কেবল এ ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-মনীষার প্রধান লক্ষণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্যাপ্তিতে ন্যূনতা ঘটিয়া গভীরতায় বাড়িলে আরও ভালো হইত। কিন্তু 'আরও ভালোর' মরীচিকা শিকারে আমাদের আসক্তি নাই, তাহাতে কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়।

তত্ত্ব নাট্যের প্রথম পর্বে একটি মাত্র রচনা আছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই রচনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁহার এই সচেতনতার উপরে আমরাও জোর দিয়াছি—এবারে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অপরিণত রচনাটির মধ্যে, বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি থাকে সেইভাবে তিনটি তত্ত্বই নিহিত। সমস্তই অপরিণত, সমস্তই স্পষ্ট এবং খুব সম্ভব সমস্তই কবির অজ্ঞাত, কিন্তু সমস্তই যে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী তত্ত্ব জালের চতুষ্পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। সে নিজেকে ভগবানের সহিত, প্রকৃতির সহিত এবং মানুষের সহিত সমসূত্রে রাখিয়া বিচার করিয়াছে। সিদ্ধিজনিত অহঙ্কারে সে এমনি মত্ত, এমনি অন্ধ যে সে নিজেকে তিনটি সত্তার চেয়েই প্রবলতর কল্পনা করিয়াছে। ভগবদুল্লেখ বিশেষ নাই, করিবার সে আবশ্যকবোধ করে নাই, সে যখন সিদ্ধ পুরুষ, তখন সে তো ভগবানের সমকক্ষ, সমকক্ষের উল্লেখ কে কবে করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ও মানব তাহার দ্বারা নির্জিত, নির্জীতের উল্লেখে গৌরব আছে, তাই বারংবার তাহাদের উল্লেখ সে করিয়াছে।

'যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি, পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।'

অর্থাৎ এখন সে মহাদেবের সমকক্ষ।

আর

কি কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে!

অর্থাৎ এক সময়ে সে প্রকৃতির অধীনে ছিল এখন সে স্বাধীন, বুঝি শুধু স্বাধীন নয়, প্রকৃতিই যেন তাহার অধীন।

আর মানুষ সম্বন্ধে—

এ কি ক্ষুদ্র ধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে...
এই কি নগর! এই মহারাজধানী!

চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

কি অসীম অবজ্ঞার কি বিবিক্ত অনুকম্পা।

এই তিন তত্ত্বসূত্রের টানা পোড়েনের পরিণাম প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্বক্ষেত্রে আছে—এখানে শুধু এইটুকু বলিবার ইচ্ছা যে, তাঁহার পরবর্তী সমস্ত তত্ত্ব নাট্যের মূল তত্ত্বগুলি প্রথম তত্ত্ব নাট্যখানিতেই বীজাকারে বর্তমান।

দ্বিতীয় পর্বে চারখানি নাটক পাই। শারদোৎসব. রাজা, ডাকঘর ও অচলায়তন নাটক চারখানাকে যদি তিনভাগে সাজাই তবে দেখিতে পাইব যে, ইহাদের মধ্যে মূলতত্ত্বগুলি সবই দেখা দিয়াছে।

শারদোৎসবে মানুষের সহিত প্রকৃতির ও ডাকঘরে মানুষের সহিত ভগবানের এবং অচলায়তনে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের বিচার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের উদ্দেশ্যে অসীম ঐশ্বর্য, অবাধ সম্পদ ঢালিয়া দিতেছে, মানুষকে তাহা কেবল গ্রহণ করিলেই চলিবে না, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা, দুঃখ সহনের দ্বারা প্রকৃতির পাপের প্রতিদান দিতে হইবে—এ ঋণ শোধের পালা এমনই আনন্দময় যে তাহাতেই শারদোৎসবের প্রাণ। আর এই দান প্রতিদানের সমবায়ে মানুষ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতর হইয়া একাত্মতর ও পূর্ণতর হ.য়া উঠিতেছে। ইহাই শারদোৎসব তত্ত্ব নাট্যে নির্গলিত মর্ম।

রাজা ও ডাকঘরে মানব হৃদয়ের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিচার। নাটক দুখানিতে যাহাকে রাজা বলা হইয়াছে তিনি ভগবান ছাড়া আর কেহ নহেন, আর সুদর্শনা ও অমল স্ব স্ব ক্ষেত্রে মানব হৃদয়ের প্রতিনিধি।

অচলায়তনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এখানে মানুষে আর ভগবানে কিংবা মানুষে প্রকৃতিতে সম্বন্ধ বিচার নয়—এখানে বিচার মানুষে মানুষে সম্বন্ধের—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসঙ্ঘের মধ্যে সংঘাত এখানে বিচার্য বিষয়। অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সভ্যতার সঙ্কট রচনায় বেদনার যে last testament প্রকাশিত হইয়াছে—অচলায়তন নাটকে তাহারই পূর্ব সূত্র। আরও আগের কোনো রচনাতে এ সূত্রের সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে—কিন্তু অচলায়তনে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথম শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে।

প্রথম বলিলাম এই জন্যে যে পরে এই সমস্যাটিকে আরও ব্যাপক ভাবে আরও গভীর ভাবে তিনি একাধিক নাট্যরূপ দিয়াছেন। বস্তুত তাহার তৃতীয় পর্বের প্রায় সমস্ত নাটকের এই তত্ত্বটিই মূল উপজীব্য। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বর্তমান যুগে মানুষে মানুষে সংঘাত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্যতার সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যাটি বা এই সমস্যাটির বিশেষ এই রূপটি কবিকে তাঁহার শেষ জীবনে সব চেয়ে ব্যথিত, সব চেয়ে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতায়, প্রবন্ধে এবং নাট্যাকারে এই বেদনা ও সম্বোদনকে তিনি বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, তাসের দেশ সমস্তই এই তত্ত্বের বাণী বেদনা মূর্তি। ফাল্গুনী নাটক খানাতেও অংশত এই তত্ত্ব—কিন্তু আরও কিছু আছে—সেই আরও কিছুর জন্যই তাহার স্থান একটু বিচিত্র।

ফাল্গুনীতে কবির ব্যক্তিগত যৌবন, (ভূমিকায় কথিত ইক্ষাকু বংশীয় রাজার যৌবন) প্রকৃতির যৌবন (গীতি ভূমিকায় কথিত) এবং মানব সমাজের যৌবন (মূল নাটকে কথিত)—এই তিন যৌবনের সমস্যা জড়িত। অর্থাৎ এই নাটকে কবি ব্যক্তি, প্রকৃতি ও মানব সমাজ এক সমস্যার গ্রন্থিতে যুক্ত। কালে কালে লোকে লোকান্তরে যৌবনের জয়—ফাল্গুনী গীতিনাট্যের বিষয়। রূপান্তরে ইহাই অচলায়তন ও তাসের দেশেরও ভাব উপজীব্য। অচলায়তনে অন্য দেশাগত শোণ পাংশু বা যূণক (যুবক) জাতির আঘাতে অচলায়তনে ধ্বংস হইয়াছে। তাসের দেশে অন্য দ্বীপাগত যুবক রাজপুত্রের প্রভাবে তাসের দেশের জড়বৎ নরনারী মানবীয় যৌবনে জাগিয়া উঠিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। ফাল্গুনীতে যাহা সাধারণ ভাবে কথিত অচলায়তনে ও তাসের দেশে তাহা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—ফাল্গুনীতে জয় যৌবনের—আর অন্য দুইখানি নাটকের জয় যুবক জাতির, যুবক রাজপুত্রের। ইহা ঠিক সভ্যতার সঙ্কট নয়, কিন্তু তাহারই প্রায় ধার-ঘেঁষা, মানুষের যৌবনের সঙ্কট, তিনখানিতেই মানুষের যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সভ্যতার সংঘর্ষ বা সভ্যতার সঙ্কট বিষয়ক নাটক। শেষের দুখানা নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও মূলভাবের বাহন হিসাবে বিশেষ ভাবে বিচার্য। ইহাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা চলে। মুক্তধারা ও রক্তকরবী একত্র বিচার্য, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সগোত্র। প্রথম দুখানিতে সভ্যতার সঙ্কটে বিশেষ একটা দিক চিত্রিত, শেষের দুখানিতে সভ্যতার সঙ্কটের সাধারণ চিত্র।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে সভ্যতার সঙ্কট দৃষ্ট হইতেছে তাহার মূলগত কারণ যন্ত্রবাদের অতিচার ও অতিপ্রসার। যন্ত্রজাত সভ্যতা মানব জীবনের মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। মানবের স্বরূপকে জটিল জালের আড়ালে ফেলিয়া তাহাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন মুক্তধারাকে নির্বাধ করিবার উপায় কি? খণ্ডিত ও বিকৃত মানুষকে জালের রাহুকবল হইতে উদ্ধারের উপায় কি? অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই উপায় দেখাইয়া দিয়াছে। যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারাকে ও মানুষকে মুক্তিদান করিতে হইবে। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরই জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাই যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্র ধ্বংস না হইয়া কেবলই আপন শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের ধ্বংসকারিতা কেবলি বাড়িয়াই চলিয়াছে, মানুষের মুক্তির উপায় আর চোখে পড়িতেছে না। ইহা মুক্তির পথ নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র। রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন রাম, যন্ত্রের প্রতিনিধি তেমনি প্রাণ। তাহাতে প্রাণের আপাত বিনাস হইলেও যন্ত্রের যে সমূলে বিনাস তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজিৎ মরিয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তধারাও তেমনি মুক্তি লাভ করিয়াছে। রঞ্জন মরিয়াছে বটে কিন্তু রাজাও তেমনি জালায়ন হইতে উদ্ধার পাইয়াছে বটে। যন্ত্র বনাম প্রাণ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমাধান। এখানে গান্ধীজীর আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সাম্য। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যাহা রক্তকরবী, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তাহাই চরখা—দুই-ই symbol বা প্রতীক, দুর্জয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অজেয় মানব শক্তির প্রতীক। ইঁহারা আপাত প্রচণ্ড শক্তিমানের বিরুদ্ধে দৃশ্যত দুর্বলকে উপস্থাপিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যেমন করেন নাই আদি কবি বাল্মীকি রাবণের সম্মুখে রামকে উপস্থাপিত করিতে।

মুক্তধারা ও রক্ত করবীতে সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটের সমাধান আছে এমন মনে করিবার কারণ নাই, সভ্যতার যন্ত্রজাত সঙ্কটই প্রদর্শিত হইয়াছে আর প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মুক্তির পথটা। কবি বলিতে চাহিয়াছেন মুক্তি যখনই আসুক, যেভাবেই আসুক—ঐ প্রাণের পথে আসিবে, বৃহত্তর যন্ত্রের পথে নয়, প্রচণ্ডতর অস্ত্রের পথে নয়। তাঁহার মতে শেষ পর্যন্ত প্রাণেরই জয় ঘোষিত হইবে, অচলায়তনে, ফাল্গুনীতে ও তাসের দেশে যেমন যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এসব স্থানে যৌবন ও প্রাণ মূলত সমার্থক। যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া প্রাণের

জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহারা সকলেই যুবক, পঞ্চক (অচলায়তন) রাজপুত্র (তাসের দেশ) জীবন সর্দার (ফাল্গুনী) অভিজিৎ (মুক্তধারা) এবং রঞ্জন (রক্তকরবী) সকলেই যুবক। জলের সঙ্গে জলের ফেনার যে সম্পর্ক, প্রাণের সঙ্গে যৌবনের সেই সম্পর্ক—যৌবন প্রাণ বন্যার ফেনা।

কালের যাত্রার রথ ইতিহাস আর যে রজ্জুর টানে ইতিহাস চলে তাহা রথের দড়িটা। এতদিন ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও ধনিকদের টানে রথ চলিয়াছে—কিন্তু এখন আর সে টান যথেষ্ট নয়—রথ আর চলিতেছে না—এবারে শ্রমিকের টান আবশ্যক। এ তো স্পষ্টত যুগ সমস্যা। কিন্তু শ্রমিক যদি ভাবিয়া বসে যে রথ চালাইবার ভার একমাত্র তাহারই উপরে—তবে রথ আবার অচল হইয়া পড়িবে। সেই শেষের টুকুই কবির সতর্ক বাণী, যদিচ কেহ শুনিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের অবস্থা বৈষম্যে তাহাদের ভাব বৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ অর্জন করিতেই জানে ত্যাগ করিতে জানে না, ভারত ত্যাগ করিতে চায় বটে; কিন্তু যে উপার্জন করে নাই সে ত্যাগ করিবে কি? এখন এই ঐতিহাসিক হেরফের ঘুচাইবার উপায়, কবির মতে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" এই বাণী। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে যদি হয়, তবে ভারতকে প্রথম ঐশ্বর্য উপার্জনের দীক্ষা লইতে হইবে, দরিদ্রের আবার ত্যাগ কোথায়—আর ইউরোপকে ত্যাগের দীক্ষা লইতে হইবে, কেন না তাহার সঞ্চিত ধন মুক্তির পথ পাইতেছে না বলিয়া—ক্রমেই অধিকতর গুরুভার হইয়া তাহার অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করিতেছে—ইউরোপের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত সেই আর্তনাদ মানুষের ইতিহাসকে সকিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির দীক্ষা এই যে, ইউরোপ ও ভারত ভোগ ও ত্যাগের হেরফের ঘুচাইয়া—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—এই ব্রতবাণী গ্রহণ করুক।

৪

এখানে একটা বিষয়ের আলোচনা সারিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এডওয়ার্ড টমসন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের শেষাংশে একজন বাঙালী সমালোচকের একখানি পত্র উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।[১]

এই অজ্ঞাত সমালোচক তাঁহার সমগোত্রীয় রসবোদ্ধাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি সাজিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত ভারতীয়

1 Appendix A. P 315-316, Rabindranath Poet and Dramatist by Edward Thompson, 2nd Ed. 1948.

সাহিত্যের নাড়ির যোগ নাই, এমনকি ভাষাটাও বাঙালীর দুর্বোধ্য—তাঁহার মতে রবীন্দ্র সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এই অভিযোগ কতদূর সত্য?

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে একটা সময় ছিল যখন এই শ্রেণীর রসবোদ্ধাগণ কবি বা সাহিত্যিক কিছুই নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। এ পর্ব কিছুকাল চলিয়াছিল। তারপর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথের যখন জগৎজোড়া খ্যাতি—তখন তাহারা সুর বদল করিল। কবি বা সাহিত্যিক নয় একথা বলিতে তখন তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বাধিত—কাজেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির দল নূতন যুক্তির অবতারণা করিল—রবীন্দ্র সাহিত্য অভারতীয়, দেশের প্রাণবস্তুর (?) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাড়ীর যোগ নাই—এই হইল রবীন্দ্র বিদূষণার পরবর্তী সুর। টমসন উল্লিখিত পত্রখানি সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্র সাহিত্য কি সত্যই অভারতীয়, সত্যই দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তাহার নাড়ির যোগ নাই? বিচারে নামিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মতোই রবীন্দ্রসাহিত্য একান্তভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় জীবন হইতে উদ্ভূত, ভারতের সভ্যতার সঙ্গে জড়িত—এবং ঠিক সেই কারণেই বিশ্বের আদরণীয় বস্তু। বর্তমান ক্ষেত্রে সম্যক্ রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারের

---

* এই প্রসঙ্গে একটা ঋণ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারতীয় ও বিদেশীয় ভাষায় যতগুলি বই লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে বর্তমান বইখানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিলে অন্যায় হইবে না। একথা এখানে না বলিলেও চলিত—কিন্তু টমসনের বই প্রথম প্রকাশের সময়ে বাঙালী পাঠক সমাজ ইহাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করে নাই, বরঞ্চ বিপরীত মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিল। কেন, জানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী, স্বভাষাভাষী হইয়াও যাহা পারিলাম না, একজন 'বিদেশী' তাহাই করিল—এই সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধবশতঃই কি? প্রথম অভিনন্দনের কাল বহুদিন গত, সত্য, কিন্তু বিলম্বিত অভিনন্দনের কাল কখনো যায় না। এতদিন পরে, প্রথম সুযোগে সেই বিলম্বিত অভিনন্দন সারিয়া লইলাম।

২। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সংস্কারের দ্বারা সমালোচনা যে কতদূর রঞ্জিত হইতে পারে—পত্রখানা তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের নামটি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করা যায় না।

অবকাশ নাই, কেবল তত্ত্বনাট্যগুলিরই বিচার চলিতে পারে। তাহাই করিব, আর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আপাতঃ অভারতীয়ত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যগুলির মূল তত্ত্বসমূহ অভারতীয় তো নয়ই বরঞ্চ একান্তভাবে ভারতীয়। দেশের মর্মবাণী মহাকবিগণকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচারী সমালোচক তাহা মানিবে কি প্রকারে?

৫

প্রথমে নাটকগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি বিচারে নামা যাইতে পারে, পরে প্রয়োজন হইলে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাইতে পারিবে। প্রথমে প্রকৃতির কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন যে, 'সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালাই' তাহার রচনার মূল কথা। একথা প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এখন এই পালাটি কেবল রবীন্দ্রসাহিত্যের নয়—ভারতীয় সাধনার মূল কথা। ভারতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই বাণীটি জড়িত, ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া উপনিষদের ধারা বহিয়া এই বাণী গীতা, চণ্ডী এবং মধ্য যুগের সাধকগণের রচনা পযন্ত আসিয়া পৌছিয়াছি। ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ তন্মধ্যে আবার ঈশোপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়। ঈশোপনিষদের যে-কোন পাতা উল্টাইলেই এই বাণীবহ শ্লোক পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতেই ইঙ্গিতটি পাইয়াছেন এবং নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা, তাহাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন—পুরাণী প্রজ্ঞাকে আধুনিক জীবনের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এই বাণীরই শিল্পরূপ। ইহার রহস্য সন্ধানের জন্য ভারতের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর ভ্রমটা কি? সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে ব্রহ্ম সংসারাতীত নহেন, তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন, তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও অছেন—তিনি সর্বত্রব্যাপী, সবত্রকে অতিক্রম করিয়া কোথাও গুহাহিত হইয়া নাই।[৩]

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল দেবতা চিন্তায় নিরত থাকে তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ

৩। ঈশোপনিষদে শ্লোক সংখ্যা ১॥৫॥ মূল নির্দেশের জন্য লেখক শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর নিকট ঋণী।

করে।"[৪] সন্ন্যাসী কি তাই করে নাই? রবীন্দ্রনাথের মতে উক্ত নাটকের প্রাকৃত নরনারীর চেয়ে সন্ন্যাসীর ভ্রম অধিক মারাত্মক। বিদ্যা ও অবিদ্যা (ব্রহ্ম ও জগৎ) সম্ভূতি ও অসম্ভূতির (প্রকৃতি ও হিরণ্য গর্ভাদি) উপাসনা একত্র করিবার বুদ্ধি সন্ন্যাসীর হয় নাই বলিয়াই প্রকৃতি অবশেষে তাহার উপরে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।[৫] যে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত, সাধনার দ্বারা সন্ন্যাসী তাহা খুলিবার চেষ্টা করে নাই। বেচারা ঐ হিরণ্ময় মুখাবরণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহার সত্যদর্শন ঘটিয়াছে।[৬] এই মৌলিক ভ্রম হইতেই সন্ন্যাসীর সাধনার ব্যর্থতা। ইহার মধ্যে কোথায় অভারতীয়ত্ব? ইহা তো ভারতীয় সাধনার মূল কথা।

এবারে শারদোৎসবে আসা যাক। শারদোৎসবের মূল কথা প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির ঋণ শোধের চেষ্টা। এই কারণেই শারদোৎসবের পরবর্তী সংস্করণের নাম ঋণ শোধ। আমাদের শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ শোধের উল্লেখ আছে। প্রকৃতির ঋণ শোধের উল্লেখ অবশ্য নাই। কিন্তু স্পষ্টই বলিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কল্পিত প্রকৃতির ঋণ শোধের মূলে ঐ পুরাতন ঋণ শোধের ভাবটাই সক্রিয়। প্রকৃতিকে মানুষের জীবন ধারণের জন্য উপকাররূপে ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার সময়েও যদি আমরা সচেতন-ভাবে করি, কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করি—তাহা হইলেই ঋণ শোধ হয়। এই ভাবটি আমাদের লোকজীবনে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। এখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠুরিয়াগণ কোন গাছ কাটিবার আগে কুড়াল তুলিবার পূর্বে বৃক্ষটির উদ্দেশ্যে তিনবার সেলাম করিয়া লয়। সে ঐ ঋণ শোধের অঙ্গ। তাহারা যেন বলিতে চায়—তোমার কাষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনধারণ অসম্ভব, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তুমি যে কাষ্ঠ দান করিতেছ, আমি তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছি। কাজেই কি শাস্ত্র; কি লোক ব্যবহার সর্বত্র ঋণ শোধের ভাবটি পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকেই অপরূপ কলা কবিত্বময়, আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ শিল্পবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার রহস্যের মূল এই দেশেই আছে—অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

৪। তদেব শ্লোক সংখ্যা ৯ ॥

৫। তদেব শ্লোক সংখ্যা ১১ ॥ ১২ ॥ ১৪ ॥

৬। তদেব শ্লোক সংখ্যা ১৫ ॥

এবারে রাজা, ইহাতে দাস্য, সখ্য ও মধুরভাবে রাজাকে ভজনার যে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি বিশেষভাবেই এদেশের কথা নহে? রাজা যিনি অরূপরতন (রাজার পরবর্তী সংস্করণের নাম অরূপরতন), যিনি একাধারে বীতরূপ ও সর্বরূপ—তিনি তো বিশেষ ভাবেই ভারতীয় ধর্মসাধনার লক্ষ্য! প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী যে ভুল করিয়াছিল, রাণী সুদর্শনাও সেই রকম ভুলই করিয়াছিল। তবে দুজনের ভুল দুই ভিন্ন পথে আসিয়াছে। সন্ন্যাসী জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্মাকে নির্বিশেষরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল আর সুদর্শনা নির্বিশেষকে বাদ দিয়া রাজাকে বিশিষ্ট মানব মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল। রাণী কেবলমাত্র অবিদ্যার বা অসম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল আর সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বিদ্যার বা সম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল। এ দুই ভুলের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভুলটাই বেশি মারাত্মক। সেই জন্যই দেখিতে পাই যে, সন্ন্যাসীর জীবন ট্রাজেডিতে পরিসমাপ্ত হইল আর রাণী দুঃখ সাধনার অন্তে লক্ষ্যে পৌছিতে সিদ্ধকাম হইয়াছিল।

অতঃপর ডাকঘর। ডাকঘরে অমল ও মাধব দত্তের সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, কিন্তু একজনের মুখ বিশ্বের দিকে আর একজনের মুখ গৃহের দিকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "দুই পাখী" শীর্ষক কবিতাটি স্মরণযোগ্য। বনের পাখী ও খাঁচার পাখীর মধ্যে সম্পর্ক প্রেমের—কিন্তু কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারে না। অমল ও মাধব দত্তের মধ্যেও কি সেই সম্পর্ক নয়? পাখী দুটি এবং অমল ও মাধব দত্তের বিচিত্র সম্পর্কের মূলে একটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় ইঙ্গিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্বত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন এবং অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"[৭]

অবশ্য এ দুটি পাখীর একটি জীবাত্মা অপরটি পরমাত্মা। অমল ও মাধব দত্ত সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়। সে সম্বন্ধ আরোপের প্রয়োজনও নাই। আমার বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে যে অর্থেই এ শ্লোকটি কথিত হইয়া থাক্—পরস্পর সখ্যভাবে বদ্ধ পাখী দুটির চিত্র অমল ও মাধব দত্তের চিত্র অঙ্কনে খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিল। দু'জনে একই গৃহে অবস্থিত, দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, অথচ একজন উদাসীন, অপরজন আসক্ত—এসব কথা মনে রাখিলে আমার

৭। ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ২০, মুণ্ড ৩। ১। ১; শ্বেতা ৪। ৬

এই কল্পনাকে অলীক বা একাধারে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। আর এই সম্পর্কটির চিত্র বিশ্লেষণই তো ডাকঘরের নাটকীয় রস। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও আমরা দেশের সাধন পন্থার উপরেই আছি—দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই।

এবারে অচলায়তন নাটকে আসা যাইতে পারে। এই নাটকখানাতেও দেখিতে পাইব যে, ভারতীয় সাধন পন্থার কথাই উক্ত হইয়াছে। অচলায়তনিকদের পন্থা জ্ঞানমার্গ, শোন পাংশুদের পন্থা কর্মমার্গ আর দর্ভক পল্লীবাসীদের পন্থা ভক্তিমার্গ। এই তিন ভিন্ন মার্গের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে অচলায়তন নাটকে। আর এই তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ভারতীয় সাধনারও চরম কথা নয়? তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে শাস্ত্রে যাহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে কবি ও মনীষী হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব। কিন্তু মূল ভাব তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এমন সব কথা চিন্তা না করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাধনার বা ভারতীয় জীবনের যোগ নাই, এসব অশ্রদ্ধেয় প্রলাপ উচ্চারণ চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

সত্য বটে ফাল্গুনী নাটকের মূলে কোন প্রাচীন শাস্ত্রীয় নজির নাই। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক নাটকটি কবির ব্যক্তিগত জীবনবেদনা হইতে উদ্ভূত। একদিকে এই বেদনার সাক্ষ্য—অন্যদিকে প্রকৃতির সাক্ষ্য। ঋতু পরম্পরার মধ্য দিয়া অনন্ত যৌবনের যে লীলা বিশ্বে নিত্য প্রত্যক্ষ, যে লীলার নজিরে মানবের সমষ্টিগত যৌবনকেও কবি নিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাই ফাল্গুনী নাটকের উপজীব্যের মূলে। ভারতীয় শাস্ত্রের পরিবর্তে বিশ্ব প্রকৃতির শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। যৌবনবেদনাজাত আরও একটি নাটক আছে—তাসের দেশ। ইহার মূলে শাস্ত্রের ইঙ্গিত নাই বটে, তবে জীবনের ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া অচলায়তনে যেমন যৌবনের দূত বিদেশী শোণ পাংশুগণ, এখানে তেমনি যৌবনের দূত দ্বীপান্তর হইতে আগত রাজপুত্র। এ দুটি ঘটনার মূলেই ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল। তাহা যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে অচলায়তন ও তাসের দেশের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য কবিকে অন্যত্র যাইতে হয় নাই—দেশে বসিয়াই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

যে নাটকগুলিকে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত বলিয়াছি তাহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয়, তেমনি তিনি স্বকালীয়ও বটেন। ভারতের প্রাচীন বাণী তাঁহার প্রতিভায় যেমন নূতন জীবন পাইয়াছে, তেমনি তাঁহার স্বকালের অনেক জীবন সমস্যাও তাঁহার প্রতিভায় আশ্রয় খুঁজিয়াছে। বর্তমানে সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে ঠিক এমনটি এভাবে প্রাচীনকালে দেখা দেয় নাই। এ সমস্যা বিশেষ ভাবে এ কালেরই, আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে এই কালের লোক—তাঁহাকে এ সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইয়াছে, চিন্তার কলকে একদিকে যেমন প্রবন্ধাদিতে করিয়াছেন—আর একদিকে তাহাকে তেমনি বাণীমূর্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বাণীমূর্তিগুলিই এক্ষেত্রে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত নাটক, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা।

মহাকবি মাত্রকেই স্বকাল সম্বন্ধে, স্বকালের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, আর স্বকালের উপাদানে তাঁহারা চিরকালের মূর্তি গড়িয়া রাখিয়া যান। হোমার হইতে সেক্সপীয়র গোটে পর্যন্ত, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন বাণীকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনি বর্তমান জীবনের নূতন বাণীকেও চিরকালীন ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তাঁহার উপরে স্বকালের যে দাবী আছে তাহাকে স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে যদি বিরুদ্ধ সমালোচকগণ প্রাচীন বাণী খুঁজিয়া না পান, তবে তাহা দোষ নহে, গুণ বরঞ্চ ইহার বিপরীত ঘটিলেই দোষ হইতে পারিত, স্বকালের দাবীকে অবহেলায় মহৎ দোষ। তবু ভারতীয় বাণীর যে একেবারে অভাব আছে এমন নয়। কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের স্বভাবের হেরফের ঘুচাইবার নিমিত্ত প্রতিকারের যে উপায়ের কবি নির্দেশ করিয়াছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—তাহা একান্তভাবেই ভারতীয়, বোধকরি এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে এমন কোন সমালোচক উদ্যত হইলে রবীন্দ্র সাহিত্য ও প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে আরও গভীর, আরও নিবিড় যোগ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে যতটুকু বলা হইল তাহাতেই নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়তার নাড়ির যোগ নাই—এই দায়িত্বহীন উক্তি যেমন অবাস্তব, তেমনি অশ্রদ্ধেয়।

৬

এবারে নাটকগুলির আকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে, তাহাতেও দেখা যাইবে যে, তাহার নাটকগুলির, অন্তত তত্ত্ব নাট্যগুলির টেকনিকের মূলে কোন বিদেশীয় নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোক-জীবনের pattern বা কাঠামোর আদর্শ। গোড়া হইতে সেই আদর্শকে তিনি অনুসরণ করিতে ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্যলাভও করিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই নাটকখানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। সেটি কি? নাটকখানির অধিকাংশ দৃশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—এগুলি একটি পথ ও বিচিত্র জনসমাবেশের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহার পরবর্তী তত্ত্বনাট্যসমূহ এই দুটি বস্তুকে ক্রমে অধিকতর বাস্তব, অধিকতর স্পষ্ট ও শিল্পসম্মত রূপে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত যে pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ। এটাই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রয়োজন ও অবস্থা ভেদে ইহার সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে।[৮]

প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে অনেক দিন তিনি তত্ত্বনাট্য লেখেন নাই।

এই সময়টায় বিসর্জন রাজা রাণী এবং গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যনাট্য লিখিত হয়। এগুলি সেক্সপীরীয় ধরনের ট্রাজেডিময়, কাব্য ধর্মী নাটক কাজেই এখানে পূর্বোক্ত টেকনিক প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। শারদোৎসব নাটকে পুনরায় তত্ত্বনাট্যের ধারা দেখা দেয় এবং সেই পূর্বোক্ত টেকনিকও দেখা দিতে থাকে।

শারদোৎসব নাটকের ঘটনাস্থান বেতসিনী নদীর তীর ও নদীর তীরবর্তী পথ।

রাজা নাটকের অনেকটা জায়গা জুড়িয়াই পথ এবং সেই পথ গিয়াছে বসন্তোৎসবের মেলার দিকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার ঘর—আর শেষ দৃশ্যে একটি পথ, যে পথে রাজা সুদর্শনাকে বাহির করিয়াছেন। শুধু রাণী নয় কবি নিজেও ঐ পথে বাহির হইয়াছেন; রাণী বরণ করিয়াছে পথকে রাজার সহিত মিলনের সূত্র রূপে, কবি বরণ করিয়াছেন পথকে তাঁহার চরম টেকনিকরূপে।

ডাকঘরে দেখি অমলের রোগশয্যা যে বাতায়নের ধারে তাহার সম্মুখে একটি পথ—ঐ পথেই নাটকের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছে।

৮। টমসন তাঁহার গ্রন্থে প্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন।

অচলায়তনেও এই পথেরই প্রাধান্য, প্রথম দৃশ্যটি পথের দৃশ্য,পঞ্চকের মুখের প্রথম গানটি "এ পথ গেছে কোন্‌খানে !"

ফাল্গুনীর নাট্যদৃশ্য "পথের প্রান্তরে বনে বাদাড়ে ঘটিয়াছে এবং যে চরম পথকে অনুসরণ করিয়া নবযৌবনের দল যাত্রা করিয়াছে—তাহার চূড়ান্ত পরিণাম পরম রহস্যময় গুহামুখে।

মুক্তধারাকে তত্ত্বনাট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি, সেটি এই কারণেও বটে। পথ ও মেলার দৃশ্যটি এখানে প্রায় পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে। নাট্য দৃশ্য সমস্তটাই একটানা পথের উপরে ঘটিয়াছে, ঘটনায় কোথাও ছেদ নাই এবং এই পথিক জনতার লক্ষ্য ভৈরব মন্দির, সেখানে পূজোপলক্ষ্যে সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীর সমবেত হইবার কথা।

রক্তকরবী নাটকেরও একটি মাত্র দৃশ্য, রাজার জালায়নের বাহিরের পথ। এই পথকে অবলম্বন করিয়াই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

কালের যাত্রা তো পথেরই নাটক, যে পথে রথ অচল আর জনতা চলমান।

বাঙলা দেশের লোকজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ পথপার্শ্ববর্তী মেলা। এইসব মেলায় বিচিত্র্য ধরনের, বিচিত্র স্বভাবের এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যের লোক সমবেত হইয়া থাকে। ইহার Pattern-এ একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, আর একদিকে তেমন সরলতা। লোকজীবনের এই অতি সাধারণ, অথচ মনোরম ও বিচিত্র ছবিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বনাট্যের ছাঁচ বা প্যাটার্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটকে যে জনতা দৃষ্ট হয়, তাহা এই প্যাটার্নেরই অঙ্গ ; যে গানের দল ও ঠাকুর্দা দৃষ্ট হয় তাহাদেরও অনুরূপ মেলাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ফকির ও বাউলের দল নাই, এমন মেলা বাঙলা দেশে বিরল। যাত্রা গানে যে জুড়ি ও গানের দল দেখা যাইত, (এখনকার থিয়েটার ঘেঁষা যাত্রায় ওসব আর থাকে না) তাহা এই মেলার গায়কদলের আদর্শেই গঠিত। দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার প্রভাব ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস।

আমার এইসব উক্তি ও অনুমান যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যেসব "খাঁটি বাঙালী" নাট্যকার সেক্সপীরীয় ধরনের ট্রাজেডি বা মোলিয়ার ভাবা কমেডি লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক, এখানে তত্ত্বনাট্যগুলি, কি আকৃতির বিচারে, কি প্রকৃতির বিচারে তাঁহাদের নাটকের চেয়ে অনেক বেশী "খাঁটি দেশী" এবং সেইজন্যই অনেক বেশি বাস্তব। লোকজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র-

সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া যাঁহারা খেদ করিয়া থাকেন তাহারাও অবহিত ও আশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহাদেব খেদের কারণ নাই, কেননা এমনভাবে লোক-জীবন ও দেশের গভীরতর জীবনোপলব্ধির উপরে আর কাহারও রচনা প্রতিষ্ঠিত নহে।

৭

রবীন্দ্রসাহিত্য যে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও অভারতীয় বোধ হয় তাহার একটা কারণ অপঠিত পাণ্ডিত্য। অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য আংশিকমাত্র পড়িয়া বা একেবারেই না পড়িয়া, কিংবা জনশ্রুতিযোগে মাত্র শুনিয়া সমালোচনা করতে বসেন—এমনস্থলে সুবিচার যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। এই ধরনের সমালোচনারীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল এখন যে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এমন বলা চলে না। তারপর সমালোচকগণের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব কথা কথিত হয়, বা যেসব চিন্তা চিন্তিত হয়, তাহাকেই ইঁহারা দেশের তথা ভারতীয় বাণী বলিয়া মনে করেন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি না পাইলে তাহাকে সরাসরি অভারতীয় বলিয়া মনে করেন। এখন ইহার প্রতিকার কি? আর যাই হোক কবিকে এজন্য দায়ী করা চলে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য দুর্বোধ্য লাগিবার আরও একটি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌ভঙ্গী অনেকাংশে নূতন। প্রত্যেক মহাকবির বাক্‌ভঙ্গীই নূতন, ইহা তাহার মহাকবিত্বেরই বিভূতি। তিনি যে ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য প্রাচীনতর, বাঙালী কবির প্রতিধ্বনি করিবেন না—ইহাই স্বাভাবিক। তারপরে তিনি এমন অনেক উপমা ও অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা বাঙলার সাহিত্য কেন সংস্কৃত সাহিত্যেও নূতন—ইহাও তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিভূতি। এসব তাঁহার গুণ, দোষ নয়। আর এজন্য তাঁহাকে অভারতীয় বলিব কেন? ভারতীয় সাহিত্যের বাক্‌ভঙ্গী চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এমন হইতেই পারে না। লৌকিক কবিগণ যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুসরণ করেন, মহাকবিগণ নূতন বাণীমার্গ রচনা করিয়া সেই পথে চলেন, কালিদাসের কাব্য প্রথম রচনাকালে এই জাতীয় সমালোচকের কাছে নিশ্চয় তাহা "অভারতীয়" বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজী সাহিত্য সুপরিচিত কাজেই তাহার প্রভাবও তাঁহার কাব্যে অর্থাৎ চিন্তায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে পড়িয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক, নিন্দার নয়। একটি মহৎ সাহিত্য পড়িলাম অথচ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইলাম না—ইহা

প্রশংসার নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আত্মস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে কাজেই তাহাকে আর বিদেশীয় বলা উচিত নয়। টমসন কর্তৃক উধৃত সমালোচক বলিয়াছেন যে ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকই কেবল রবীন্দ্র সাহিত্য বুঝিতে সক্ষম। তাহা যদি হয় তবে উক্ত সমালোচকের বাধিল কেন ? কারণ তিনি পূর্ব সংস্কার লইয়া রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় নামিয়াছিলেন। আসল কথা এই যে রসবোধের প্রসারের উপরে রবীন্দ্রসাহিত্য বা যে কোন মহৎ সাহিত্যের রসোপলব্ধির নির্ভর। একালে ইংরেজী সাহিত্য আমাদের রসবোধকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কালিদাসের কবিবিভূতি অধিকতর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি কালিদাসকে পৃথিবীর মহাকবিগণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্র বিচারের পটভূমি কেবল ঈশ্বরগুপ্ত বা বৈষ্ণবগণ নহেন, এমনকি শুধু ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাসের পটভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করাও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ও বিদেশীয় মহাকবিগণের সান্নিধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তবেই তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার কবি-বিভূতি সম্যক উপলব্ধি হইবে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষ-ত্রুটিরও স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করুন বা না করুন, তিনি নিজেকে বিশ্ব-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বা ইটালীর অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকে সেক্সপীয়ার বা দান্তের কাব্য কিনে কি না জানি না (বোঝে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস), কিন্তু তজ্জন্য যেন তাহাদের অ-ইংলণ্ডীয় বা অ-ইটালীয় বলে না, তবে আমরাই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতের নজিরে রবীন্দ্রনাথ অভারতীয় বলিব কেন ? মহৎ সাহিত্যের রস-বোধ সুশিক্ষার ফল। পাঠকের সে ত্রুটির দায় লেখক বহন করিতে যাইবেন কেন ? ন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে তবেই বিচারাসনে বসা উচিত। রসবোধের ক্ষমতায় যিনি বঞ্চিত কাব্য সমালোচনার ক্ষমতা তাঁহার সুপ্রচুর একথা কে মানিবে ? ফলকথা উক্ত লেখকের উক্তি কাব্য সমালোচনা নয়, আপন ক্ষুদ্র মনের পূর্ব সংস্কারের ছায়াপথ মাত্র। উক্ত সমালোচনার দ্বারা কেবল নিজেকেই তিনি অরসিক প্রতিপন্ন করেন নাই, যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদেরও অরসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রসবোধের প্রবলতম অন্তরায় পূর্ব সংস্কার।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : অন্নদাশঙ্কর রায়

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি• যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মত শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পীত্ব খাটেনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্বল। অথচ শিল্পী নন্ এমন কোন কোন মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্পীসৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসঙ্গত অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো ক'রে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বন্ধ হযনি, অন্তর্বিরোধসম্পন্ন বা অসঙ্গতি-বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে-জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব ?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড় দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোক যুগপৎ উপহাস ভয় ও সন্দেহ করছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার ক'রে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হ'য়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতি নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geology-র গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছ্‌ল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্মে ও কর্মে ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্ব-মানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল, স্কুল-কলেজের

অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হ'ত। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, রুটিন ও এগ্‌জামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হ'য়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ হ'য়ে পর্যবেক্ষণ শক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুণ স্কুল-ঘরের চারদিকে চার দেওয়াল প্রহরীর মতো পাহারা। যঃ পলায়তি স জীবতি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্বে ঢিল দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্যা ব্যক্তি যে-কোন দেশে বিরল। কিন্তু অধিত বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকীরণ করাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থীসিস লেখেন নি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জ্জিত বুদ্ধির যে-দীপ্তি দেখতে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে—তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী রাখেননি, কিন্তু তাঁর "ছিন্নপত্র" থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্বভুক্‌ পাঠক এবং তাঁর পর্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কি প্রকৃতির সংসার, —কি মানবের সংসার—উভয়ের অন্তর-বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্র সমাজে এক ঘরে হ'তে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধেও অতি বড় ধনী সন্তানের ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ করে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক করলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল করলেন ব'লে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এমনি ক'রেই নিজের পরিচয় দেন। পশু-পক্ষীর মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইনটুইশনের ক্রিয়া অমোঘ। কোন্‌ পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তৌল না ক'রে যুক্তিতর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদ্গমে বিলাত-যাত্রা তাঁর স্কুল-পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনো আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবল মাত্র বিদেশী গ্রন্থপাঠের দ্বারা হ'বার নয়।

পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষতঃ যে-মানুষকে একদিন মানব মাত্রের বন্ধু হ'তে হবে, প্রতিভূ হতে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান তার সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রা জ্ঞান জন্মায়, অহঙ্কার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসাবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুণ তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হ'বার দরুণ তাঁর রচনা রুগ্ন আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্র নারায়ণ সেবা, কাঙালী ভোজন ইত্যাদি এত অস্বাস্থ্যকর যে যথার্থ করুণা ও লোক প্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শই হচ্ছে সর্ব দেশের সর্ব কালের পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয় সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি করতে, রক্ষা করতে ও বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে কিম্বা একালে বহু মানুষকে নেশা পাওয়াতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হ'ল কিনা সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্র বিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়ন দ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্ঘাটিত হবে। সেটির এটা ওটা করে অনেক রেখা ও রঙ, আমাদের অপছন্দ হ'লেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কমবে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা ও পাকা যা কিছু লিখেছেন, হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর

এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্বমুহূর্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীলতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হ'য়ে পড়ে।

একালের মানুষ দিন দিন পল্লীকে ছেড়ে নগরে জুটছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্য নূতন চমক, নিত্য নূতন খবর, নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়; তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থতার জন্যে পল্লীই ছিল ভালো এবং পল্লীতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা নদী পর্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্য নূতন, পল্লী তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতি পক্ষপাত করলেও নগরকে বর্জন করলেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত মদিরা পান করে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবক্ষে নৌকা-বাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন রোম্যান্সের মতো লাগে। ততটা নির্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা করছে। পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ করতে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হ'তে গিয়ে যা সৃষ্টি করব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীব চরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কি মানব চরিত্র, কি বিশ্বব্যাপার —কোনটার ঠিক মতো নিরিখ হয় না। বাস্তব ব'লে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থার বাস্তব। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখ-দৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পট ভূমিকায় প্রসারিত করলে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত বলে জানলে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্বত্র পরিচিত

করলেও দেশের কর্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নব-যুগের প্রাণ স্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব জন্মলক্ষণ "ঘরে-বাইরে"তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্তব্য একদিন-না-একদিন করতেই হবে—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্তব্য যার প্রতি, সে যে পরিমাণে বৃহৎ কর্তব্যের পূর্বাহ্ণের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবল মাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই করে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনকয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনু-মন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার, পেট্রিটিজমের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্যাদা তখন বুঝল না, এতদিন পরে আজ বুঝছে।

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদলে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বলতে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতি সামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আঁসা ছিল না। নিরক্ষরতা দলন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণরূপে ফুল হতে পেরেছে, তারাই কাল পরিপূর্ণরূপে ফল হতে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহমনকে নানাদিকে স্ফূর্তি দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় ব'লে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতি-শিক্ষাকে স্ফীত হ'তে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্য সমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনোদিন

ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আরও একটু ভালো ক'রে বুঝবে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়-জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হ'তে দেননি। তাঁর "খেয়া" ও "গীতাঞ্জলি" এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমনি একটা পরিণতির প্রতিক্ষা করছিল। ফলের পক্কতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হ'লে তিনি সকলের সবকালের কবি ও প্রতিভূ হ'তে পারতেন না। প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হ'লেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" রচিত হ'ল।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী ব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যা বিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজী তর্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে করে লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েটস্‌কে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিক্‌ দিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হ'লেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ্য সহজ ভাবে নিলেন। ছিন্ন ভিন্ন পরাধীন দীন দরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগ্বিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরনে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ; তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণ বিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসান্বিত করা এতগুলো বড় জিনিস কি ছোট একটি দেশে আবদ্ধ থাক্‌তে পারত? দু'দিন আগে না হ'লে দু'দিন পর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়্‌ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date; বিশ্ব সাহিত্য তাঁর ভালো করে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকা-বাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হবার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃহত্তর মানব সংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ল। গত মহাযুদ্ধের বিনষ্টির ক্ষণে

Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় করলেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য তাঁর স্বদেশ-বাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন্ হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনই ধর্ম আমাদের পক্ষে, তখনি তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ান্ওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করতে তিনি মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ খণ্ডে লীগ্ অফ্ নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মরল না। যে যেমন ছিল তা প্রায় তেমনি থাকল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে নেশন্ও নয়, লীগ্ অফ্ নেশনস্ও নয়। স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে মিলন সত্যকার হ'তে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞান-বিনিময়, প্রীতি-বিনিময় করে, সেইখানে তার মিলন-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারী লীগ স্থাপন করলেন, অব্ নেশনস্ নয়—অব কাল্চারল্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি। আজ যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোন অনুষ্ঠানের থাকে তবে এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে, "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" এমন একটি পুণ্য তীর্থের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হ'য়ে, শতায়ু হ'য়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দল-গুলি উন্মোচন করতে থাকুন। সেই তো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্ত পুরুষের আহ্বান করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; রবীন্দ্র-নাথের সহ-ধর্মীগণ এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইবেন যে, মানুষকে মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কি ভাবে বাঁচব" এই প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর।

রবীন্দ্রকাব্যে শিল্পের ত্রিধারা : অশোকবিজয় রাহা

কাব্য শ্রুতিনির্ভর শিল্প, তাই শিল্প হিসাবে তা সংগীতের অনেকটা কাছাকাছি। যিনি বাগ্‌দেবী তিনিই বীণাপাণি। কাব্যলোক থেকে সুরলোক যে খুব বেশি দূরে নয় তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে কবিতা গান করা যায়। শব্দপ্রতীকাশ্রিত কাব্য ও সুরপ্রতীকাশ্রিত সংগীত,—এই দুয়ের যৌগিক মিশ্রণে গানেব জন্ম। সার্থক গানে কথা ও সুরের এই মিলনটি এতই আশ্চর্য যে দুটিতে একেবারে একাত্ম হয়ে যায়। কাব্যের সঙ্গে সংগীতের এই আশ্চর্য মিলনের একটা বড়ো কারণ এই যে কাব্যের 'বাগর্থে'র 'বাক্'-অংশটি ধ্বনি (sound) এবং এই ধ্বনির নিজেরই একটি ভাবব্যঞ্জক সুর বা সংগীত আছে। এ ছাড়া ছন্দোময় বাণাতে এই 'বাক্' আপনা থেকেই তরঙ্গিত হয়ে ওঠে এবং নিরূপিত তাললয়যুক্ত হয়ে এই ধ্বনিতরঙ্গ নিজের মধ্যেই একটি সংগীত সৃষ্টি করে। এই সংগীত হচ্ছে কাব্যের বাণীসংগীত বা দেহসংগীত। সুর দিয়ে গাওয়া না হলেও কাব্যের এই দেহসংগীতটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরমণ্ডল রচনা করে। কবির হাতে বাঁশিই থাক আর বীণাই থাক, মুখে ভাষা থাকা চাই ; এমন কি বাঁশী কিংবা বীণা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কবি ঐ ভাষাটিকেই বাঁশির মতো ক'রে, বীণার মতো ক'রে বাজাতে পারেন। শুধু গীতি কবিতারই যে সুর আছে তা নয়, মহাকাব্যেরও একটি গুরুগম্ভীর উদাত্ত সংগীত আছে। মহাকাব্যের 'মেঘমন্দ্র শ্লোক'গুলিতে ধ্রুপদী তালের ছন্দ সমুদ্র দুলে ওঠে। গীতিকবিতার তরলোচ্ছল কল্লোলের সঙ্গে এর প্রভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর কাব্যের বাণীদেহে যে বিচিত্র সংগীতের মূর্ছনা জাগিয়েছেন তা তাঁর রচনাবৈচিত্র্যের মতোই বিস্ময়কর। ধ্বনিজগতের যত রকম বৈচিত্র্য আছে,—হাওয়ার নিশ্বাস থেকে শুরু ক'রে বজ্রের গর্জন পর্যন্ত যত রকম স্বরতরঙ্গ উত্থিত হয়,—তাদের প্রায় সবগুলিকেই তিনি তাঁর কাব্যে রসরূপ দান করেছেন এবং অনেক সময় কাব্যের বাণাসংগাতেও তিনি তাদের ধ্বনিপ্রতিরূপ সৃষ্টি করেছেন। এ-বিষয়ে

অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি,* কাজেই আপাততঃ এ-প্রসঙ্গ থাক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের বাণীদেহে গীতজগতের কী কী ঐশ্বর্য ধ'রে রেখেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। সংগীতজগতের তারযন্ত্র ও অন্যান্য ধাতব বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ পাখাজ প্রভৃতি পটহযন্ত্র, এবং বাঁশি,—সবকিছুর ধ্বনিকেই তিনি তাঁর কাব্যের শিল্পদেহে প্রতিস্পন্দিত ক'রে তুলেছেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে এ-বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেছি। তবে ভেবে দেখতে গেলে এদের সবগুলিই সংগীতের আশ্রয় মাত্র। শুধু এগুলি কেন, যে সাতটি স্বর নিয়ে সংগীত সৃষ্টি হয় তারাও সংগীত নয়, সংগীতের উপাদান। এই সুরগুলিকে নিয়ে প্রতীকদ্যোতনাময় শিল্পমূর্তি রচনা করাই সংগীতের কাজ, এবং তার মধ্যে দিয়ে অনুরূপ রসসৃষ্টি করাতেই সংগীতের সার্থকতা। আর এই জন্যই সে তার বিচিত্র রসব্যঞ্জনাযুক্ত রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখতে পাই গীতিকবিতার কথাগুলিতে সাধারণতঃ সুরের খেলাই প্রধান। অবশ্য এ-সুর সংগীতের রাগরাগিণী থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু তা হলেও সংগীতের যে রসপরিণতি, সুরপ্রধান কবিতার পরিণতিও তাই। এই দুই জগতের দুটি স্বতন্ত্র সুরই শেষ পর্যন্ত আমাদের মনের ভাববীণায় বাজছে। ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে অনুরূপ রসসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সুরজগতের রাগরাগিণীর আভাসকে কী ক'রে গীতি-কাব্যে সঞ্চারিত করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তার দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক তাঁর 'সুদূর' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি :

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে,
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি[১]—

কথাগুলির মধ্যে একটি কাতর ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে,—যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কার বাঁশির কান্না। দূর থেকে একটি করুণ রাগিণীর দীর্ঘ তান শুনলে মনে যে অনুভব জাগে, এ যেন অবিকল তাই।

কিংবা ধরা যাক তাঁর 'গৃহপ্রবেশে'র একটি গানের দুটি পঙ্‌ক্তি :

রক্তিম অংশুক মাথে,
কিংশুককঙ্কণ হাতে,[২]—

* রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : হিরণকুমার বসু-স্মরণ-বক্তৃতামালা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৫৮।

১। উৎসর্গ ৮ : র-র ১০।১৭

২। গান : গৃহপ্রবেশ : র-র ১৭।১১৬

এখানে বাঁশি নয়, সেতার বাজছে; দূরে নয়, কাছে; কান্না নয় উৎসবের রাগিণী।
চারিদিকে উৎসবের আলো জ্বলছে, মাঝখানে ঝলমল করছে গানের আসর, দ্রুতলয়ে
বাজনা চলেছে। তবলা তাল দিচ্ছে, সেতারের তার থেকে ঝিলিক দিয়ে ছিটকে
পড়ছে সুরের ফুলকি।

কিংবা ধরা যাক চণ্ডালিকার একটি গান :

হে মহা দুঃখ, হে রুদ্র,
হে ভয়ংকর, হে শংকর, প্রলয়ংকর।[৩]—

এ খেয়াল ঠুংরি নয়, একেবারে ধ্রুপদ। বাঁশি নয়, সেতার নয়,—তানপুরার সঙ্গে
ধ্বনিত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণীর উদাত্ত কণ্ঠে গুরুগম্ভীর শুদ্ধ রাগ। গানের সঙ্গে পাখাজের
সুগম্ভীর তাল একেবারে বুকের মধ্যে এসে বাজছে।

এই শেষের গানটির সঙ্গে এর আগের গানটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে
কবিতার দেহসঙ্গীতে ঠুংরি থেকে ধ্রুপদ পর্যন্ত সব শ্রেণীর সংগীতই তিনি কী আশ্চর্য
দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারেন। কী কৌশলে যে রবীন্দ্রনাথ এই আশ্চর্য কাজটি
করেন তা একেবারে নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না, কেন-না সব সময় কৌশল এক নয়।
এখানে আগের গানটিতে 'অংশুক', 'কিংশুক' আর 'কঙ্কণ'—এই তিনটি শব্দ সেতারের
তারে ঝিলিক দিয়ে তিনটি সূক্ষ্ম ঝংকার তুলেছে, আর প্রথমে 'রক্তিম' কথাটিতে
'ক্ত'-এর যুক্তধ্বনিতে একটুখানি তবলার 'বোল' শোনা যাচ্ছে। শেষের গানে প্রথম
পঙ্‌ক্তির প্রথম 'হে' কথাটি সংস্কৃত গুরুস্বরের নিয়মে দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু সে ঐ
একবার মাত্র, এরপর দুটি পঙ্‌ক্তিরই অন্য তিনটি 'হে'-ধ্বনি 'হ্রস্ব'। এখানে গুরু-
গম্ভীর ঝংকার উঠেছে তিনটি কথায় : 'ভয়ংকর' 'শংকর' আর 'প্রলয়ংকর'। প্রথম
গানের 'অংশুক' 'কিংশুক' আর 'কঙ্কণের' সঙ্গে তুলনা করলেই এদের গুরুগাম্ভীর্য
ধরা পড়বে। এই গান দুটির আরো দুটি ঝংকারমুখর পঙ্‌ক্তির তুলনা করলে
এ-প্রভেদ আরো স্পষ্ট হবে। প্রথমটির পরবর্তী পঙ্‌ক্তি হল :

মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে,[৪]

এবং দ্বিতীয়টির : ঘন ঘন ঝন ঝন ঝনঝন ঝনঝন,
পিনাক টংকরো।[৫]

৩। গান : চণ্ডালিকা : র-র ২৩।১৪৮

৪। গান : গৃহপ্রবেশ : র-র ১৭।১১৬

৫। গান : চণ্ডালিকা : র-র ২৩।১৪৮

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

তবে মনে রাখতে হবে, কাব্যের বাণীসংগীতে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য সঞ্চারিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই যে শব্দের যন্ত্রঝংকার সৃষ্টি করেছেন, তা নয়। একটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার না ক'রেও কাব্যের সুরকে কী ভাবে গুরুগম্ভীর করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের শত শত পঙ্‌ক্তিতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'ক্ষণিকা'র 'নববর্ষা' কবিতার কয়েকটি ছত্র তো এই মুহূর্তেই মনে আসছে :

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।[৬]

এতে অনুপ্রাস যতই থাক, যন্ত্রঝংকার নেই। ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ 'গ্‌' এবং কম্পিত তরল 'র্‌'—মুখ্যত এই দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাসের সাহায্যেই এখানে বাণীসংগীতের গাম্ভীর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন 'ঘ'-ধ্বনিটিও একবার উচ্চারিত হয়ে একে একটুখানি সাহায্য করেছে। কিন্তু কোনো রকম যন্ত্রঝংকার না থাকলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এতেই বর্ণমালার ধ্বনিতে মেঘ-গর্জনের গুরুগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

কথা হল, যে সব কবিতাকে আমরা বিশেষ ক'রে গীতধর্মী ব'লে থাকি, তারা আসলে কথার মধ্যে দিয়ে রসের সুরাশ্রিত রূপায়ণ। কাজেই কেবল বর্ণমালার ধ্বনিগুলিকে সবটুকু গুরুত্ব দিলে চলে না। সেই সঙ্গে কবিকে বিচিত্র ইঙ্গিতের সাহায্যে আমাদের অন্তরের ভাবানুভূতিতেও একটি অনির্বচনীয় সুরঝংকার সৃষ্টি করতে হয়। অনেক সময় একটি পঙ্‌ক্তি বাইরের কানের কাছে তেমন উচ্চারিত-ভাবে ধ্বনিত না হলেও সার্থক রসরূপায়ণের গুণে আমাদের অন্তঃকর্ণে একটি বিরাট অখণ্ড সংগীত সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাতেই এর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ধরা যাক 'মহুয়া'র 'অসমাপ্ত' কবিতার তিনটি ছত্র :

বনের মন্দির-মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের ওঠে স্তবগান।[৭]

এই ছত্র কয়টি বিচার করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। এখানে আগের উদ্ধৃতির

৬। নববর্ষা : ক্ষণিকা : র-র ৭।২৭১

৭। অসমাপ্ত : মহুয়া : র-র ১৫।৩০

মতো ঘোষবৎ বর্ণের অজস্র অনুপ্রাস নেই, তা ছাড়া উচ্চারিত এমন-কিছু মন্ত্র-ঝংকারও নেই,—'মন্দির' 'তম্বুরা' আর 'অনন্ত' এই তিনটি মাত্র গম্ভীর শব্দ বসানো হয়েছে,—অথচ সবশুদ্ধ নয়টি মাত্র শব্দের ইঙ্গিতেই এখানে যে অশরীরী ভাবসংগীত সৃষ্টি হয়েছে, তার সামনে অনন্ত 'কাল' স্তব্ধ হয়ে আছে।

তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কাব্য যেখানে বিশেষভাবে গীতধর্মী, সেখানে ভাষার শব্দঝংকার কিংবা শব্দের ধ্বনিতরঙ্গকে আশ্রয় ক'রে তার দেহসংগীত সৃষ্টি হলেও কেবল ঐটুকুই তার' শেষ কথা নয়। শ্রোতা কিংবা পাঠকের মনে অনুরূপ অন্তর্গূঢ় সংগীতের সৃষ্টি করতে পারলে তবেই তা শিল্প হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠে। এই দ্বিতীয় সংগীতটি হচ্ছে কাব্যের প্রাণসংগীত। কাব্যের দেহসংগীতকে আশ্রয় ক'রে এই প্রাণসংগীতটি যখন চমৎকারভাবে বেজে উঠবে তখনই জানব, গীতধর্মী কাব্যে সত্যিকার শিল্প সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে গীতধর্মী সার্থক কবিতায় কাব্যের এই দেহ-সংগীত ও প্রাণসংগীতের অন্তর্লীন একাত্মতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পর্শস্থান অনুভব করা যায়। এই স্পর্শস্থানটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কখনো কাব্যের দেহসংগীতকে, কখনো-বা তার প্রাণসংগীতকে উচ্চারিত ক'রে কবি তাঁর শিল্প সৃষ্টির মধ্যে গীতজগতের দুটি ঐশ্বর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। একটি হচ্ছে সুরের বর্ণচ্ছটা, অন্যটি ভাবের আকুলতা। প্রথমটির দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত গৃহপ্রবেশ ও চণ্ডা-লিকার গান দুটির মধ্যে দেখতে পাব। দুটিই শব্দঝংকার মুখরিত। এদের তুলনায় প্রথমে উদ্ধৃত 'সুদূর' কবিতার পঙ্‌ক্তিটি ঢের বেশি 'প্রাণের ব্যাকুলতা'য় ভরা। পঙ্‌ক্তিটির আলোচনার সময়ে একে বাঁশির সুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম,—কাব্যের দেহসংগীতকে খুব নীচু পর্দায় নামিয়ে আর তার প্রাণসংগীতকে উচ্চারিত ক'রে এই বাঁশির সুরটি বাজাতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান ও কবিতা এই বাঁশির সুরের পর্যায়ে আসে। তাঁর 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', 'পূরবী'র বাগৈশ্বর্যময় বর্ণাঢ্য কবিতাগুলির সঙ্গে তাঁর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র গানগুলির তুলনা করলেই এই দুই ধরনের কবিতার পার্থক্য স্পষ্ট হবে। তাঁর 'গীতাঞ্জলির যুগের গানগুলি রচনার কালে তিনি যথার্থ ই বলেছিলেন:

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার।[৮]

৮। গীতাঞ্জলি ১২৫ : র-র ১১।৯৯

'সকল অলংকার' ছেড়ে দিয়ে তাঁর এ-ধরনের কবিতা শুধু একটি নিরালা 'বাঁশির সুর'ই বাজাতে থাকে :

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার
পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে আসে আসে,[৯]

কিংবা আর নাইরে বেলা নামল ছায়া
ধরণীতে,[১০]—

কিংবা আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো।[১১]

এ-রকম রচনা এর সার্থক দৃষ্টান্ত। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এ-সব গান তাদের দেহসংগীতকে যতটা সম্ভব চাপা দিয়ে তাদের প্রাণসংগীতটিকেই একান্তভাবে প্রকাশ করেছে। এ-সব কবিতার ভাষা স্বভাবতই সহজ,—অতি সহজ শব্দের বিলীয়মান রেশটুকুই এদের ভাষাগত উপাদান। কয়েকটি সহজ ইঙ্গিতের সাহায্যে কবি অতি কোমলভাবে আমাদের কানের কাছে ঐ রেশটুকু বাজাতে থাকেন ; ফল যা হয় তা একেবারে আশ্চর্য : ঐ একটুখানি ইঙ্গিতের সাহায্যে, ঐ রেশটুকুর আভাসে, আমাদের মনের কানে সত্যি এক বহুদূরের বাঁশির সুর ভেসে আসতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। এরপর তাঁর চিত্রধর্মী কবিতার বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করছি।

২

রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বের রূপলোক কী আশ্চর্যভাবে ধরা দিয়েছে তার বিশদ আলোচনা অন্যত্র করেছি।* আলো-ই আমাদের দৃষ্টি চেতনার কাছে রূপময় জগৎকে প্রকাশ করে, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে এই আলো কী ভাবে আকাশে, বাষ্পে, তরলে, কোমলে ও কঠিনে বিচিত্র বর্ণবিচ্ছুরণে ধরা পড়েছে, তা আমরা সেখানে তাঁর কাব্য থেকে অসংখ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছি।

৯। গীতাঞ্জলি ৬২ : র-র ১১।৫১

১০। গীতাঞ্জলি ২৬ : র-র ১১।২৪

১১। গীতবিতান : ৩২৬।১৪২

* রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ : পূর্বে উল্লিখিত।

এখন, তাঁর গীতিকবিতাগুলি সুরাশ্রিত হয়েও কী ক'রে অনেক ক্ষেত্রে মুখ্যত চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে, তা ভালো ক'রে বুঝতে হলে একটি কথা প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন। ছবি আর গানের একটি প্রধান তফাতই হচ্ছে এই যে ছবিকে আমরা দেখি স্থানের 'সহভাবে' (process of co-existence), আর গানকে আমরা শুনি কালের 'অনুক্রমে' (process of succession)। এখন, সংগীত থেকে এই 'ক্রম'কে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কাজেই সুরাশ্রিত কবিতাকে শিল্প হিসাবে চিত্রধর্মী ক'রে তুলতে হলে এই 'ক্রম'-এর দ্রুততা বাড়িয়ে তাতে অনেকটা 'সহজ-ভাব'-এর আভাস আনতে হবে। এতে ক'রে যা ছিল 'ক্রম' তা অতি-দ্রুততার ফলে হঠাৎ উচ্চকিত কিংবা আকস্মিক ব'লে মনে হবে। এতেই মনে খানিকটা 'সহজভাব'-এর ধারণা আসে। অবশ্য 'ক্রম'কে বিলম্বিত ক'রে শব্দপ্রতীকের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় কাব্যে ধীরে-সুস্থে ছবি আঁকবার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে, সে-সব ক্ষেত্রে মানসপটে শেষ পর্যন্ত চমৎকার ছবিও ফুটতে পারে,—রবীন্দ্রনাথের গীতিচিত্ররীতির কবিতায় তা অতি নিখুঁতভাবেই ফুটেছে,—কিন্তু তা হলেও সেখানে কবিতা শিল্প হিসাবে গীতধর্মী হতে বাধ্য। এদের বিষয়বস্তুতে চিত্রত্ব থাকলেও এদের শিল্প-বৈশিষ্ট্যে সুরেরই প্রাধান্য থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটি বিশদ করছি। পূর্বের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত গৃহপ্রবেশের গানের 'রক্তিম অংশুক' কথাটিই ধরা যাক। এতে ছবি আছে কিন্তু ঝংকারযুক্ত শব্দে বিলম্বিত প্রকাশের ফলে এতে ছবি যত-না স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সংগীত বেজে উঠেছে তার চেয়ে বেশি। এর চেয়ে 'লাল চেলি' কথাটা ঢের বেশি চিত্রধর্মী ; একটু বিচার করলেই দেখা যাবে এতে প্রকাশের দ্রুততা বেশি এবং এই দ্রুততা চৈতন্যের পর্দায় হঠাৎ আঘাত ক'রে একটা আকস্মিকতার সৃষ্টি করেছে। তাই—

> রক্তিম অংশুক মাথে
> কিংশুককঙ্কণ হাতে,—

এতে ছবি থাকলে কী হবে? এ তো আগাগোড়াই গান। কবি যদি বলতেন,

> মাথায় লাল চেলির আঁচল
> হাতে পলাশফুলের কাঁকন,—

তা হলে আগের পঙ্‌ক্তি দুটির সেতারের গুঞ্জন থেমে গিয়ে প্রতিটি ছত্রে শুধু এক-একটি অবাক-ছবি চমকে উঠত। ঠিক এই কারণেই বলব—

নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো,—[১২]

'বিদায় অভিশাপে'র এই পঙ্‌ক্তিগুলি যত না চিত্রধর্মী তার চেয়ে ঢের বেশি গীতধর্মী। এর তুলনায় 'মানস সুন্দরী'র—

অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো,—[১৩]

ঢের বেশি চিত্রধর্মী।

কিন্তু এইখানে একটা কথা আবার ব'লে রাখছি : কবিতা শিল্প হিসাবে প্রধানত গীতধর্মী হয়েও সার্থক চিত্র সৃষ্টি করতে পাবে, এমন কি তা' প্রথম শ্রেণীর কবিতা হতেও কোনোই বাধা নেই, শুধু তার শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হলে তাকে খাঁটি চিত্রধর্মী না ব'লে গীতধর্মী-ই বলা উচিত। 'গীতি-চিত্রধর্মী' কথাটিতে আসলে শিল্পরূপের সঙ্গে বিষয়বস্তুকে মিশিয়ে নেওয়া হয় মাত্র। এ ধরনের কবিতা মুখ্যত গীতধর্মী হয়েও কী ক'রে চিত্র সৃষ্টি করতে পারে, এবং কতটুকু পারে, তা' ভেবে দেখতে হলে আবার ছবির বৈশিষ্ট্যকে একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়।

ছবির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি আকস্মিক সমগ্রতা, যা সে তার 'সহভাব'-জনিত ব্যাপ্তি থেকেই পেয়েছে। ছবিব এই আকস্মিক চমকটি বিলম্বিত স্বরপ্রধান কবিতায় কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু ছবির যে দ্বিতীয় গুণবৈশিষ্ট্যের জন্য ছবিকে 'তুলির কবিতা' (brush poem) বলা হয়। সে বৈশিষ্ট্যটি এ-ধরনের কবিতায় পুরোপুরিই থাকে। অর্থাৎ ছবির আকস্মিক সমগ্রতার ধাক্কা সামলাবার পরই আমরা ছবির মর্মবাণীটি উপলব্ধি করবার জন্য অনেকক্ষণ ধ'রে ছবির সঙ্গে আমাদের মনকে মিলিয়ে নিতে থাকি। তখন ছবিকে আমরা স্থানের 'সহভাবে'র চেয়ে কালের 'অনুক্রমে'ই দেখতে থাকি। তাই গীতধর্মী কবিতাও যখন ধীরে ধীরে একটি ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে থাকে, তখন শিল্প হিসাবে সে-কবিতায় ছবির এই দ্বিতীয় গুণবৈশিষ্ট্যটি এসে যায়। তবু যেহেতু এ ধরনের কবিতায় ছবির প্রাথমিক গুণটই ধরা পড়ে না, কাজেই এদের খাঁটি চিত্রধর্মী বলা চলে না।

এদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিত্রবহুল কবিতা

১২। বিদায়-অভিশাপ : র-র ৪।১৩৩

১৩। মানস-সুন্দরী : সোনার তরী : র-র ৬।৬৭

শিল্প হিসাবে গীতধর্মী। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটি বিশদ করি : ধরা যাক তাঁর 'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি।

চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ,—[১৪]

এই কথাটিতে আমরা কী লক্ষ্য করি? প্রথমেই বলতে হয়, এখানে ছবি দেখবার আগেই কথাটির আশ্চর্য অনুপ্রাস, আমাদের কানকে অনেকক্ষণ ধ'রে মুগ্ধ ক'রে রাখে, —'কানে আর মনে কেবলি কথা-চালাচালি হতে থাকে'।

এর কারণই হচ্ছে এই যে কথাটির মাঝখানে এমন তিনটি জায়গায় আমাদের জিরিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছ, যেখানে দাঁড়ানো মানেই পিছন ফিরে কান পেতে শোনা। একবার 'চপলা'র কথাটির রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগে, আবার 'চমকে' কথাটিতে মোচড় দেবার পরে, এবং তারপর 'চরণ' কথাটির শেষ মাত্রাটিকে একটুখানি বিলম্বিত করতে গিয়ে,—এই তিনবারই আমাদের সদ্য-উচ্চারিত শব্দগুলিকে ভালো ক'রে কান পেতে শোনবার সুযোগ হল। আর, শুনতেই যখন লেগে গেলুম তখন আর দেখব কী ক'রে? আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে : পঙ্‌ক্তিটির সব শেষের দু'টি শব্দ হচ্ছে 'চরণ' আর 'বিচরণ', কাজেই কথাটির পূর্ণ বিরামের সময়টাতে আমাদের কানে এই দু'টি 'রণ'-ধ্বনির বিলম্বিত রেশ তারঝংকারের মতো বাজছে। ফলে মাঝখানে একবার 'চকিত চমকে' কথাটিতে যা-ও বা একটু ছবির আভাস এসেছিল, তা-ও এই উচ্চারিত স্বর-ঝংকারে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

আমি বলছি নে যে চিত্রধর্মী কবিতায় অনুপ্রাসের স্থান নেই। অনুপ্রাস যদি ভাষার দ্রুততাকে সার্থকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে তা' হলে চিত্রধর্মী কবিতা আরো ঢের বেশি উৎরোবারই কথা। কিন্তু উপরের উদ্ধৃতিতে তা' হচ্ছে না। অনুপ্রাস কী ক'রে খাঁটি চিত্রধর্মী কাব্যাংশকে সার্থকভাবে সাহায্য করে, 'মানস-সুন্দরী' থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

স্খলিত বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের মতো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়—[১৫]

এখানে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। বলা বাহুল্য, এক 'নয়নেতে'

১৪। আবির্ভাব : ক্ষণিকা : র-র ৭।৩২৫

১৫। মানস-সুন্দরী : সোনার তরী : র-র ৩।৭২

কথাটি ছাড়া এ তিন পঙ্‌ক্তির আর সবখানেই ভাষার আশ্চর্য দ্রুততা চোখে পড়ে। অবশ্য এই জন্যই এখানে এই 'নয়নেতে' শব্দটির দ্যুতিও একটুখানি নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু তা হলেও এর ঠিক পরের পঙ্‌ক্তিতেই অনুপ্রাসের চমকে হঠাৎ এমন একটি উচ্চারিত দ্রুততা এসেছে যে গতির ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। বস্তুতঃ এই পঙ্‌ক্তি তিনটিকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তিতে অনেকগুলি দ্রুত ব্যঞ্জনবর্ণ-ধ্বনি বেজে উঠেছে, দ্রুততার জন্য এরা সংগীতের চেয়ে সংঘাতেরই সৃষ্টি করেছে বেশি ক'রে। আর ঠিক এর পরেই একেবারে ঝলক দিয়ে উঠেছে তৃতীয় পঙ্‌ক্তির গতি-বিদ্যুৎ ; ফলে সমস্ত ছবিটি খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো চোখের সামনে হঠাৎ জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু শুধু অনুপ্রাসের চমক দিয়ে নয়, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণের দ্রুত সংঘাত দিয়ে নয়, দৃষ্টিকে সূক্ষ্ম অণুনৃত্যের পথে চালিয়ে, আর সেই সঙ্গে ইঙ্গিতের পাখায় দ্রুত কম্পন সঞ্চার ক'রে কবি এক আশ্চর্য কৌশলে চিত্রধর্মী কবিতার শিল্পদেহ থেকে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ করাতে পারেন। এ-সব কবিতায় গতির দ্রুততা এত বেশি যে মনে হয় পঙ্‌ক্তিটি চোখে পড়তেই যেন ছবিটি দেখতে পাচ্ছি, যেন একে ভালো ক'রে পড়বারও সময় পাই নি। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অজস্র পঙ্‌ক্তি তাঁর শত শত কবিতা ও গানে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করছি। প্রথমেই একটি পঙ্‌ক্তি চোখে ভাসছে—

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,—[১৬]

মনে হচ্ছে পঙ্‌ক্তিটিতে কে যেন একসঙ্গে অনেকগুলি বিদ্যুৎ ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গেই ছবিটি একেবারে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। তা' ছাড়া 'ঘাসের ঝিলিমিলি', 'আলোর ঝিকিমিকি', 'মেঘের মুখে সোনা'—এ ধরনের ছোটো-ছোটো পঙ্‌ক্তিও কম বিস্ময়কর নয়। কিন্তু এবার তাঁর আরো দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে যাওয়া যাক :

নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,—[১৭]

কিংবা অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল[১৮]

১৬। প্রভাতী : পূরবী : র-র ১৪।১১৯

১৭। বলাকা ৩৫ : র-র ১২।৫৬

১৮। বলাকা ৩৫ : র-র ১২।৫৭

কিংবা দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল—[১৯]

কিংবা ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি—[২০]

কিংবা সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের' পরে—[২১]

এ রকম বহু আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, যাদের হঠাৎ-হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে মন খুশি হয়ে ওঠে। এ ছাড়া 'রামধনু-আঁকা পাখা,' 'মঞ্জরিদীপ-শিখা'—এ ধরনের অসংখ্য ছোটো-ছোটো কথার চমক তো তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি গুলিতে কেবলি ঝিলিক দিচ্ছে। কবি যথার্থই বলেছেন :

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।—[২২]

এতক্ষণ আমরা তাঁর চিত্রধর্মী কবিতার শুধু দেহদ্যুতি বা দেহদীপ্তির কথাই বললাম। এবার, তিনি তাঁর কবিতার শিল্পদেহে কী ক'রে তার প্রাণদ্যুতিটি চমকিয়ে তুলেছেন সেই আলোচনা করব।

গীতধর্মী কবিতার প্রাণসংগীতকে উচ্চারিত করতে হলে যেমন তার শিল্পদেহের শব্দ-ঝংকারকে যতদূর সম্ভব ক্ষীণ ক'রে আনতে হয়, চিত্রধর্মী কবিতায়ও তেমনি তার প্রাণদ্যুতিকে বিচ্ছুরিত করতে হলে তার শিল্পদেহের শব্দগুলির ধারাল উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিতে হয়; অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মূল রূপাশ্রিত ভাবের মধ্যে দ্রুত ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিতে হয়। এই অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিতের ক্রিয়াটি বড়ো বিস্ময়কর। কবিতার দেহদীপ্তিকে কমিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার ভাষার গতিও ক'মে আসে, ঠিক এই মুহূর্তে কবিতাকে গীতপ্রধান হবার ঝোঁক থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে চিত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে এই অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই ইঙ্গিত তখন গতিমন্থর কবিতার প্রতিটি ছোটো-ছোটো অংশে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ এক একটি শুদ্ধ ছবি তুলে ধরে। এই ছবিগুলি হঠাৎ আচমকা

১৯। বলাকা ৮ : র-র ১২।২১

২০। বলাকা ৩২ : র-র ১২।৫৪

২১। বলাকা ১০ : র-র ১২।২৭

২২। বলাকা ১০ : র-র ১২।২৭

ভেসে ওঠে বলেই পাঠককে অপ্রস্তুত অবস্থায় বিস্মিত করে; ফলে পাঠকের মনের অভিভূত ভাবটি কেটে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগে, ততক্ষণ কবিতা মন্থরগতিতে আরো একটুখানি এগিয়ে যায়; এদিকে সেই অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিত ততক্ষণে আবার পাঠকের জন্য আরো একটি নূতন ছবি তৈরী ক'রে রাখে। এ-ধরনের চিত্রধর্মী কবিতায় আপাতদৃষ্টিতে গতির মন্থরতা দেখা গেলেও এর মধ্যে সব সময় এই অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিতের অফুরন্ত বিদ্যুৎ-চালাচালি চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনায় বহুস্থানেই কবিতার এই প্রাণদ্যুতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'মানস-সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতির মতো সুদীর্ঘ সংগীত-প্রবাহধর্মী কবিতায়ও স্থানে-স্থানে তা' লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখানে তাঁর নানা রকমের রচনা থেকে এ ধরনের চিত্রধর্মী পঙ্‌ক্তির সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

তারাগুলি ধীরে ধীরে উঠে না কি হর্ম্যশিরে
নিঃশব্দ পাখায়।—[২৩]

হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।—[২৪]

সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা ক'রে।—[২৫]

মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্ম-সম···
নামিয়া পড়িল ধীরে।—[২৬]

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।—[২৭]

মেঘখণ্ডগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি।—[২৮]

২৩। অশেষ : কল্পনা : র-র ৭।১৮০

২৪। স্বপ্ন : কল্পনা : র-র ৭।১২৭

২৫। স্বপ্ন : কল্পনা : র-র ৭।১২৮

২৬। স্বপ্ন : কল্পনা : র-র ৭।১২৮

২৭। অশেষ : কল্পনা : র-র ৭।১৭৯

২৮। বসুন্ধরা : সোনার তরী : র-র ৩।১৩৩

তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়।—২৯

দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝর স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম।—৩০

যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে।—৩১

এ রকম অজস্র পঙ্‌ক্তি তাঁর বহু কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করা যায়। তাঁর গদ্যকবিতা-গুলি এ ধরনের ছবির এক বিচিত্র বৃহৎ চিত্রশালা। বস্তুতঃ বাণীবিরল ইঙ্গিতময়তাই এই জাতীয় চিত্রধর্মী কবিতার সবচেয়ে বড়ো কথা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়েকটি কবিতা এ বিষয়ে যে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে তার তুলনা নেই। ছবির ইঙ্গিতগুলি সেখানে বড়োই বিস্ময়কর। তাঁর 'শেষ লেখা' থেকেই দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।—৩২

প্রথম দু'টি ছত্র চোখে পড়তেই বিস্ময়ের এক ধাক্কায় আমরাও এই 'রূপনারানের' কূলে জেগে উঠি। বস্তুতঃ ছত্র-দু'টিতে এক আশ্চর্য আকস্মিকতা ফুটে উঠেছে : একটি উজ্জ্বল নদীর চওড়া বাঁক চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে ওঠে। 'শেষ লেখা'র আরেকটি কবিতায় দেখি :

রৌদ্র তাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
কোথাও সান্ত্বনালেশ নাহি।—৩৩

২৯। স্বর্গ হইতে বিদায় : চিত্রা : র-র ৪।৮৮
৩০। মানস-সুন্দরী : সোনার তরী : র-র ৩।৬৮
৩১। যেতে নাহি দিব : সোনার তরী : র-র ৩।৪৯
৩২। শেষ লেখা ১১ : র-র ২৬।৪৮
৩৩। শেষ লেখা ৪ : র-র ২৬।৪১

এখানে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে
এমন একটি চৌকির ছবি, 'যা চিরকালের জন্য শূন্য হয়ে গেল'।

৩

এবার, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, অন্য শিল্পবৈশিষ্ট্যের তুলনায় বিরল হলেও, স্থানে স্থানে যে স্থাপত্য-ভাস্কর্যধর্মী কাব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে সে-বিষয়ে আলোচনা করছি। দৃষ্টি-চেতনা ও স্পর্শ-চেতনার জগৎ তাঁর কাব্যে কী আশ্চর্যভাবে ধরা দিয়েছে অন্যত্র তার বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছি।* কঠিনের উপর আলোর প্রতিফলন ও কঠিনের স্পর্শ,—এই দু'টির অভিজ্ঞতাই আমাদের ইন্দ্রিয়পথে ত্রিমাত্রিক বস্তুর (Three-dimensional object) জ্ঞান এনে দেয়। স্থাপত্য-ভাস্কর্যশিল্প ত্রিমাত্রিক এদের বোক দৃষ্টি ও স্পর্শ-চেতনার যৌগিক মিশ্রণের উপর নির্ভর করে।

দৃষ্টি-চেতনা নির্ভর দ্বিমাত্রিক (Two-dimensional) চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য কী ক'রে কাব্যের বাণীদেহে রসরূপ লাভ করে, আগের পরিচ্ছেদে সে-বিষয়ে বলেছি এখন, স্পর্শ-চেতনা কী উপায়ে বাণীশিল্পের জগতে রসরূপ লাভ করে সেইটি জানতে পারলে, কী কী গুণবৈশিষ্ট্যে কাব্য ভাস্কর্যধর্মী হয়, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে

'স্পর্শ'কে সাধারণ-'সূক্ষ্ম' আর 'স্থূল'—এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সূক্ষ্ম স্পর্শে আছে একটি বিলীয়মান বাষ্পলঘুতা। কোনো একটি নিরালা সুরের সঙ্গে এই স্পর্শলঘুতার একটি আশ্চর্য মিল আছে: Tennyson-এর—

> There is sweet music here that softer falls
> Than petals from blown roses on the grass,—[৩৪]

এই পঙ্‌ক্তি দু'টি আমার বক্তব্যকে সব দিক থেকেই পরিষ্কার করবে। বস্তুতঃ আমরা যখন বলি, গানটি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে, তখন নিতান্তই কবিত্ব করি নে ইংরেজিতে 'touch' কথাটা এই অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমি যা' বলতে যাচ্ছি তা' এই যে, সূক্ষ্ম স্পর্শ বলতে যা' বোঝায় গীতধর্মী কাব্যের সুরের রেশটুকুর মধ্যেই

---

* রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ: পূর্বে উল্লিখিত।

৩৪। The Lotos-Eaters : Choric Song : Tennyson :
Golden Treasury of Modern Lyrics :
BK. 1

তার অনেকখানি আভাস পেতে পারি। বস্তুত এই পথ দিয়েই স্পর্শজগৎ সূক্ষ্মভাবে কাব্যলোকে প্রবেশ করে।

কিন্তু কেবল এইটুকু হলেই চলে না, কেন-না এই সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি কবিতার সুরের রেশটুকুর সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে, তাকে আলাদা ক'রে জানবার উপায় নেই। কাজেই তাকে পৃথক্ ভাবে উচ্চারিত করতে হলে একদিকে যেমন কবিতার সুরকে সম্পূর্ণ বিলীয়মানতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অন্যদিকে তেমনি কবিতাকে একটি বিশেষ ছবি বা আকারের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে, যা'তে কবিতা একটি নিরূপিত সীমার মধ্যে এই স্পর্শানুভূতিকে জমাট বাঁধাতে পারে। কবি অতি আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে এই স্পর্শানুভূতির সুরবিলীন বাষ্পলঘুতাকে তরলতায়, কোমলতায় এমন-কি নিরেট কাঠিন্যে রূপান্তরিত করেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র 'বিজয়িনী' কবিতা থেকে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

প্রথমেই স্পর্শের বাষ্পলঘুতাকে কবোষ্ণ ক'রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তোলা হয়েছে :

শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।—৩৫

জলের বুকে হাওয়া লুটিয়ে পড়ছে ; অদৃশ্যের ছোঁয়া লেগেছে সৃষ্টির প্রথম তরলতায়। কিন্তু তরলতারও কি কিছুই দেবার নেই ?

পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি।—৩৬

এখানে আমরা স্পর্শ-চেতনার দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছেছি। কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়, এই সরোবরের ঘাটে—'আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী'। সেখানে :

সযত্ন পালিত শুভ্র রাজহংসটিরে
করিছে সোহাগ নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি…
কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ বিভোল।—৩৬

এখানে স্পর্শচেতনার তৃতীয় স্তরে এসেছি। 'তরলতা'র পরে 'কোমলতা'। এই

৩৫। বিজয়িনী : চিত্রা : র-র ৪।৯৭

'কোমলতা' এবং তার সঙ্গে 'শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ-টুকুকেও ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছুব স্পর্শচেতনার চতুর্থ স্তরে, যেখানে ঃ

বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।—৩৬

সেই পাষাণের বুকে ঃ

নূপুর রয়েছে পড়ি··· .
কনক-দর্পণখানি চাহে শূন্য-পানে।—৩৬

বলা বাহুল্য, এখানে রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতার বর্ণনার ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই স্তরগুলির ক্রমবিন্যাস করি নি। কাব্যে কী ক'রে স্পর্শানুভূতিকে বাষ্পলঘুতা থেকে ক্রমশঃ বস্তুকাঠিন্যের দিকে জমাট ক'রে আনা যায়, তার অনুক্রমটির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে উদ্ধৃতিগুলির ক্রমবিন্যাস করেছি।

এখন এই প্রত্যেকটি স্পর্শ-চেতনার মধ্যেও আবার নানারকম বৈচিত্র্য আনা যায়। আগেই বলেছি, এই স্পর্শ-চেতনা হাওয়াতে, তরলে, কোমলে ও কঠিনে রবীন্দ্রকাব্যে কতভাবে রসরূপ লাভ করেছে অন্যত্র তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তবে এ-সব বৈচিত্র্য ফোটাতে গিয়ে কবিরা প্রধানত দু'টি কৌশল অবলম্বন করেন : একটিতে ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্যটিতে ভাবকে। এ-দু'টির একটিতে পাই কাব্যের শিল্পদেহের স্পর্শ, অন্যটিতে পাই তার ভাবসত্তার স্পর্শ। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, কবিতায় এদের যে-কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হলেও সব সময় তাদের অন্তর্লীন একাত্মতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি, স্পর্শজগৎ সুরকে আশ্রয় ক'রেই কবিতার শিল্পজগতে সর্বপ্রথম সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে, এবং তার পরে একটি ছবি বা আকারের নিরূপিত সীমার মধ্যে জমাট বেঁধে ওঠে। কাজেই স্পর্শ-প্রধান কবিতায় শিল্পরূপের গীতিধর্ম ও চিত্রধর্মের একটি আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ছবির জোর ক'মে গিয়ে সুরের জোর বেড়ে গেলে কবিতা গীতধর্মী হয়ে যাবে ; আর সুরের জোর ক'মে গিয়ে ছবির জোর বেড়ে গেলে কবিতা চিত্রধর্মী হয়ে যাবে। দু'টি একেবারে তুল্যমূল্য হলে তবেই স্থাপত্যধর্মী অথবা ভাস্কর্যধর্মী কবিতা সার্থক হ'তে পারে। মহাকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য অথবা নাটকে কাব্যের শিল্পরূপের এই স্থাপত্য বা ভাস্কর্য-ধর্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। এ-ধরনের কাব্যে শব্দপ্রতীকগুলি পর্যন্ত

৩৬। বিজয়িনী : চিত্রা : র-র ৪।৯৬

নিটোল হয়ে ওঠে। কাব্যের শিল্পদেহ থেকে এক ধীরোদাত্ত বাণীসংগীত উত্থিত হয়। মহাকবির ধ্রুপদী পর্যায়ের 'মেঘমন্দ্র শ্লোক'গুলির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি এদিক থেকে তাঁর একটি অতুলনীয়, অমূল্য সৃষ্টি। একটি 'মহাকাব্যিক' উপমা দিয়ে কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে, এবং কবিতাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মহাকবির গাঢ়কণ্ঠের ধীরোদাত্ত স্বর শোনা যাচ্ছে :

গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার অবতিয়া মুখে—[৩৭]
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে—[৩৭]
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত-উচ্ছ্বাস—[৩৮]

এ-ধরনের বহু পঙ্‌ক্তিতেই এর আভাস পাওয়া যায়। শুধু 'ভাষা ও ছন্দ' কেন, অনেক সময় তাঁর উৎকৃষ্ট লিরিকগুলির মধ্যেও হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটি বিশেষ পঙ্‌ক্তিতে সংহত বাণীব গাঢ়বদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। উর্বশীর মতো কবিতাতেও

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—[৩৯]

কিংবা কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা—[৩৯]

এ-রকম আশ্চর্য এক-একটি খোদাই-করা পঙ্‌ক্তির সাক্ষাৎ পাই।

গদ্যছন্দে রচিত তাঁর বিখ্যাত 'পৃথিবী' কবিতাটিই বা মন্দ কী ?—

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,—[৪০]

এখানে প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তির ঠাসা কাঠিন্য গিরিগাত্রে খোদাই-করা উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-কলারই নিদর্শন।

কিন্তু ভুললে চলবে না, শুধু শব্দের ধ্বনিকাঠিন্য কিংবা বাণীর স্থপতিকর্মই রবীন্দ্রনাথের এ-ধরনের সৃষ্টির একমাত্র দিক নয়। এবার এই শেষ কথাটি বলেই আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করব। যদি কেউ রবীন্দ্রকাব্যে বাণীর গাঢ়বদ্ধতার সঙ্গে ভাববস্তুর নিরেট কাঠিন্য অনুভব করতে চান, তা'হলে চিন্তামাত্র না-ক'রে এই

৩৭। ভাষা ও ছন্দ : কাহিনী : র-র ৫।৯৪

৩৮। ভাষা ও ছন্দ : কাহিনী : র-র ৫।৯৬

৩৯। উর্বশী : চিত্রা : র-র ৪।৮২

৪০। পত্রপুট ৩ : র-র ২০।১৩

মুহূর্তেই তাঁর নানা কবিতার যে-পঙ্‌ক্তিগুলি আপনা থেকে মনে আসছে, তাদেরই সামান্য কয়েকটি পাঠককে উপহার দিচ্ছি!

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি।[৪১]

চায় এরা···ধরনীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে।[৪২]

তব কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া।[৪৩]

তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।[৪৪]

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।[৪৫]

পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা।[৪৫]

ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি।[৪৬]
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি।[৪৬]

থাক, আর দরকার নেই। হিমালয়ের একটি প্রাচীন পাথরপুরীর কথা মনে পড়ছে:

তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী-মাঝে, বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ।[৪৭]

প্রবন্ধ শেষ করবার মুহূর্তে নিটোল ভাস্কর্যকর্মের আরেকটি অপূর্ব সৃষ্টি চোখে পড়ছে:

তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।[৪৮]

এ-মূর্তি অমর ভারতশিল্প।

৪১। বলাকা ১৬: র-র ১২।৩৫

৪২। বলাকা ১৬: র-র ১২।৩৫-৩৬

৪৩। গান: মুক্তধারা: র-র ১৪।১৯২

৪৪। গান: মুক্তধারা: র-র ১৪।১৯১

৪৫। বলাকা ৮: র-র ১২।২২

৪৬। রাজপুতানা: নবজাতক: র-র ২৪।১৭

৪৭। বসুন্ধরা: সোনার তরী: র-র ৩।১৩৪

৪৮। স্বপ্ন: কল্পনা: র-র ৭।১২৭

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ও নাট্যশিল্প চেতনা : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

কাব্য ও গল্প উপন্যাসের মতই বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন এবং অভিনব আঙ্গিক ও বিচিত্র রসসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ মৌলিকতা ও উৎকর্ষের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সংস্পর্শে না আসিলে কোন নাট্যকার নাটক লেখার প্রেরণা বোধ করেন না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যদি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত না হইত এবং যদি তিনি অভিনয়ের রসে রসিক না হইতেন তাহা হইলে তিনি নাটক লিখিতে এতখানি উৎসাহী হইয়া উঠিতেন কিনা সন্দেহ। নাট্যগোষ্ঠীগঠন, মঞ্চপরিকল্পনা ও পরিচালনা, নাট্যপ্রযোজনা, অভিনয় শিক্ষাদান, অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি নানা দিক দিয়া তিনি নাট্যমঞ্চ ও প্রয়োগশিল্পের সহিত যুক্ত ছিলেন। সেজন্য মঞ্চ আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি নানা ভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং নাটক রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে নূতন নূতন রীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকে রূপ ও রীতির যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা বিচার করিতে হইলে সমসাময়িক যে মঞ্চশিল্পরূপ ও অভিনয়দ্বারা তাঁর নাট্যপ্রতিভা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল সেগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যমে স্থাপিত সখের নাট্যশালা-গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় একটি নাট্যসমিতি স্থাপিত হইল। সেই নাট্যসমিতির নাম হইল Committee of five। পাঁচজন সভ্যের নাম—কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। অভিনয় শিক্ষক হইলেন কৃষ্ণবিহারী সেন। প্রথমেই মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইল। এই অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হইল বলিয়া তাহারা উৎসাহিত হইয়া মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত তৃতীয় নাটক হইল প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ রচিত

'নবনাটক'। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং এই বিবরণে আমরা জানিতে পারি যে, নবনাটক যদিও প্রাচ্য আদর্শে রচিত, কিন্তু পাশ্চাত্য রীতিতে পরিকল্পিত বাস্তবধর্মী রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায়—

'তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সদৃশ ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।'[১]

এই অভিনয় সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ লিখিয়াছিলেন, 'নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল।' এই প্রকৃত রীতি যে বাস্তবনিষ্ঠ পাশ্চাত্য মঞ্চরীতি সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।[২]

রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হইবার পূর্বে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা পাশ্চাত্য মঞ্চরীতিই যে অবলম্বন করিয়াছিল তাহা উপরের দুইটি উদ্ধৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায়। অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মতই রবীন্দ্রনাথ আগে অভিনেতা এবং পরে নাট্যকার। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'এমন কর্ম আর করব না', প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যের মদনের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সব অভিনয় বাড়ির আত্মীয় স্বজনের সম্মুখেই দেখান হইয়াছিল। সাধারণ দর্শকের সমক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বাল্মীকির ভূমিকাতেই তিনি সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন। বিদ্বজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শুধু নটরূপে নহে, নাট্যকাররূপেও সাধারণের সম্মুখে ইহাই হইল তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। এই নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যসজ্জাও খুবই বাস্তবধর্মি হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে এই দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'অভিনয়—পরিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রাত হইয়াছিলেন। ঝড়বৃষ্টির

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি দ্রষ্টব্য—১৮৮—৮৯

২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা : ১০৮

একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্য সত্যই ঝরঝর করিয়া যখন জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টিধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল।"

'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় বার বার হইত। পরবর্তী এক অভিনয়ের বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। সেখানেও দৃশ্যসজ্জার বাস্তবধর্মিতার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

'হ. চ. হ. এলেন সেবারে, তাঁর উপরে ভার পড়ল ষ্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হ'ল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিন আঁকলেন কচুবনে বন্য বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে বসিয়ে দিলেন।'

'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় অনেক পরবর্তীকালেও যখন হয়েছে তখনও এই মঞ্চ বাস্তবতার দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পী তখন মঞ্চ সজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের হাতে মঞ্চ সজ্জার আরো নিখুঁত ও পরিপাটি বাস্তবতাই দেখা গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের মুখেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে—

'পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি। দুটো দম্বেল ছিল, দম্বেল জানো তো? কুস্তিগিররা কুস্তি করে, লোহার ডাণ্ডার দুপাশে বড়ো বড়ো লোহার বল, নিতুদা দোতলায় ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এ ধার থেকে ও-ধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহা খুশি, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।'

যিনি পরবর্তী কালে মঞ্চসজ্জার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন তিনিই কিরূপ মঞ্চ বাস্তবতার মধ্যে অভিনয় করিয়া লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার মত। তখনকার সৌখীন রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্যের অনুকরণে দৃশ্যসজ্জার বাস্তবতার দিকে যে প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়াছিল তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালাতেও বাস্তবের অনুকরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

ঠাকুরবাড়ির ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্যোগে অলীকবাবুর অভিনয়ের যে বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ দিয়াছেন সেখানেও দেখা যায় দৃশ্যসজ্জা সাহেব চিত্রকরকে দিয়া পাশ্চাত্য রীতিতেই করা হইয়াছিল। ড্রামাটিক ক্লাবের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়েও

দৃশ্যসজ্জার মধ্যে পাশ্চাত্য রীতির বাস্তবধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। বিসর্জনের পরে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত কলিকাতায় শেষ অভিনয়। ইহার পর তাঁহার অভিনয় ও নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থানান্তরিত হল শান্তিনিকেতনে। বহুদিন পরে কলিকাতায় তাহার নাটকের অভিনয়ে তিনি পুনরায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন তাঁহার নাট্যধারার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং মঞ্চশিল্প সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির অনেক মৌলিক নূতনত্ব দেখা গিয়াছে। সুতরাং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয়ে তাঁহার কলিকাতাস্থিত নাট্যজীবন ও অভিনেতৃজীবনের যে শুধু সমাপ্তি ঘটিল তাহা নহে, পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও মঞ্চকলার প্রভাবও তাঁহার জীবনে শেষ হইয়া আসিল। শান্তিনিকেতনের নাট্য সাধনা ও নাট্যপ্রয়োগরীতির মধ্যে তাঁহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার চেতনা ইতিমধ্যেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রঙ্গমঞ্চ নামক একটি প্রবন্ধে তিনি মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব বৈপ্লবিক মতবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদিন পাশ্চাত্যপ্রভাবান্বিত যে বাস্তবধর্মী মঞ্চপরিবেশের মধ্যে তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে হঠাৎ তিনি তাঁহারই বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ব্যক্ত করিলেন। মঞ্চের বাস্তবতাকে নিন্দা করিয়া তিনি লিখিলেন—

'দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে, অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁটদিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুস্থানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।'

মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁহার এই সুস্পষ্ট মত পরবর্তী কালে অনেক স্থানেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' নাটকে তিনি বলিলেন 'চিত্রপটে প্রয়োজন নেই,—আমার দরকার চিত্তপটের। সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তপতী নাটকের ভূমিকায় এই মতবাদ তিনি আরো প্রবলভাবে ব্যক্ত করিলেন, 'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।'

রবীন্দ্রনাথের এই মৌলিক মঞ্চশিল্পচেতনা তাঁহার নাট্যপ্রয়োজনার মধ্যে পরবর্তী কালে কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছিল সে বিচার আমরা পরে করিব। তৎপূর্বে সেই মঞ্চশিল্পচেতনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের অন্ধ অনুকরণে স্থূল বাস্তবতার প্রাধান্যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কল্পনা বিলাসী শিল্পীচিত্ত যে পীড়িত হইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে নাট্যশাখার অভিনয়ে কিছুটা কৃত্রিম বাস্তবতা অপরিহার্য। যেখানে উন্মুক্ত আকাশতলে, প্রসারিত প্রাঙ্গনে ও স্বাভাবিক সূর্যালোকে অভিনয় হয় সেখানে মঞ্চ-কলা নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বাস্তবতা দেখাইবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেখানে বদ্ধপ্রেক্ষাগৃহে, সীমাবদ্ধ রঙ্গমঞ্চে ও কৃত্রিম আলোকে অভিনয় করিতে হয় সেখানে মঞ্চের কলাকৌশলের মধ্য দিয়া অভিনেয় জগতের বাস্তব রূপকে ফুটাইয়া তোলার প্রচেষ্টাকে বর্জন করা চলে না। অভিনয়ের মধ্য দিয়া যে জগৎ ও মানবচরিত্র রূপায়িত করিবার চেষ্টা হয় তাহার সহিত রঙ্গমঞ্চের যথার্থ রূপ ও অভিনেতাদের আসল চেহারার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু অভিনয়ের সময় দর্শকদের মনে করাইতে হইবে যে, রঙ্গমঞ্চ কাঠের পাটাতন ও চটের আবরণের সমষ্টি নহে, তাহা উদ্যান অথবা মন্দির ; এবং অভিনেতাদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন তাহারা ক্ষণকালের জন্য বিক্রমদেব অথবা রঘুপতি ছাড়া আর কেহই নহে। দর্শকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কৃত্রিম কলা কৌশল ও সাজসজ্জার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ 'তপতী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।' নাট্যকারের নাটক যতক্ষণ পাঠ্য থাকে ততক্ষণ তিনি অবশ্যই কবির মতই স্বাধীন, কিন্তু যখন তাঁর নাটক অভিনীত হয় তখন তিনি আর পবিপূর্ণ স্বাধীন নহেন। তখন তাঁহার নাট্য-কলাকে মঞ্চকলার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে হয়। তাঁহার সূক্ষ্ম-ভাব মঞ্চে রূপ ধারণ করে এবং তাঁহার অবাধ গতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। কাব্যকার মঞ্চকারের মাঝে রহিয়াছেন নাট্যকার। কাব্যকারের মুক্তিতে নাট্যকারের আরম্ভ কিন্তু মঞ্চকারের বন্ধনে তাঁহার পরিণতি এ সত্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। নাটক যে দৃশ্য কাব্য। এখানে দৃশ্যত্বকে প্রাধান্য দিতেই হইবে। অন্যান্য কাব্যে কল্পনার মধ্যে দেখা, কিন্তু নাটকে দেখার মাধ্যমে কল্পনা।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত, অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক মূঢ়

স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। কিন্তু দৃশ্যপট সত্যই কি 'মূক, মূঢ়, স্থাণু'? দৃশ্যপট তো পরিবেশকে সচল ও সজীব করিয়াই তোলে। দৃশ্যপট নেপথ্যজগৎকে আচ্ছাদিত করিয়া অভিনেতাদের সম্বন্ধে দর্শকদের চিত্তে অবিরাম কৌতূহল জাগাইয়া রাখে এবং উহার রঙ ও রেখা অভিনেতাদের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগকে স্পন্দনশীল ও বাণীময় করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের উল্লেখ বার বার করিয়াছেন তাহার অভিনয়েও তো রঞ্জিত যবনিকার অস্তিত্ব ছিল। কাহারও কাহারও মতে অভিনয়ের ভাব অনুযায়ী যবনিকার রঞ্জন হইত। প্রাচীন ভারতের চার রকম অভিনয়ের মধ্যে আহার্য অভিনয়ে অলঙ্করণই তো প্রধান। নাট্যশাস্ত্রে নেপথ্য বিধানের যে চারটি বিভাগ করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে মঞ্চের কৃত্রিম বাস্তবতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ-বাস্তবতা ও দৃশ্যপট ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রবল মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রাচীন-ভারতীয় অভিনয়রীতির দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত নহে এবং নাট্যমঞ্চের অভিনয়ে সর্বাংশে গ্রহণ করাও সুবিধাজনক।

রবীন্দ্রনাথ যাত্রাভিনয় পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'আমাদের দেশে যাত্রা আমার এজন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাটতো বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। যাত্রা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগিয়াছে নিশ্চয়ই উহার অভিনয়-রীতির জন্য। যাত্রার আর একটা দিক আছে—উহার ভাববস্তু, অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম-বিশ্বাসের দিক। ঐ ভাববস্তুর সহিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যাত্রার অভিনয়-রীতি তাঁহার পরবর্তী সাঙ্কেতিক নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে-আলোচনা আমরা পরে করিব। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই যাত্রারীতি সমর্থনের ফলে বর্তমানকালে যাত্রারীতিতে নাট্যাভিনয় অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে। আঙ্গিক প্রধান রঙ্গমঞ্চের পাশে এই বিরলসজ্জ স্বভাবাশ্রিত অভিনয়ের ধারা প্রগতিবাদী নাট্যসংস্থার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তন হইতেছে, যন্ত্র ও নাগরিক জীবনের সহিত আমরা অনিবার্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির বহু চিত্র আঁকা পটভূমিতে যাত্রার যে প্রাণধারাটি মনের আনন্দে বহিয়া চলে যন্ত্রঘর্ঘরিত, পাষাণপিস্ট স্থানে তাহা বিরস ও নির্জীব হইয়া পড়ে।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করিবার পর পুনরায় আমরা নাটকের অভিনয় ও প্রয়োগরীতি লইয়া আলোচনা করিব। শান্তিনিকেতনে যে অভিনয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল তাহাদের মধ্যে 'শারদোৎসব,' 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', প্রভৃতি নাটকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের কোন কোন অভিনয় হয়তো যাত্রার রীতিতে অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নামক উপাদেয় গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মঞ্চকলার সবদিকেরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,

'শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের রীতিমতো ইতিহাস লিখিলে দেখা যাইবে, ইহার পরিণতি কম বিস্ময়কর নহে। প্রথম আমলে দেখিয়াছি নাটকে কেনা পোশাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোশাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত পোশাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোশাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়ম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশি, এস্রাজ দেখা দিল। এক কথায়, অভিনয়ের সৌন্দর্যকলার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল।' (পৃঃ ৭২) উপরিউক্ত বর্ণনায় পোশাক, পটভূমিকা, আলো, যন্ত্রসংগীত ইত্যাদি উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে মঞ্চপ্রয়োগরীতি সম্বন্ধে যে নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা শান্তিনিকেতনের অভিনয়-রীতিতে খুব বেশী প্রতিফলিত হয় নাই। তবে মঞ্চসজ্জায় আগে যে রুচিহীন স্থূলত্ব ও অন্ধ অনুকরণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সূক্ষ্মভাবাশ্রয়ী রুচিসম্মত ও দেশীয় উপকরণে সমৃদ্ধ হইতেছিল। শান্তি-নিকেতনে মঞ্চসজ্জার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব বোধ হয় দেখা গিয়াছিল 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'এর অভিনয় নানা দিক হইতে স্মরণীয়। প্রথমেই ইহার সাজসজ্জার মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিমতা, আড়ম্বরশূন্যতা ও নিরাভরণ সৌন্দর্য ছিল—যাহা অচীরে বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চের উপর নীরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।' মঞ্চ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত এই 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়েই সার্থক রূপ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় পরিণত বয়সে যখন কলিকাতায় তাঁহার নাটক মঞ্চস্থ করেন তখন তাঁহার এই নিজস্ব মঞ্চপরিকল্পনা অনেকখানি রূপায়িত হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার পরিকল্পনা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হস্তস্পর্শেই বাস্তবরূপ লাভ

করিয়াছিল। তবে কলিকাতার সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ মঞ্চে তাঁহার স্বভাবাশ্রয়ী মঞ্চ-পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হইতে পারে নাই এবং তাহা হওয়া সম্ভবও নহে। বাস্তব উপকরণের সহযোগে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা বর্জন করা সম্ভব হয় নাই। তবে পূর্বে যেখানে স্থূলরুচি পটুয়া ও কারিগরের অসুন্দর বাস্তবানুকৃতি ছিল সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা স্থান পাইল। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের নাট্যাভিনয়গুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব', 'বিসর্জন', 'তপতী' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'ফাল্গুনী'র অভিনয় হইয়াছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে। শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'ফাল্গুনীর ষ্টেজসজ্জা পরযুগে বাংলাদেশের ষ্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লেখকদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইবে। অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়ায় এই মঞ্চসজ্জার যে বিবরণ আছে তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, পটভূমি হইয়াছিল নীল মখমলের বনাত, বাদাম গাছের ডালপালা দিয়ে মঞ্চ সাজান হইয়াছিল এবং উঁচু ডালের সঙ্গে বাঁধা দোলার মতও ছিল। এখানেও দেখা যায়, অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। স্থূল গৃহপ্রাঙ্গণ এই মঞ্চসজ্জার চাতুর্যের ফলেই রমণীয় প্রাকৃতিক ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। 'ডাকঘর' অভিনয়েও মঞ্চসজ্জা বাস্তবের অনুরূপ অথচ বিশেষ শিল্পসম্মত হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

'ডাকঘর অভিনয় হবে, ষ্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলেন। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরের কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। এই পাড়াগেঁয়ে ঘরটি আবার রবীন্দ্রনাথের অন্তিম তুলি স্পর্শে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। শারদোৎসব অভিনয়ের মঞ্চ সজ্জাতেও একবার তিনি মঞ্চের পশ্চাৎ-পটে এমনভাবে বক আঁকিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে মনে হইয়াছিল মঞ্চের উপর দিয়া যেন সত্য সত্যই এক ঝাঁক বক উড়িয়া যাইতেছে।[১] আলফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটারেও শারদোৎসবের অভিনয় হইয়াছিল।

'তপতী' নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগরীতির শেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেল। ইহার পর তিনি প্রধানত নৃত্যাভিনয় রচনা ও প্রযোজনার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি

১। ঘরোয়া, পৃঃ ১২৪ দ্রষ্টব্য

নাট্যপ্রয়োগরীতি সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 'তপতী'র অভিনয়ে মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনাতেও তাঁহার এই মত অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'এবারকার অভিনয়ের নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল, অর্থাৎ দৃশ্যপটের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।'[২] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দৃশ্যপট পরিবর্তন না করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি দৃশ্যপট পরিবর্তন না করিয়া এই নাটকের সার্থক রসোদ্দীপক অভিনয় করা সম্ভব? 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যপট পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ ঐ সব নাটকের ঘটনা একই স্থানে ঘটিতেছে। কিন্তু 'তপতী' পূর্বে লেখা 'রাজা ও রাণী' সংস্কার করিয়া রচনা করা হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী'-র মধ্যে ঘটনা কখনও জলন্ধরে, আবার কখনও বা কাশ্মীরে ঘটিয়াছে, 'তপতী'তেও সেভাবে ঘটনা ঘটিয়াছে। দৃশ্যসজ্জা পরিবর্তন না করিলে জলন্ধর ও কাশ্মীরের পার্থক্য কিভাবে দর্শকদিগকে বুঝান হইবে? জলন্ধর ও কাশ্মীরের পরিবেশ আলাদা, লোকও আলাদা। দৃশ্যপটের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ঘটনার স্থান অনুযায়ী পরিবেশ-রূপ ফুটাইয়া না তুলিলে দর্শকগণ নাটকীয় ঘটনার সহিত কিভাবে একাত্মতা স্থাপন করিবে? 'তপতী'র ঘটনা কখনও ভৈরব মন্দির প্রাঙ্গণে, কখনও কাশ্মীরে, আবার কখনও মার্তণ্ডমন্দিরে ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পাঠককে বুঝাইবার জন্য দৃশ্যের নাম লিখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দর্শককে বুঝাইবার জন্য যদি দৃশ্যের রূপ না ফুটাইয়া তোলেন তবে দর্শক সমাজ তাঁহার কাছে অভিমান জানাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটকেরই মঞ্চে প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া যান নাই বলিয়া তাঁহার নাটক মঞ্চস্থ করিবার সময় যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেভাবে মঞ্চসজ্জা করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাটকের প্রয়োগরূপ ও অভিনয়-রীতি সম্বন্ধে কোন ঐক্যবদ্ধ ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চশিল্পচেতনার দুই রূপের মত অভিনয় রীতিরও দুইটি পৃথক পৃথক আদর্শ তাঁহার প্রথম ও শেষজীবনে লক্ষ্য করা যায়। যৌবনে জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে, সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে অথবা ভারতসঙ্গীত সমাজে যে-সব অভিনয় তিনি করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ভাবাবেগের প্রবলতা, মুখের রেখা সঞ্চালন ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গীর তীব্র ও জোরালো রূপই বেশী প্রকটিত হইত। খগেন্দ্র-

২। রবীন্দ্রজীবনী (৩য়)—পৃঃ ২৬৫

নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রকথা'য় লিখিয়াছেন।'

'অভিনয় শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমরা তৎকালে যেমন শুনিয়াছিলাম এখানে কিছু দিলে ভবিষ্যতে কলারসিকদের কিছু উপকারে আসিতে পারে। তাঁহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভার একটিং ভাল তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সংকোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সামাজিক জীবন-যাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার একটিং এর দিকে।...মৃদু অভিনয়ছলা ও মিনমিনে গলা, অঙ্গচালনায় বাধ বাধ ভাব, দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে রঙ্গমঞ্চস্থিত কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়' অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত ধারণা তাঁহার যৌবনের অভিনয়ে, বিশেষত 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' নাটকের বিক্রমদেব ও রঘুপতির ভূমিকায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মঞ্চরীতির মত তখনকার অভিনয় রীতিও বিদেশী প্রভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। খগেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে অনুষ্ঠিত 'রাজা ও রাণীর অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এ অভিনয়ের প্রশংসায় কলকাতার শিক্ষিত সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, বিদেশীয় নাটকের ভাবের ও অনুভূতির তীব্রতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হরণ করিল। 'বিসর্জনে'র রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় অনেকের মতেই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। রঘুপতির ভূমিকায় যে তীব্র উত্তেজনা, মুহুর্মুহু যে বিদ্যুৎদাহ ও হৃদয়বিদারী বজ্রের গর্জন ও হাহাকার রহিয়াছে তাহা রবীন্দ্র নাটকের অপর কোন চরিত্রে দেখা যায় না। আমরা কল্পনা করিতে পারি এই ভূমিকার অভিনয়ে কণ্ঠ ও অঙ্গের কি অতিশয়িত উত্তেজনা প্রকাশ করিতে হইত এবং কিরূপ দুর্দম ভাবাবেগে তাঁহাকে আলোড়িত হইতে হইত। মনে রাখিতে হইবে তখন সাধারণ নাট্যশালায় গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের যুগ চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ নাট্যশালার অভিনয় সংস্পর্শে না আসিলেও এই সব অভিনেতার অভিনয় রীতির সদৃশ অভিনয় রীতি গ্রহণ করিবেন তাহা স্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইবে তিনি অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে একবার অভিনয়ও করিয়াছিলেন। ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অভিনয়ের মধ্যে যে একটু প্রবলতা ও উচ্চতা আনা দরকার তাহা তিনি তখন বিশ্বাস করিতেন। খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'কবি স্বাভাবিক হাবভাবের পক্ষপাতী হলেও বিশেষ ভাব ব্যঞ্জনার জন্য স্বরের ও বলিবার ধরনের এবং উচ্চারণের কতকটা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন, অন্যান্য নাটকের প্রাণস্বরূপ কথোপ-

কথনের সুস্পষ্ট ছাপ দর্শকের মনে অঙ্কিত করা যায় না।' ভারত সঙ্গীত সমাজে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিনয় শিক্ষা দিতেন তখন তিনি উচ্চারণশুদ্ধি ও খুঁটিনাটি অঙ্গ চালনার দিকে সূক্ষ্ম নজর রাখিতেন।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ চেতনার দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখিয়াছি তিনি তাঁহারই পূর্ববর্তী মঞ্চচেতনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তেমনি তাঁহার অভিনেতৃজীবনেরও দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের অভিনয় রীতিকে তিনি যেন সজোরে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। 'পথের সঞ্চয়ে'র অন্তরবাহির নামক প্রবন্ধে তিনি বলিলেন, 'রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায় মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়'।

উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক অভিনয়ে একটু আবেগের প্রাবল্য ও আতিশয্য দেখা গিয়াছিল তাহা সত্য। রবীন্দ্রনাথ হেনরী আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয়ের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আতিশয্য নিন্দনীয় হইলেও অভিনয়ে যে একটু বাড়াইয়া বলা দরকার তাহাও সত্য। আর্টের ক্ষেত্রে যে একটু বাড়াইয়া বলা প্রয়োজন, এ কথা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের কথা তো শুধু পার্শ্ববর্তী অভিনেতার জন্য নহে, বহুদূরে উপবিষ্ট শ্রোতার জন্যও বটে। সেজন্য কণ্ঠস্বরকে একটু উচ্চ করিয়া বলা দরকার। যাত্রায় শ্রোতাগণ আরো দূরে ছড়াইয়া বসে, সেজন্য সেখানে কণ্ঠস্বরের আরও উচ্চতা আবশ্যক। নাটক অনুসারেও কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা এবং আবেগের প্রবলতা ও সংযম ঘটিয়া থাকে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে জীবন যেরূপ উচ্চ ও বলিষ্ঠ সুরে বাঁধা, সামাজিক নাটকে সেরূপ নয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অভিনয়ে যে সংযত ও শান্তভাব দেখা গিয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার পরিবর্তিত অভিনয়শিল্পবোধ ও আবেগবিরহিত তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকের জন্য নহে, রবীন্দ্রনাথের বয়সও তাঁহার একটি কারণ, যৌবনের অভিনয়ে অপরিমিত দেহশক্তি ও অবারিত চিত্তবেগের প্রকাশ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, বার্ধক্যের অভিনয়েও তেমনি ধীর সংযম ও অবিচলিত শান্তভাবের প্রকাশ হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের অভিনয়রীতির আলোচনা করিতে

যাইয়া বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যেমন সাহিত্যের শ্রেণীবিশেষে ফেলা যায় না, তাঁহার অভিনয়কলা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে তাহাতে যেন লীরিক রীতিরই প্রাধান্য ছিল; সমস্ত ভূমিকাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত। কিংবা অন্ধ বাউল, সন্ন্যাসী, আচার্য প্রভৃতি ভূমিকা হয়তো কবির নিজস্ব অভিনয় প্রতিভার অনুরূপ করিয়া সৃষ্ট বলিয়া এমন মনে হইত'।

গিরিশচন্দ্র যেমন নিজের অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের বহু চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বোধহয় তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কয়েকটি চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য এই চরিত্রগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। একদিকে আছে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা, অন্ধ বাউল প্রভৃতি, যেগুলির মধ্যে তাঁহার চঞ্চল, পরিহাসপ্রিয়, সঙ্গীতরসিক রূপটি দেখিতে পাই। অন্যদিকে পাই আচার্য, ভিক্ষু উপালী প্রভৃতি, যেগুলিতে তাঁহার শান্ত, অচঞ্চল, প্রজ্ঞাবান রূপেরই আভাস পাই। একদিকে যৌবনের চঞ্চলতা, অন্যদিকে বার্ধক্যের সংযমশাসিত শান্তি; একদিকে আনন্দের বাঁধভাঙ্গা গতি, অন্যদিকে জ্ঞানের অবিচল স্থিতি—এই দুইটি রূপই রবীন্দ্রনাথের অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে দেখা যায়।

মঞ্চশিল্প ও অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত ও প্রয়োগরূপ আলোচনা করিবার পর এবার আমরা তাঁহার নাট্যশিল্পের বিবর্তনধারা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। রাজা ও রাণী নাটক রচনা করিবার পূর্বে তিনি যে গীতিনাট্য ও কাব্য-নাট্যগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলি যে তৎকালীন মঞ্চসজ্জাপূর্ণ অভিনয়রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট। প্রত্যেকটি দৃশ্য কোন স্থানে স্থাপিত তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি স্থানে স্থানে দৃশ্যের মধ্যে কলাকৌশলের মধ্য দিয়া পরিবেশ সৃষ্টি করিবারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের কোন কোন দৃশ্যে অপরাহ্ন, রাত্রি, প্রভাত ইত্যাদি দৃশ্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি দৃশ্যে ঝড়বৃষ্টির পরিবেশ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য হইলেও ইহাতে ঘর, কানন ইত্যাদি দৃশ্যরূপের নির্দেশ রহিয়াছে। সুতরাং এই যুগের নাটকগুলিতে কোথাও কাব্য এবং কোথাও সঙ্গীত প্রাধান্য পাইলেও সেগুলির অভিনয়ের জন্য যে

বাস্তবধর্মী রঙ্গমঞ্চই পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট। নাটকগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে ঘটনার বিচিত্র জটিলতা ও সংকট নাই এবং সেগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' যথাক্রমে ছয়টি ও সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ ষোলটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য বলিয়াই ঘটনাপ্রবাহের অখণ্ডতা ও সংহতি বেশী প্রয়োজনীয় এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ অধিকতর নাট্যধর্মী হইবার জন্যই ইহাতে একটু ঘটনার বৈচিত্র্য প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেজন্য ইহার দৃশ্যসংখ্যাতেও আধিক্য দেখা গিয়াছে।

'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' এই দুইখানিই শেকসপীরীয় রীতিতে রচিত খাঁটি রোমান্টিক নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যেই পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবৈচিত্র্য রহিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর সহিত কুমার-ইলার উপকাহিনীটি অত্যন্ত সার্থকভাবে মিলিত হইয়াছে এবং 'বিসর্জনে' গোবিন্দমাণিক্য-গুণবতীর কাহিনীর সহিত রঘুপতি জয়সিংহের কাহিনীটি সুকৌশলে যুক্ত হইয়াছে। ঘটনার তীব্র গতি, হৃদয়াবেগের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত এবং হৃদয়বিদারী ট্র্যাজিক বেদনার অভিব্যক্তিতে এই দুইখানি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই দুইখানি নাটকের মধ্যে কাব্য আছে, গদ্যকথা আছে, গান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে নাটকীয়তা। ইউরোপীয় রীতিতে বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়া হইয়াছে ইহাদের মধ্যে এবং তখন রবীন্দ্রনাথ যে প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন চরিত্রগুলির সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কিন্তু 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জনে' নাট্যকলার যে চরমোৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইল না। পুনরায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী' এই দুইটি নাটকই গদ্যসংলাপহীন কাব্যধর্মী নাটক। তবে 'চিত্রাঙ্গদার' মধ্যে নাট্য সংঘাত থাকিলেও কাব্যধর্মিতাই প্রবলতর, কিন্তু মালিনী পদ্যছন্দে সম্পূর্ণভাবে রচিত হইলেও নাট্যসংঘাত ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। "চিত্রাঙ্গদা'র দৃশ্যবিভাগ 'রাজা ও রাণী'র পূর্ববর্তী নাটকগুলির অনুরূপ। অর্থাৎ, দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত, সংখ্যায় অধিক (এগারটি) এবং দৃশ্যরূপের উল্লেখ বর্তমান। 'মালিনী'র ঘটনা জটিল ও ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ, কিন্তু ইহার দৃশ্যগুলির সংখ্যা খুবই কম (মোট চারটি দৃশ্য)। সুতরাং অল্প দৃশ্যের মধ্যে

ঘটনার বিচিত্র ও প্রবল বেগ আসিবার ফলে এই নাটকের মধ্যে একটা দুর্দমনীয় গতিবেগ ও উদ্দীপনাত্মক নাট্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃশ্যরূপের নির্দেশ এই নাটকেও রহিয়াছে। 'মালিনী' রচনার কিছু আগে ও পরে তিনি কয়েকটি নাট্যকাব্য রচনা করিলেন। সেগুলির মধ্যে নাটকত্ব কতখানি ও কাব্যত্ব কতখানি রহিয়াছে তাহা আমরা পরে বিচার করিব। কিন্তু একটা বিষয় এখানেই উল্লেখ করা যায়, সেগুলির কোন দৃশ্যরূপ নাই। বুঝা যায়, সেগুলি পাঠ ও আবৃত্তি করিবার জন্যই প্রধানতঃ রচিত হইয়াছিল, অভিনয় করিবার জন্য নহে।

'শারদোৎসব' হইতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের নূতন পর্ব আরম্ভ হইল এবং তাঁহার নাট্য রচনা ও নাট্যাভিনয়ের কেন্দ্র কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হইল। দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে তাঁহার পরিবর্তিত ধারণা শারদোৎসবের মধ্যেই রূপায়িত। বিভিন্ন দৃশ্যে নাটকের ঘটনাকে ভাগ করিবার রীতিটি শিথিল হইয়া আসিল। দুইটি দৃশ্যে আলোচ্য নাটকটি বটে, কিন্তু প্রথম দৃশ্যটিকে আমরা প্রস্তাবনা রূপেই গ্রহণ করিতে পারি। নাটকের প্রধান ঘটনা দ্বিতীয় দৃশ্যটির মধ্যেই ঘটিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত সাঙ্কেতিক নাটক রচনার পরে রচিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক নাটকরূপে কথিত হইয়াছে এবং ইহা এলিজাবেথীয় নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ-রীতি গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট'র কাহিনী নাটকে রূপায়িত করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়তো ইহা ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের নাট্যরীতি ও পরিবেশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নাট্যরীতি পরিবেশ যাহাই হউক না কেন ইহার ভাববস্তু অন্যান্য সাঙ্কেতিক নাটকের ভাববস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত। 'রাজা' ও 'অচলায়তন' কয়েকটি দৃশ্যসম্বলিত নাটক। 'রাজা'র দৃশ্য সংখ্যা কুড়ি এবং অচলায়তনের ছয়, দৃশ্য-বাহুল্যের জন্য 'রাজা'র কাহিনী বহুধাবিক্ষিপ্ত, কিন্তু 'অচলায়তনে'র কাহিনীর মধ্যে একটা সংহতি ও দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। 'ডাকঘরে'র মধ্যে 'দৃশ্যসংখ্যা' তিনটি হইলেও দৃশ্যরূপের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তাহাতে নাটকের সংহতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃশ্যসজ্জার যে এককত্বের আভাস পাওয়া গিয়াছিল 'শারদোৎসবে' তাহার একটু দ্বিধাযুক্ত প্রকাশ দেখিলাম 'ডাকঘরে'। দ্বিধাযুক্ত বলিলাম এ-কারণে যে এই নাটকে দৃশ্যবিভাগ নামে আছে কিন্তু কাজে নাই। দৃশ্যসজ্জার দ্বিধাহীন ও বলিষ্ঠ এককত্বের পরিচয় পাওয়া গেল পরবর্তী

তিনখানা নাটকে—'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', ও 'রক্তকরবী'তে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছিলেন, 'ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে'—তাহার সার্থক পরীক্ষা আমরা দেখিতে পাইলাম এই নাটকগুলিতে। তবে 'তপতী' নাটকের ঘটনা সংস্থাপনায় তাঁহার এই উক্তি যে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই, তাহা পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ : নীলিমা ইব্রাহীম

যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হ'য়ে উঠ্ছি। মানুষের রিপু্ মাঝখানে এসে সেই সোহহম্-উপলব্ধিকে দুইভাগ করে দেয়, একান্ত হ'য়ে ওঠে অহম্'—এ সত্য উপলব্ধিতে যাঁর জ্ঞানচৈতন্য উদ্ভাসিত তাঁর জীবনদর্শনের বা সত্যদৃষ্টির পরিচয় আমরা দান করবো কোন্ আত্মিক মূলধনের ভিত্তিতে? রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্য-বোধ, তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মতামত বা ধ্যানধারণা এ সবের পরিচয় দিতে হ'লে তাঁর ব্যক্তিপুরুষের বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে যেমন আমাদের পরিচয় আবশ্যক ঠিক ততটুকু নয়, তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন তাঁর কবিসত্তা বা অন্তর-পুরুষের ভাব উপলব্ধির। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একান্তভাবেই সীমিত জ্ঞান নিয়ে তাঁর ভাবসত্তাকে কতটুকু প্রকাশ করতে সমর্থ হবো জানি না।

জাতীয়তাবোধের অনুভূতি যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীকে ইংরাজের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্বের দাবী থেকে মুক্ত করতে সহায়তা ক'রেছিল তার সঙ্গে ঠিক আমাদের আত্মার যোগ বা নাড়ীর টান ছিল ব'লে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। যদিও জনৈক ইংরেজ সগর্বে বলেছেন—

"Inspite of the cultural unity of large parts of India in the middle ages, there was no unifying force strong enough either to bind her together for defence or to give rise to any genuine nationality." (Percival Griffiths).

একদিক থেকে একথা সত্য যে সমগ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে যেটুকু সত্য আমরা জানতে পারি তাতে রাজ্যশাসন ক'রবার অথবা একই রাজার পতাকাতলে শাসিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতীয়েরা কোনও দিনই একত্রিত

হন নি। বিশেষ শাসকের পতাকাতলে ধর্মের আহ্বান বা সুশাসনের গৌরবে অনেক সময় বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা একত্রিত শাসিত হবার সুযোগলাভ করেছেন—যেমন চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন বা আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাসে সাম্রাজ্যের একটা বৃহৎ ব্যাপ্তির কথা আমরা জানতে পাই। কিন্তু সে একত্রের বন্ধন আজকের nationality-র সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বৃটিশ পতাকাতলে আমাদের যে স্বাজাত্যবোধ জেগে উঠেছে সে আত্মকল্যাণেচ্ছায় নয়, আত্মরক্ষার তাগিদে। Sir Ramsey Mc Donald বলেছেন—"If you cannot say that our rule has been a necessary factor in the development of Indian civilization, we can say that in view of historical Indian conditions it has been a necessary evil."

অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, অপমান, অবমান ও লাঞ্ছনার পদতলে সেদিন আত্মরক্ষার্থে সমগ্র ভারতবাসী যে একত্রিত হ'য়েছিল এ কথা অস্বীকার করলে ইতিহাসকে অমর্যাদা করা হবে। আমাদের একতাবদ্ধ ক'রবার সুযোগ দিয়ে ইংরেজ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন সন্দেহ নেই; তবে সে সুযোগদান তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়; সে সুযোগ আদায় অত্যাচারীদের আত্মরক্ষার দাবীতে।

তাই ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে তাদের জাতীয় চরিত্রের স্পর্শ লাভ করে, অথবা তাদের দেওয়া শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে আমরা জাতীয় চেতনা লাভ করিনি, বরং নিজস্ব কৃষ্টি, সভ্যতা, আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব সব কিছুই সেই নব সভ্যতার চোখ ঝলসানো আলোর কাছে নির্বিচারে নিজেকে হেয় মনে করে বিসর্জন দিয়েছি।

ভৌগলিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদে কবি বিশ্বাসী নন। ভারতবর্ষও তেমনি সীমারেখায় আবদ্ধ একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্ম, কর্ম বা ভোগের লীলাভূমি নয়। যুগ যুগ ধরে কত জাতি এখানে এসেছে তাদের শৌর্য, বীর্য, সভ্যতা, কৃষ্টি. শিল্প, সাহিত্য সব কিছুর ছাপ এ মহাভারতের জীবনে চিরকালের মত আঁকা হ'য়ে গেছে। কোনও এক জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ হয়ত তারা বিদ্যমান নেই তবুও তাদের স্পর্শ সুষমা আজও ভারতীয় জীবন স্পন্দনে অনুভূত হয়। তাই কবি গেয়েছেন—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য

হেথায় দ্রাবিড় চীন,

শকহুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।

*　　*　　*

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবেনা ফিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

আজ যতই না শক্ত ক'রে নিজেকে দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চাই, বিশ্বের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে আমরা ততই ছড়িয়ে পড়ছি। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় চেতনা তাদের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে দিন দিন হীন ক'রে তুলেছে। কারণ এই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে তারা মনুষ্যত্বকে, মানবিক অনুভূতিজাত সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বসেছে। তারা সগর্বে প্রকাশ ও প্রচার করে যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য মানবধর্ম বিসর্জন দেওয়া অতি তুচ্ছ ত্যাগ। এ বাহ্যিক দাম্ভিকতা ও মূঢ়তা কবির অন্তর স্পর্শ ক'রেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথও আমাদের জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতি বা পদ্ধতি থেকে দেশবাসীকে সতর্ক ক'রেছিলেন।

সবার আগে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক ক'রেছিলেন স্বদেশের সমাজজীবন ও রাষ্ট্র সম্পর্কে। সামাজিক কর্তব্যতন্ত্রই ছিল ভারতবাসীর ধর্ম, ভারতবাসীর কর্ম। এই সমাজকে কেন্দ্র ক'রেই তারা একদিন সভ্যতা ও জ্ঞানের চরম ও পরম পাওয়াকে খুঁজে পেয়েছিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র মানুষে মানুষে প্রভেদ এবং পরস্পরের স্বার্থের দ্বন্দ্বাঘাত সেদিন তাদের সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করেনি। রাজা ছিলেন বহু দূরে, অনেক উচ্চে। রাজকর যুগিয়েই প্রজারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রত। রাজার অকারণ অবিচার, অত্যাচারেও তারা জর্জরিত হ'ত না। কিন্তু আজকের প্রজা-সমাজের আবরণে যেমন নিজেকে আবৃত করে না, তেমনি রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। চীনদেশ সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন :—

"চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহো রাজ্য আক্রমণ করে তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয় তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয়

সভ্যতার কলেবর, এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহারা প্রাণে বাঁচে না। সুতরাং অন্য কোন প্রকার আঘাতের গুরুত্ব তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। 'বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করেন তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র। জিব্রল্টারের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলণ্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।"

এ ভবে আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতা ও তার মানদণ্ড, জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন বোধজাত সত্যোপলব্ধি সব দেশে এক নয়। পাশ্চাত্যের জীবনবোধ ও রাষ্ট্রীয় চেতনা ও গঠন প্রণালীর সঙ্গে প্রাচ্য দেশের বিশেষ করে ভারতের জীবন-বোধের মূলেই পার্থক্য রয়ে গেছে। তাই জাতীয় চেতনা ওদের মস্তিষ্কের সম্পদ আর আমাদের হৃদয়ের ধন। ওদের রাজত্ব ওদের, আর আমাদের রাজত্ব আমাদের রাজার। সেইজন্যে আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানের সূত্রে নির্দিষ্ট জাতীয়তাবোধ ভারতে কোন দিনই ছিল না, কারণ ভারতীয়দের জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ও অনুভূতিকে তারা কখনো কামনা করেনি।

রবীন্দ্রনাথের দেশোপ্রেম ইংরাজ বিদ্বেষে সীমাবদ্ধ নয়। অতি সহজ ভাষায় ইংরাজের সমালোচনা করে এবং নিজেদের উচ্চে স্থাপিত করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতৃত্ব তিনি কামনা করেননি। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শান্তির ও মৈত্রীর; তাই একটি সমগ্র জাতীই খারাপ, তার বিচারবুদ্ধি আচার-ব্যবহার সবই সমালোচনা গ্রাহ্য একথা কবি বিশ্বাস করতেন না। ভারতীয়েরা শাসিত, ইংরাজ শাসক এবং শুধু জয়ের গর্ব লাভ করবার জন্যে ভারতবাসীদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অধিকার যেমন তাদের নেই, তেমন আমরা পরাজিত বলে শুধু যে তারা আমাদের নিন্দারই পাত্র, এও বুদ্ধিসম্মত যুক্তি নয়। আমাদের সমস্ত দুঃখ ও গ্লানি জমা হয়েছে রাজা প্রজা সম্পর্ক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা-প্রজায়' এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ভারতের ভাগ্যে ইংরাজের দাসত্বই প্রথম অধীনতা নয়। এর পূর্বেই বাইরের শক্তির কাছে ভারতবর্ষ নতি স্বীকার করেছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমান শাসকদের কথা তিনি বলেছেন। 'বাদশা যখন ছিলেন তখন তিনি জানিতেন, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজ জাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজ-পরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন

হইয়া উঠিয়াছে।' পাঠান, মোগল এ দেশ জয় করেছে, এদেশে বসতি স্থাপন করে এদেশবাসীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতবাসীর ভাগ্যের সঙ্গে তাদের ভাগ্যও এক সূত্রে গাঁথা হয়েছিল সেদিন। কিন্তু প্রতিটি ইংরেজ জানে তারা এদেশের অধিবাসী নয়। বহু দূর থেকে তারা শাসনের নাম করে শোষণ করবার জন্যে এখানে এসেছে। এখানে তাদের বিচারক কেউ নেই। কারণ আমরা ভৃত্যের ওপর অন্যায় বা অত্যাচার করে যেমন অন্যের কাছে জবাবদিহি করবার প্রয়োজন বোধ করি না, সভ্য ইউরোপীয় জাতীরাও তেমনি ওদের কলোনীগুলোর অধিবাসীদের ব্যবহারে কোনও সমালোচনা বা বিবেকের ধার ধারে না। ইংরেজ জানতো ভারতবর্ষ তাদের ভাঁড়ার ঘর। সেখানকার প্রতি শস্যকণা ও স্বর্ণকণার প্রতি তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাই 'ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না ভারতবর্ষে তাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে। সেই অন্ন নানা রকম আকারে, নানা রকম পাত্রে আমাদের যোগাইতে হইতেছে।'

এ সম্মিলিত অত্যাচারের কারণ রাজায় প্রজায় হৃদয়ের সম্বন্ধের অভাব। রাজা থাকেন বহুদূরে। ভারতবর্ষ নামে তাঁর একটি ভূস্বর্গসম জমিদারী আছে, এটুকুর সংবাদই শুধু তিনি জানেন। বৎসর বৎসর রাজকর তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজার কর্তব্য পালন করে নয়। প্রজানুরঞ্জন এ রাজার রাজনীতিতে নেই—প্রজা শোষণই তাঁর একমাত্র রাজধর্ম। যাকে চোখে দেখা যায় না, তার প্রতি হৃদয়ের টান আসবে কোথা থেকে? তাই 'বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইয়াছি সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি—এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে তাহার কারণ কী।' কারণ রাজা প্রজার অবস্থানের দূরত্ব ও অন্তরের ব্যবধান। এর প্রতিকার কামনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'অতএব কংগ্রেসের যদি কোনও সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, ভালোমন্দ বা মাঝারি যে কোনও একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেণ্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যত রসালো হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।' ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের মাঝে ছিল এই হৃদয়ের ব্যবধান, তাই শোষক ও শোষিতের সম্পর্কেই তাদের শেষ পরিচয় রয়ে গেল।

প্রাচীন ভারতে রাজা ছিলেন প্রজার পিতৃতুল্য। তাই তাঁর কাছে প্রজার আবেদন করবার অধিকার ছিল, এবং তাতে অনেক সময়ে সুফলই ফলতো। কিন্তু এই হৃদয়হীন বহু রাজকতার কাছে আমাদের চাইতে হবে অন্ন, চাইতে হবে শিক্ষা, চাইতে হবে স্বাধীনতা ও মুক্তি! এর চেয়ে বিড়ম্বনা জাতীয় জীবনে আর কি আছে? আমরা সব রকমে নিজেকে ইংরেজ করতে চাই যাতে ওরা আমাদের ওদের সমকক্ষ বলে মনে করে। ওদের মত কোট, পাৎলুন পরে ইংরেজীতে কথা বলে নিজেদের ইংরেজ করবার কত চেষ্টাই না আমরা করেছি। কিন্তু তাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিড়ম্বনা বেড়েছে অনেক বেশী। ওদের সমকক্ষও হ'তে পারিনি ভারতীয়ের সম্মানটুকুও খুইয়ে বসেছি। আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে কেউ সম্মান পেতে পারে না। ওরা ওরাই, আমরাও আমরা। একে অপরে লীন হ'তে পারি হৃদয়ের সম্পর্কে, দাসত্বের দীনতা হীনতায় নয়। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার গোড়া থেকেই এ ভুল আমরা করেছিলাম। ফলে সম্মান পেয়েছি যেটুকু, খুইয়েছি তার চেয়ে অনেক। দান করে দাতা বড় হয়, গ্রহিতার মাথা নত হয়। তাই ইংরেজের কাছে ভারতবাসী হাত পেতেছে যতভাবে শুধু ভিক্ষার দৈন্যই তাকে কলঙ্কিত করেছে। যা পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশী। অবশ্য আমাদের অন্তরের এ দৈন্যের জন্য দায়ী আমরা নিজেই। আমাদের আজন্ম লালিত সংস্কারের বেড়াই এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। আমাদের অন্তরের এই যে দৈন্য ও দাসত্ব এ আমাদের বংশ পরম্পরার জড়তার অভিশাপ। জাতীয় জীবনের সহজ গতি শুদ্ধ হয়েছিল তাই মানবাত্মার মৃত্যুও ঘটেছিল। দুঃখের জ্বালা ও দহনকে আমরা অনুভব করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তাই কবি আমাদের এ জীবন সম্পর্কে বলেছেন—'কোথাও আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে—এটা আমরা কিছুতেই পুরা মাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে, সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তারপরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টাও আমাদের হাড়ে মাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না। তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম,

গাঁট খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা ফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনও মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি বিলাতি চশমা পরিলেও না।'

তাই সবার আগে প্রয়োজন চিত্তের মুক্তি সাধন ও সংস্কারের জড়ত্বের নাগপাশ থেকে অব্যাহতির প্রচেষ্টা। অবশ্য এ মুক্তি সাধনাতেও প্রাচ্য প্রতীচ্যের পার্থক্য কম নয়। ওদের জীবনের লক্ষ্য কাজ, আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য কাজের ভেতর দিয়ে মুক্তিকে খোঁজা। কবির কথায়—'হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু করাটাকেই ওরা জীবনের চরম কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছে। কবি ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতের দেশগুলো ভ্রমণ ক'রে এ সত্যই উপলব্ধি করেছেন যে ওরা কর্মোন্মাদ; আর সে কর্মের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্যও এই কাজ করা। কাজের নেশায় ওরা প্রতি মুহূর্তে ছুটে চলেছে। আর প্রতিদানে পাচ্ছে বস্তু ভোগ তৃষ্ণা তৃপ্তির উপাদান। জড়বস্তু ভোগের কামনা নিয়ে, স্বর্ণতৃষ্ণা ও রূপতৃষ্ণার অতৃপ্তি নিয়ে উন্মত্তের মত যন্ত্রদানবের তালে তালে ছুটে চলেছে অধীর আকুলতায়। ওদের এ জগতের কর্মফল ওরা নগদ বিদায়েই পাচ্ছে। ওদের সাধনা তাই প্রেমেরও নয়, কল্যাণেরও নয়। কবির মতে ওরা করে চলেছে কুবেরের সাধনা অর্থাৎ ধনের বহুলত্ব বিধানই ওদের লক্ষ্য, আর প্রাচ্য করেছে লক্ষ্মীর আরাধনা—ধনকে কল্যাণে নিয়োজিত করাই ছিল যাদের কাম্য। লক্ষ্মী তাই আমাদের শুধু বস্তুভোগরূপী ঐশ্বর্যই দান করেন না, কল্যাণ আর শান্তিও দান করেন। পাশ্চাত্যের কর্মময় যান্ত্রিক জীবন থেকে আনন্দ তাই বহুদূরে চলে গেছে। সহজ জীবন ও যৌবনকে গলা টিপে ওরা টিঁকে আছে কিন্তু বেঁচে নেই। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগাযোগের আনন্দ সূত্র থেকে ওরা হ'য়েছে বঞ্চিত। নিরন্তর টিঁকে থাকাতেই ওরা জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে ফিরছে। তাই মানুষ ওরা হ'লেও হৃদয় ওদের নেই। একজনকে দলিত পিষ্ট করে ওরা নিজেদের 'বড়ত্বের' প্রতিষ্ঠা করছে। 'রক্তকরবী' নাটকে কবি বার বার এ সত্য বাণীই উচ্চারণ করেছেন দাম্ভিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। যান্ত্রিক দানবের বিরাটত্বে নন্দিনী মুগ্ধ

হ'য়েছে। অধ্যাপকের কাছে জানতে চেয়েছে এই বড় হবার তত্ত্বকে। অধ্যাপক বলেছে—'সেই অদ্ভুতটি হ'ল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হ'ল তার খরচ। ওই ছোটগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জলতে থাকে শিখা। এই হ'চ্ছে বড় হ'বার তত্ত্ব'। এ বড় হ'বার তত্ত্বকে ওরা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়েই বিশ্বাস করে। তাই আমাদের তাঁতিদের আঙ্গুল কেটে মাঞ্চেষ্টারের মিলকে গড়ে তুলতে ওদের নীতিতে বাধেনি। কারণ ছোটকে, দুর্বলকে মেরে সবলের বড় হবার অধিকারে যেমন ওরা আস্থাবান নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্য দেশের সর্বনাশ সাধনাও তেমনি ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে ওরা অভ্যস্ত। তাই সে ব্যবহার, আচরণ ও জীবন সাধনায় ওরা নিজেদের স্বার্থকতা আহরণ করছে বলে মনে ভাবছে, আমাদের জীবন সে পথ থেকে বহুদূরে। কারণ জীবনকে দেখবার ও উপলব্ধি ক'রবাব পথ আমাদের ভিন্ন।

ঐশ্বর্যের সাধনা এভাবে ভারতবর্ষ কখনও করেনি। তারা খুঁজেছে সহজ, সরল জীবন যাত্রার পথ; জীবনের কর্তব্য সাধনা তাদের একদিকে যেমন ছিল প্রশান্ত ও উদার অন্যদিকে তেমনই দৃঢ়ভিত্তিক। তাদের দারিদ্র তাদের হীন করেনি; সংযমের কাঠিন্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা দান করেছে। তাদের আনন্দ-ছিল ত্যাগে, ভোগে নয়।

জীবনের আদর্শ ও জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় সাধনা একাকীত্বের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এই একাকীত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকীত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।' এ একাকীত্বের জন্য লজ্জিত হবার কিছু নেই, অধিকন্তু এ আমাদের গৌরব। কারণ পৃথিবীর সকল দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি একই প্যাটার্নে একই ছাঁচে ঢালা হবে এ আমরা আশা করতে পারি না। তাই যদি হয় তাহ'লে বুঝতে হবে সব জাতিরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটেছে।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ আজীবন সন্ধান করেছেন সচ্চিদানন্দের। কবির ভাষায় 'জগৎ যেমন অসীম, যারা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে কোন নূতন সত্য এবং নূতন আনন্দ লাভ করেননি তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।'

তাই ওদের মত বস্তু সংগ্রহ ও জড় ভোগকেই যদি জীবনের সার সত্য ও

চরম সাধনালব্ধ ধন বলে গ্রহণ করতে না পারি তাতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের নাড়ীর সঙ্গে, জীবনযাত্রার সঙ্গে নেই এর কোনও সত্যিকারের যোগাযোগ। সেজন্যে উভয় রীতিকে মিশ্রিত করে আমরা নিজেদের যা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি তা ওই Anglo Indian গোষ্ঠীর মত। ওরা না ইংরাজ চরিত্রের বলিষ্ঠতা পায়, না ভারতীয় চরিত্রের ত্যাগকে আশ্রয় করতে পারে। ওরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পায় তা ইংরাজের বাহ্যাড়ম্বর আর ভারতীয়ের চারিত্রিক দুর্বলতা। ওদের ভাষায় বলতে গেলে—'Vices of both and virtue of none', তাই ওদের জীবনকে গ্রহণ করতে পারিনি বলে জীবনটা আমাদের ব্যর্থ হয়ে যায়নি। কবি বলেছেন—'তখন বসে বসে মনকে এই বলে বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরী করতে পারিনে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারিনে, কিন্তু ভালবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে পারি। দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কী। না হয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, 'টাইমস্'-এর জগৎ প্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম না হয় নাই উঠ্‌ল।' কবির এ ধারণা যে শুধু মনোবিলাস নয়, অন্তরের দৃঢ় সত্য উপলব্ধিজাত ফল তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মহাত্মাজীর অহিংস নীতিতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে। চরিত্রের বল, তার সহিষ্ণুতায়, তার প্রেমে। শক্তির দম্ভে মানুষ জড় বস্তুকে জয় করতে পারে কিন্তু মানবের হৃদয় জয় করতে হলে হৃদয় দিয়েই করতে হয়। এই হৃদয় জয়ের শক্তি ভারত একদিন তার সাধনা দিয়েই লাভ ক'রেছিল। তাই বহু বিদেশীকে সে আপন বুকে টেনে নিয়ে ভারতবাসীতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনে নিজেকে তিনি চিনেছিলেন, জেনেছিলেন। তাঁর আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিল তাঁর আদর্শ, তাঁর আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা। সে কল্পনা তাঁকে বর্তমান জগৎ থেকে প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের, আর্য সভ্যতার পিঠস্থানে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে এবং ব্যক্তি জীবনের গতিপথে সর্বত্রই রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার আগে যে কথা বলেছি nationalityর sentiment মাত্রে ভর করে আত্মিক জাগৃতিতে বা দেশ মুক্তির পথে তিনি আস্থাবান ছিলেন না।

সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পর্যন্তই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম পূর্ব অধিষ্ঠিত হিন্দুমেলাতেও বালক রবীন্দ্রনাথ সুললিত কণ্ঠে

দেশমাতৃকার আহ্বান সংগীত পরিদর্শন করে নিজের মনোধর্ম ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, মহামানবের কবি একথা যেমন সত্য তেমনি তিনি বাংলার কবি, ভারতের কবি, বাংগালীর কবি, ভারতবাসীর কবি, মানুষের কবি একথাও তেমনিভাবেই সত্য। এই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তাঁর কাব্যে ও সাহিত্য স্থষ্টির ভাবমণ্ডলে স্ব বিরোধ রয়ে গেছে। কিন্তু সে বিরোধ কবি আত্মায় নেই। সে আপাত বিরোধ কবির ভাব বিবর্তনে পাঠকের দৃষ্টি ভ্রম ; তাই রবীন্দ্রনাথ কবি এ তাঁর বড় পরিচয় হলেও, তিনি মানব এ তাঁর সর্বোত্তম পরিচয়। সেজন্যে দেশবাসীর বেদনায় ব্যাকুলচিত্ত রবীন্দ্রনাথ দেশমুক্তি আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার বলেছেন—'তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বমানবের পূজারী বলিয়া গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু তিনি যে সর্বাগ্রে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন এ কথা স্বীকার করিতে যেন লজ্জাবোধ করেন।' অবশ্য এ উক্তি সর্বাংশে সত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় দেশ সেবা সম্পর্কে আমাদের মন যে কিছুটা উদাসীন ছিল এ বিষয়ে বোধ হয় মত-ভেদ নেই। কারণ তাঁকে সীমার মাঝে, খণ্ড কর্মক্ষেত্রে আবদ্ধ দেখতে দেখতে আমাদের মনই কেন জানিনা নারাজ ছিল।

শুধু হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ নয় রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাদেশিক সভা'তেও তিনি যোগদান করেন। এ তাঁর কৈশোরের স্বদেশ মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়াস। ১৮৯২ সালে 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। সাধনা পত্রিকায় কবি সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ সেবায় প্রাণ ঢেলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে ১৮৯৩ সালে 'চৈতন্য লাইব্রেরী'তে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন—'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ব্যবহার এবং যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।' তাঁর আবেদন নীতির প্রতি ঘৃণার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আত্মশক্তি সাধনার প্রতিই কবি সকলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ১৮৯৭ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ নাটোর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগদান করেন। এখানে তাঁরা অর্থাৎ তরুণের দল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন।

দেশমাতৃকার আহ্বান সংগীত পরিদর্শন করে নিজের মনোধর্ম ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, মহামানবের কবি একথা যেমন সত্য তেমনি তিনি বাংলার কবি, ভারতের কবি, বাংগালীর কবি, ভারতবাসীর কবি, মানুষের কবি একথাও তেমনিভাবেই সত্য। এই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তাঁর কাব্যে ও সাহিত্য সৃষ্টির ভাবমণ্ডলে স্ব বিরোধ রয়ে গেছে। কিন্তু সে বিরোধ কবি আত্মায় নেই। সে আপাত বিরোধ কবির ভাব বিবর্তনে পাঠকের দৃষ্টি ভ্রম ; তাই রবীন্দ্রনাথ কবি এ তাঁর বড় পরিচয় হলেও, তিনি মানব এ তাঁর সর্বোত্তম পরিচয়। সেজন্যে দেশবাসীর বেদনায় ব্যাকুলচিত্ত রবীন্দ্রনাথ দেশমুক্তি আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার বলেছেন—'তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বমানবের পূজারী বলিয়া গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু তিনি যে সর্বাগ্রে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন এ কথা স্বীকার করিতে যেন লজ্জাবোধ করেন।' অবশ্য এ উক্তি সর্বাংশে সত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় দেশ সেবা সম্পর্কে আমাদের মন যে কিছুটা উদাসীন ছিল এ বিষয়ে বোধ হয় মত-ভেদ নেই। কারণ তাঁকে সীমার মাঝে, খণ্ড কর্মক্ষেত্রে আবদ্ধ দেখতে দেখতে আমাদের মনই কেন জানিনা নারাজ ছিল।

শুধু হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ নয় রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাদেশিক সভা'তেও তিনি যোগদান করেন। এ তাঁর কৈশোরের স্বদেশ মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়াস। ১৮৯২ সালে 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। সাধনা পত্রিকায় কবি সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ সেবায় প্রাণ ঢেলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে ১৮৯৩ সালে 'চৈতন্য লাইব্রেরী'তে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন—'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ব্যবহার এবং যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।' তাঁর আবেদন নীতির প্রতি ঘৃণার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আত্মশক্তি সাধনার প্রতিই কবি সকলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ১৮৯৭ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ নাটোর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন। এখানে তাঁরা অর্থাৎ তরুণের দল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন।

রবীন্দ্র-বীক্ষা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৬ই অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য করেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বিভিন্ন সভাতে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করে বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে মাতিয়ে তোলেন। ১৬ই অক্টোবর 'রাখী বন্ধনে'র উৎসব জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

রাখী বন্ধনের পর 'ফেডারেশনের হল গ্রাউণ্ডে' বিরাট জনসভা আহূত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সভায় যোগদান করেন এবং দেশপূজ্য নেতা আনন্দমোহনের বক্তৃতার সার্থক বঙ্গানুবাদ করে দেশবাসীকে তৃপ্তি দেন।

এর পরেই ধীরে ধীরে কংগ্রেসের ভাঙন দেখা দেয় অর্থাৎ নরম ও চরম পন্থীদের ভেতর মতের অমিল শেষ সীমায় এসে পৌছায়। সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ দেশ প্রেমিক হ'লেও কবি দার্শনিক এবং সাধক। তাই এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের আবর্ত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইলেন। সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যর্থতার পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আসতে চেষ্টা করেন।

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্ভবত তাঁর উদার মহৎ ও শান্তিকামী চিত্তের নিকট উত্তেজিত ভিন্ন পন্থীরা নতি স্বীকার করবেন এই আশাতেই তাঁকে আহ্বান জানান হয়। রবীন্দ্রনাথও সাগ্রহে এ অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু এখানেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের সমাপ্তি। এর পরও কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সভায় যোগদান করেছেন তবে সে কর্তব্য মনে করে এবং হৃদয়াবেগকে শান্ত করতে না পেরে। কারণ স্বদেশ প্রেম বা প্রীতি বলতে আমরা যা বুঝি তাকে রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশ বাসীর প্রেম ও স্বদেশের ও স্বসমাজের গঠন-মূলক কাজের প্রীতিতে পরিণত করেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে যা দিয়েছেন সে ঋণ অপরিশোধনীয়। সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করলেও তিনি কর্মী যতটুকু ছিলেন তার চেয়ে সাধক ছিলেন

দেশমাতৃকার আহ্বান সংগীত পরিদর্শন করে নিজের মনোধর্ম ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, মহামানবের কবি একথা যেমন সত্য তেমনি তিনি বাংলার কবি, ভারতের কবি, বাংগালীর কবি, ভারতবাসীর কবি, মানুষের কবি একথাও তেমনিভাবেই সত্য। এই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তাঁর কাব্যে ও সাহিত্য সৃষ্টির ভাবমণ্ডলে স্ব বিরোধ রয়ে গেছে। কিন্তু সে বিরোধ কবি আত্মায় নেই। সে আপাত বিরোধ কবির ভাব বিবর্তনে পাঠকের দৃষ্টি ভ্রম ; তাই রবীন্দ্রনাথ কবি এ তাঁর বড় পরিচয় হলেও, তিনি মানব এ তাঁর সর্বোত্তম পরিচয়। সেজন্যে দেশবাসীর বেদনায় ব্যাকুলচিত্ত রবীন্দ্রনাথ দেশমুক্তি আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার বলেছেন—'তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বমানবের পূজারী বলিয়া গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু তিনি যে সর্বাগ্রে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন এ কথা স্বীকার করিতে যেন লজ্জাবোধ করেন।' অবশ্য এ উক্তি সর্বাংশে সত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় দেশ সেবা সম্পর্কে আমাদের মন যে কিছুটা উদাসীন ছিল এ বিষয়ে বোধ হয় মত-ভেদ নেই। কারণ তাঁকে সীমার মাঝে, খণ্ড কর্মক্ষেত্রে আবদ্ধ দেখতে দেখতে আমাদের মনই কেন জানিনা নারাজ ছিল।

শুধু হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ নয় রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাদেশিক সভা'তেও তিনি যোগদান করেন। এ তাঁর কৈশোরের স্বদেশ মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়াস। ১৮৯২ সালে 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। সাধনা পত্রিকায় কবি সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ সেবায় প্রাণ ঢেলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে ১৮৯৩ সালে 'চৈতন্য লাইব্রেরী'তে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন—'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ব্যবহার এবং যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।' তাঁর আবেদন নীতির প্রতি ঘৃণার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আত্মশক্তি সাধনার প্রতিই কবি সকলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ১৮৯৭ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ নাটোর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগদান করেন। এখানে তাঁরা অর্থাৎ তরুণের দল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন।

১৮৯৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের অবরোধের প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। এ উপলক্ষ্যে কণ্ঠরোধ নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'মূল কথাটা এই তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী তাঁহারা পশ্চিমদেশী, আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া ওঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোনও লক্ষণ নাই, কেবল একটি আছে—আমরা অজ্ঞাত।

সত্যই যদি তাহাই হইবে তবে হে রাজন্‌, আমাদিগকে আর কেন অজ্ঞাত করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কী?'

১৯০২-৩ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' নামে এক স্বদেশ প্রেম জাগ্রতকারী সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এঁরা স্বদেশী শিল্পে আস্থাবান ছিলেন। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর মথিত স্বদেশ প্রেমের অভিব্যক্তিতে গেয়েছিলেন—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

*　　　*　　　*

যদি আলো না ধরে—
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে।
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল্‌রে।

কিন্তু ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের মন যে Nationality-র Sentiment মুক্ত হয়ে সমাজ সেবার মাধ্যমে মনের সেবার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তার পরিচয় এ সময় থেকেই আমরা পাই। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' নামক বক্তৃতায় তিনি দেশ সেবার নূতন পথের নির্দেশ দেন। কেদারনাথ দাশগুপ্তের সহায়তায় ও উদ্যোগে 'ভাণ্ডার' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং স্বদেশ-মন্ত্রে ও জীবনের সত্য দর্শনের পথে দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন।

রবীন্দ্র-বীক্ষা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৬ই অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য করেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বিভিন্ন সভাতে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করে বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে মাতিয়ে তোলেন। ১৬ই অক্টোবর 'রাখী বন্ধনে'র উৎসব জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

রাখী বন্ধনের পর 'ফেডারেশনের হল গ্রাউণ্ডে' বিরাট জনসভা আহূত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সভায় যোগদান করেন এবং দেশপূজ্য নেতা আনন্দমোহনের বক্তৃতার সার্থক বঙ্গানুবাদ করে দেশবাসীকে তৃপ্তি দেন।

এর পরেই ধীরে ধীরে কংগ্রেসের ভাঙন দেখা দেয় অর্থাৎ নরম ও চরম পন্থীদের ভেতর মতের অমিল শেষ সীমায় এসে পৌছায়। সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ দেশ প্রেমিক হ'লেও কবি দার্শনিক এবং সাধক। তাই এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের আবর্ত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইলেন। সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যর্থতার পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আসতে চেষ্টা করেন।

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্ভবত তাঁর উদার মহৎ ও শান্তিকামী চিত্তের নিকট উত্তেজিত ভিন্ন পন্থীরা নতি স্বীকার করবেন এই আশাতেই তাঁকে আহ্বান জানান হয়। রবীন্দ্রনাথও সাগ্রহে এ অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু এখানেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের সমাপ্তি। এর পরও কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সভায় যোগদান করেছেন তবে সে কর্তব্য মনে করে এবং হৃদয়াবেগকে শান্ত করতে না পেরে। কারণ স্বদেশ প্রেম বা প্রীতি বলতে আমরা যা বুঝি তাকে রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশ বাসীর প্রেম ও স্বদেশের ও স্বসমাজের গঠনমূলক কাজের প্রীতিতে পরিণত করেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে যা দিয়েছেন সে ঋণ অপরিশোধনীয়। সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করলেও তিনি কর্মী যতটুকু ছিলেন তার চেয়ে সাধক ছিলেন

বড়। তাই দেশমুক্তি অর্থে ইংরেজ প্রভুত্বের মুক্তিই তিনি শুধু কামনা করেন নি, দেশবাসীর আত্মিক মুক্তির কথাই তিনি বেশী করে, গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সেই জন্য বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীকে সত্যকার মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, তখন তাহার মত মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।"

সেন্টিমেণ্টের প্রাবল্যে অতি উত্তেজনায় মানুষ যে কল্যাণ অকল্যাণ, হিত ও অহিতের সম্পর্কে জ্ঞান শূন্য হয় কবির কথায় আমরা এ সতর্কবাণীই উচ্চারিত হ'তে শুনি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আরাধ্যে পৌঁছবার জন্যে সাধনার প্রয়োজন। অল্প আয়াসে সকল বাঞ্ছিতকে আয়ত্ত ক'রবার আশা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। আপাতচক্ষে উত্তেজনা সার্থকতার গৌরব বলে মনে হয় কিন্তু সাধনালব্ধ কাম্যকে ওভাবে লাভ করা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ এ হিংসাত্মক বিপ্লব পন্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।' সত্যই তাই বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, ধ্বংসের ভেতর দিয়ে হয়ত পশু শক্তিকে দমন করা যায়, কিন্তু শান্তি, কল্যাণ, পবিত্রতা ও আনন্দকে লাভ করা যায় না। ঈর্ষার কালিমায় সুন্দর ঢাকা পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'পথের দাবী'র ভারতীর কথা—"ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে মুক্ত কণ্ঠে আমরা চাই। দুর্বল পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্ন বস্ত্র চাই। মনুষ্য জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এত বড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই, এ আমি কোনও মতেই ভাবতে পারি নে।......

নিষ্ঠুরতার এই বারম্বার চলা পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও। এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি। শিষ্যের মুখে এ যেন গুরুর কথারই প্রতিধ্বনি। 'চার অধ্যায়ে' এ সত্যই রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। এ পথে তাই রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছেন—'যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু'।

অন্তর যেখানে শূন্য, সাধনা সেখানে ব্যর্থ। ভারতবর্ষ ভোগের দেশ নয়, ত্যাগের দেশ। ইন্দ্রিয় ভোগই এর চরম পূর্ণতা নয়, আত্মিক সাধনায় চিত্ত চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত হওয়া বা ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়াই এ দেশবাসীর সাধনার লক্ষ্য। তাই যে আপাত জয় ও মিলনের চিত্রে আমরা উৎসাহিত হচ্ছি কবির ভাষায় তা 'যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্নজাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবন ধর্ম বশতঃ ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।' সুতরাং আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের জন্য 'ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব যাহাতে শত্রু মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে, ক্ষমার বীর্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ আমরা কখনোই তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব।' তিনি ছিলেন সত্য, সুন্দর আনন্দের পূজারী শান্তিকামী, কল্যাণপন্থী।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলের রাজবন্দীদের প্রতি ইংরাজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ গড়ের মাঠে আহুত সভায় বক্তৃতা করেন।* তাঁর এ বক্তৃতা তৎকালীন প্রতিটি শ্রোতার মনে আজও জাগ্রত হয়ে আছে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল শিল্প বাণিজ্যে দেশ স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ রীতি গ্রহণ করা দেশের পক্ষে অকল্যাণজনক। কিন্তু এ মতের অমিল সত্ত্বেও ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত দেশপ্রেমিক গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রেম সেজন্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলে—

ছেন—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটা অভিশাপ। যে সকল দল ও সম্প্রদায় বাঁটোয়ারা চাহে নাই, তাহাদের ওপর এই অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে রাজনীতি হিসাবে আঠারোটা পৃথকভাবে বিভক্ত করিবার আয়োজন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শবমাত্রে পরিণত হইবে।

নানাভাবে তিনি শাসক সম্প্রদায়ের এ চাতুরী ও বিচ্ছেদ অস্ত্র প্রয়োগ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক তাই অগ্রজের প্রতিই ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, অসীম নির্ভরতা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় ভক্তি। তাকে আমরা নানাভাবে বিদ্রোহী বলে অভিহিত করি। সে বিদ্রোহ শুধু ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, সে বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের নাগপাশের বিরুদ্ধে, ভীরুতা ও জড়তার বিরুদ্ধে। স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বধর্ম, স্বসভ্যতা ও স্বকৃষ্টিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণে তিনি শিক্ষা ও সমাজজীবনে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষাই যে ভারতের মুক্তিপথের প্রশস্ত সোপান এ সত্য রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর এ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিয়েছিল। সেখানে তিনি দেখেছেন শুধু শিক্ষার প্রসারতার ফলে তারা কত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ শিক্ষায় ও জীবনে ব্যবধান। ইংরেজ সরকার আমাদের যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে তা আমাদের সুদক্ষ কেরাণী করলেও মানুষ করেনি। কারণ আমার দেশের জীবনযাত্রা প্রবাহে তার প্রয়োজনীয়তা আমরা মুহূর্তের জন্যেও অনুভব করতে পারিনি। এ দেশের মাটি, জল, বাতাস বা নাড়ীর সঙ্গে এ শিক্ষার কোনও যোগাযোগ নেই। তাই আমরা যা তৈরী হ'চ্ছি তা কারখানার যন্ত্র, স্বাভাবিক চৈতন্যসম্পন্ন মানুষ নই। রাশিয়ার শিক্ষা সম্পর্কে কবি বলেছেন—'এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান্ করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাশ ক'রবার কিম্বা পণ্ডিত ক'রবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ ক'রবার জন্যেই শেখায়।'

কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এর বিপরীত ধর্মই লক্ষ্য করি। আমরা জানবার

না-হয়—আরো ভালো উদাহরণ নেওয়া যাক্—

ঝিকিমিকি করে পাতা, ঝিলিমিলি আলো,
আমি ভাবিতেছি কা'র আঁখি দুটি কালো।

এ-সব কবিতায় আমরা অত্যন্ত ভীরু, পৃথিবী-পলাতক কবি-মনের পরিচয় পাই, প্রথম প্রেমের লজ্জায়, কুণ্ঠায়, আনন্দে, গৌরবে যার সমস্ত আকাশ রঙে-রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে; একদা এক বর্ষার দিনে যে হঠাৎ এই বিশাল আবিষ্কার করে ফেলে—

এমন দিনে তারে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবনের রচনায় এই ভীরু প্রেমই একটু দৃঢ়, আত্ম-প্রতিষ্ঠ হয়েছে; এ-কথা তিনি সাহস করে মুক্তকণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট।

নিজের প্রেমে নিজেই মুগ্ধ হয়ে প্রেমিকার দিক থেকে তিনি প্রণয়প্রশ্ন করেছেন—

আমার মধুর অধর বধুর
নব লাজ-সম রক্ত?

কিন্তু এখনো রূপক ছেড়ে সোজা কথায় তিনি নেমে আসেন নি। এর খানিকটা ব্যতিক্রম হয়েছিলো। "ক্ষণিকা"য়।—

হৃদয় পানে হৃদয় টানে
নয়ন পানে নয়ন ছোটে,
দু'টি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে।

•

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিও ক্ষমা।

আমি নাব্‌বো মহাকাব্য
সংরচনে
ছিলো মনে—

ঠেকলো কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে,

কল্পনাটি গেলো ফাটি'

হাজার গীতে।

এ-সব উক্তি অনেকটা স্পষ্ট, অনেকটা ব্যক্তিগত—তবু যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট ব্যক্তিগত নয়। রূপকের আশ্রয় পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন হাসির আশ্রয়; মনের কথাকে তিনি ঢেকেছেন ঠাট্টার আচ্ছাদনে, গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে সাহস পাননি—বরং বড় বেশি গভীর করে' বড় বেশি গভীর কথাই বলেছেন, তীক্ষ্ণ ঋজুতায়—যা নিতান্ত মনের কথা তা বলেছেন বাঁকিয়ে নানারকম ছদ্মবেশের আড়াল থেকে। ইংরেজী কবিতা পড়ে অভ্যস্ত আমাদের মনে এ-ধরনের জিনিস ঠিক প্রেমের কবিতা—love poetry-বলে মনে হয় না। প্রেমের কবিতা বলতে আমরা বুঝি অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ, direct উক্তি, পুরুষ তার প্রণয়িণীকে সম্বোধন করে, তাকে নাম ধরে ডেকে যা বল্‌ছে, বাস্তবিকপক্ষে যা একজনকে শোনাবার জন্যেই লেখা—একেবারে নিরাভরণ,—প্রত্যেকটি শব্দে টিপ্ টিপ্ করে হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। যে কবিতা অত্যন্ত ব্যক্তিগত, কবির একরকমের আত্ম-চরিত কবির মানসিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে যা পড়া যায়, যেমন ধরা যাক ডন্‌-এর—

I Wonder, by my troth, What thou and I
Did, till we loved ?

কিম্বা হেরিক্-এর

Bid me, Julia, and I Shall live
Thy Protestant to be.

কিম্বা ব্যর্ন্‌স্-এর

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never kissed and never parted
We'd never been broken hearted.

না-হয় শেলিকেও ধরা যাক্—

I can give not what men call love
But wilt thou accept not
The worship that the heart lifts above
And the heavens reject not ?

জন্যে শিখি না, শিখবার জন্যে আমাদের জানতে বাধ্য করা হয়। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাশ আর পরীক্ষা পাশের সার্থকতা ভাল চাকুরী লাভ। ওরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করেছে বলে সমষ্টির জন্যে ব্যক্তিস্বার্থ লোভ, প্রলোভনকে জয় করতে সমর্থ হ'য়েছে।

এ শিক্ষারীতি তিনি স্বদেশে, স্বসমাজে প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন সেই জাতীয় শিক্ষা ও সমাজসেবার মন্ত্রই উচ্চারণ ক'রেছিল। পল্লী সংগঠন ও উন্নয়ন কার্যেও তিনি তাঁর অবকাশের শেষ মুহূর্তগুলি অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করেন। শিক্ষা পদ্ধতি, সমাজ সংস্কারের রীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে চিন্তা ক'রে তিনি সংগঠনমূলক কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করেন। ভাব ও কর্ম শিষ্যদের নিয়ে কাজও আরম্ভ করেছিলেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ বা স্বাজাত্যপ্রেম সম্পর্কে যত কথাই বলি না কেন, তাঁর কাব্যিক সৃষ্টি আমাদের যে প্রেরণাই যোগাক না কেন, কবি ছিলেন শিল্পী ও দার্শনিক। তাই এ ধরার ধূলা ও অন্নবস্ত্রের সমস্যা তাঁকে বার বার আকর্ষণ করলেও বাঁধতে পারেনি। তিনি নিঃসন্দেহে কর্মী ছিলেন, কিন্তু কর্মাবসানই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল নিত্যকে লাভ, আনন্দরূপ মুক্তিকে পাওয়া। তাই কবি বলেছেন—'যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্মকে জয়ী করিব না, কর্মের উপরে জয়ী হইব।'

তাই কবির সব সাধনাকে উত্তীর্ণ ক'রে তাঁর সত্য সুন্দরের সাধনাই বড় হ'য়ে উঠেছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি আমরা লাভ করি। একসঙ্গে এই দুই ভাবের সমন্বয় সাধনে অসমর্থ আমরা একে রবীন্দ্র চিত্তভাবের স্ববিরোধ বলে মাঝে মাঝে ভুল করি। কিন্তু খণ্ডে ও বিচ্ছিন্নে কবি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছে সন্দেহ নেই তবে তাতেই তাঁর দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ থাকতে পারেনি। আবার তা খণ্ডকে অতিক্রম করে অখণ্ডের অভিমুখী ধাবিত হ'য়েছে। তাই তো কবি স্ব-আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী', অথবা জীবনদেবতার উপলব্ধি সম্পর্কে ভাব প্রকাশ করেছেন—'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী'। এ উপলব্ধি সাধক কবি হৃদয়জাত। তাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় দেখি কবি অন্ন চান, বস্ত্র চান, আলো চান—কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ চাওয়া সত্য হ'লেও পাওয়াতে তৃপ্তি নেই। তাই কবি গাইলেন—

মহা বিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা—
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে বারি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে? কবি জানেন না। তাঁর সন্ধানেই কবি, দার্শনিক, সাধক হৃদয়ের অবিশ্রাম ছুটে চলা।

রবীন্দ্রনাথ বাংগালী ও ভারতবাসী কিন্তু তার চেয়ে তাঁর বড় পরিচয় তিনি কবি, তিনি দার্শনিক। ভৌগোলিক সীমারেখায় নির্দিষ্ট ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বের অধিবাসী। স্বদেশবাসীকে ভালবেসেও তিনি বিশ্বপ্রেমিক। মানবের কল্যাণ কামনা করলেও মহামানবের সাধনা তাঁর। স্বদেশের বন্ধনমুক্তি তিনি চান, কিন্তু আত্মার মুক্তিই তাঁর কাম্য। তাই জৈবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা, আরাম, আয়েসের বন্ধনে তাকে বাঁধার প্রচেষ্টা ছিল দেশবাসীর পক্ষে বাতুলতা। তাই বিজ্ঞ সমালোচক মোহিতলালের কথাতেই তাঁর শেষ পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি—'সকল আসক্তির মধ্যেই তিনি নিরাসক্ত, জনতার শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেও সারাপথ তিনি আত্মমনস্ক, তাঁহার জীবনে কর্মানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা আত্মগত ভাবসত্যের প্রয়োজনই অধিক। যে পথ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লয় তাহা আমাদের এই পথ নয়,—তাঁহার সেই পথ ও ঘর একই, তাহার কারণ যে পথে যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ, এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, পথ চলাতেই আনন্দ, তাই পথবাসে ও গৃহবাসে প্রভেদ নাই।

দেখেছিলেম, সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে। (পূরবী)

গভীরতম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গভীরতম ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, একজনের নির্জনতার সঙ্গে আর-একজনের নির্জনতার মিলন—লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলেও যা ঘটে না—তা-ই এই প্রেমের লক্ষ্য, তার কম কিছু নয়।

এ-সব কবিতায় আগাগোড়া একটি সুর বেজেছে—বিনয়ের। বিনয়—যার মানে দীনতা নয়, যাজ্ঞার আত্ম-অবমাননা নয়; বিনয়—যৌবনোচ্ছ্বাসের স্ফীত দম্ভ আকাঙ্ক্ষার উদ্ধত ফণা যা'র কাছে এলে লজ্জায় আনত হ'য়ে পড়ে; অনেক দুঃখ পেয়ে, অনেক ঘা খেয়ে, ভালোবাসার পাত্রকে চিরকালের মত হারিয়ে সেই বিরহকে অমৃতে পরিণত করতে পারলে তবে যা লাভ করা যায়। বিনয়—যা বাইরের ঐশ্বর্য দিয়ে প্রেমকে লজ্জিত করে না, সম্ভোগের কারাগারে তা'কে বন্দী ক'রে রাখে না, অধিকারিত্বের দাবীতে তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে না। Ring and the Book-এর অপূর্ব উৎসর্গে পরিচয় পাই এই বিনয়ের; Asolando-র 'Humility' কবিতায় ব্রাউনিঙ বল্‌ছেন—মেয়েটি এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে যেতে যেতে একটি গুচ্ছ পথে ফেলে দিয়ে গেলো; সেই গুচ্ছটি আমি তুলে নিলাম—কে জানে? হয়তো তা সবচেয়ে তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথও এর বেশি কিছু আশা করেন না:—

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাবো, প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হ'বে না তো আর
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী। ('পূরবী')

পাছে তাঁর প্রেম প্রিয়াকে ব্যথা দেয়, প্রেমের মূল্য নিতে গিয়ে পাছে তিনি তার যথাযোগ্য প্রতিদান দিতে না পারেন, সেই আশঙ্কায় হৃদয় তাঁর ব্যাকুল, সেই ভয়ে প্রিয়ার কাছে প্রেম-নিবেদন কর্‌তে তিনি সাহস পান না—

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে

ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে,
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে ;—('পূরবী')

প্রকৃত পৌরুষের চিহ্ন এই বিনয়—যে পৌরুষ কখনো জোর করে না, কখনো কেড়ে নিতে চায় না ; পথ ছেড়ে দিতে যা সর্বদাই প্রস্তুত। 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিবো না'—এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই সাজে ; কারণ, অন্তরের দুর্বলতা যা'রা বাইরের আড়ম্বর দিয়ে, আসুরিক শক্তির আস্ফালন দিয়ে ঢাকতে চায়, রবীন্দ্রনাথ কখনো তা'দের একজন ছিলেন না। আজকালকার দিনের ফ্যাশ্‌নেবেল্‌ drawing-room cave-man-কে তিনি নিতান্ত উপহাসের বস্তু বলেই জানেন, আবার দু'জনে মিলে mutual admiration society তৈরি করে' পৃথিবীর সব দায়িত্ব আর সংঘাত এড়িয়ে যাওয়াকে তিনি প্রেমের যোগ্য সার্থকতা মনে করেন না। প্রেম মহান প্রবুদ্ধকারী শক্তি—

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
এসেছো প্রেম, এসেছো আজ
কি মহা সমারোহে।—('মহুয়া')

এবং প্রেম যখন এলোই, তখন তাকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করে' পৃথিবী-পলাতক হ'তে কবি চাইলেন না ; মুক্তকণ্ঠে আনন্দে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—

আমরা দু'জন স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়

তুমি আছ, আমি আছি।—('মহুয়া')

পৃথিবীর হাতে দুঃখ পেয়ে প্রিয়ার কাছে আস্‌ব সান্ত্বনার জন্যে; সাংসারিক দুর্যোগ থেকে সে হ'বে মনের আশ্রয়; সমস্ত কাজ, কোলাহল, বাস্তবের নির্মমতা থেকে সে হ'বে মধুর অবসর—প্রেম সম্বন্ধে এই রকম ধারণাই সাধারণত কবিতায় পাওয়া যায়। এই মনোভাব পুরুষের বহুযুগের অন্ধ কর্তৃত্বভোগের ফল। এ-কথা সরল গদ্যে বল্‌লে এই রকম দাঁড়ায়—

সারাদিন আপিসে খেটে-খুটে বাড়ি ফিরে' যেন দেখ্‌তে পাই, তুমি সেজেগুজে, গন্ধ মেখে, থালা-ভরা লুচি সাজিয়ে বসে' আছো; কমিটির মিটিং-এ হেরে গিয়ে যেদিন মন খারাপ হ'ল, সেদিনো তুমি যেন থাকো আমাকে বাহবা দিতে; যেদিন কোনো নির্বোধ আচরণের জন্য সবাই আমাকে উপহাস করছে, সেদিনো আমাকে admire করবে। যে পুরুষ নারীকে তা'র দায়িত্বের, তা'র দুঃখের, তা'র অপমানের সমান অংশ দিতে চায় না, তা'কে শুধু ভালোবাসা খেলার পুতুল সাজিয়ে রাখ্‌তে চায়, সে দুর্বল, সে কাপুরুষ; তা'রি বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর বিদ্রোহ। এই ছেলে-ভুলোনো বিলাসিতার ওপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের ভিত্তি স্থাপন করতে পরাঙ্মুখ; তিনি চান্‌, দু'জনে মিলে' পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে, সব দুঃখ একসঙ্গে মাথা পেতে নিতে, সব দায়িত্ব একত্র বহন করতে। প্রিয়াকে এ-কথা বল্‌বার পরম সাহস তাঁর আছে।—

> সেবা-কক্ষে করি না আহ্বান;—
> শুনাও তাহারি জয়গান
> যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
> চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।—('মহুয়া')

প্রেম পরম প্রবুদ্ধকারী শক্তি—তার সাহায্যে তিনি চান মিথ্যার কুজ্ঝটিকা দীর্ণ করতে, সত্যকে জানতে—

> হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
> কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
> চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
> উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
> হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
> অবসাদ হ'তে লহো জিনি,—

স্পর্দ্ধিত কুস্রাতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।—('মহুয়া')

'ক্লেদঘন চাটুবাক্যে' এ-প্রেম লাভ করা যায় না—তা দুঃসাধ্য, তা দুর্লভ।—

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুন্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লব টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দয় আলোতে।—('মহুয়া')

যে সাহসে, যে শক্তিতে, তিনি এ-কথা বল্‌তে পেরেছেন, তা'রি ওপর নির্ভর করে' প্রিয়ার বিমুখতায় তিনি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েন না ; ব্রাউনিংয়ের কবিতার প্রেমিকদের মত তাঁর অগাধ আত্মবিশ্বাস। তিনি জানেন, এ-বিমুখতা ক্ষণিক :—

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক !
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হ'তে সে জেনো লিখন বিধাতার।—('মহুয়া')

এই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস আছে বলে' প্রেমের আয়ু তিনি জোর করে বাড়াতে চান না ; অসংখ্য দাবী-দাওয়ায়, অনুযোগে-অভিযোগে প্রেমকে তিনি বাঁধ্‌তে চান না ; তাঁর প্রেম মুক্ত, স্বচ্ছন্দবিহারী, নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রেম যখন মরবে, তখন তিনি তা'কে অনায়াসে ছেড়ে দেবেন, তখনো তা'কে ধরে' রাখ্‌বার ব্যর্থ এবং হাস্যকর চেষ্টা তিনি করবেন না। তাই এক কথাতেই তিনি দায়-মোচন করে' দিয়েছেন।—

চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল
এ-কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল ;
তারপর যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,

আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা র'বে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।—('মহুয়া')

সেই 'ক্ষণিকা'র কথাই আবার নূতন করে' বলা—কিন্তু 'ক্ষণিকা'র চেয়ে কত বেশি প্রগাঢ়। এ-সব কবিতায় এমন একটি গভীর বিষাদ আছে, যা সস্তা কারুণ্য নয়, যা সত্যিকারের ট্র্যাজিডির সুর—যে-সুর 'পূরবী'র আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কখনো বাজেনি। 'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল'—ব্রাউনিঙ্-এর 'The instant made eternity !' শুধু এ-পংক্তিই নয়, 'মহুয়া'র অনেক কবিতাই ব্রাউনিঙয়ের তেজস্বী পৌরুষকে মনে করিয়ে দেয়।

'পূরবী'র একগুচ্ছ কবিতা আছে, যা এ-পর্যন্ত এ আলোচনার বহির্ভূত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু যা'র কথা না বল্‌লে প্রবন্ধ অসমাপ্ত থেকে যায়। সেই কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এ কবিতাগুলোকে এক পর্যায়ে ফেলা আমার কাছে যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না। সে কবিতাগুলো সংখ্যায় খুব কম, এবং ভাবে ও সুরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন এই কারণে যে, যে নারীর উদ্দেশ্যে তা'রা রচিত, সে মৃত। মৃতা, অর্দ্ধ-বিস্মৃতা প্রিয়াকে উদ্দিষ্ট তিন-চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের গৌরব, আমাদের গৌরব, বাঙ্‌লা সাহিত্যের গৌরব, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের গৌরব হ'তে পার্‌তো। ব্রাউনিঙ্ Ring and the Book আরম্ভ কর্‌বার আগে তাঁর মৃতা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে যে স্তব রচনা করেছিলেন, শুধু তা'র সঙ্গেই এ-সব কবিতার তুলনা হয়। শীতের হাওয়া কবির মনের কথা এলোমেলো ক'রে দিয়ে তা'কে টেনে নিয়ে চললো সেখানে,

যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি প্রিয়ে,
বসে আছো আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

যে দেখা দিয়েছিলো বলে' প্রথম 'গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিলো ফলে',
কবির শেষ বসন্তের ফসলও তিনি তা'রি কাছে ফিরিয়ে দেবেন—

তোমার চরণ মূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা ব'সে আপন মনে

আঁচল মাথায় দিয়ে।

বহুবর্ষ পর বিস্মৃতির কুয়াশা পার হ'য়ে তাঁর প্রথম প্রেম তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, 'বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের আলোতে' তিনি তা'কে চিনলেন। সেই প্রেম একদিন এসেছিলো—

তাই আমি আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি,—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি'
সব ভুলে গিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষাদের সুর বেজে ওঠে—

আজ তুমি নাই আর, দূর হ'তে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ-জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—

তবু একবার যে পেয়েছিলেন, সে-আনন্দ, সে-গৌরব তাঁর অক্ষুণ্ণ—

সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

তাই ভাগ্যকে অবজ্ঞা ক'রে দৃপ্তস্বরে তিনি বল্‌তে পারেন—

তবু শূন্য শূন্য নয়—

কেননা

ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন,
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' : রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের বিচিত্র ধারার মধ্যে 'বাঁশরী' নাটকটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকখানির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এতই স্পষ্ট যে আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাতেও 'বাঁশরী'র স্বরূপ প্রকৃতি নিয়ে তেমন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়নি। এর কারণ অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। 'বাঁশরী'র সঙ্গে কবির শেষদশকের গল্প ও উপন্যাসেরই যেন একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। 'শেষের কবিতা' থেকে 'ল্যাবরেটরি' পর্যন্ত গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে এই নাটকটির আইডিয়া ও স্বরূপধর্ম নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। তাই 'বাঁশরী', নাটকের আকারে লিখিত হলেও কবির শেষজীবনের কথাসাহিত্যের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। 'শেষের কবিতা' এর চারবছর আগে লেখা, আর এর অব্যবহিত পূর্বচারী হলো একই সমস্যা নিয়ে লেখা যুগল উপন্যাস 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'। এই পর্বের কথাসাহিত্য মিলিয়ে দেখলেই বাঁশরী নাটকের তাৎপর্য অনুভব করা যাবে। তাই এক এক বার মনে হয় বাঁশরী যেন গল্পের আকারে লিখলেই ভালো হতো। কবির মনের মধ্যে যে যে বিষয়টি দীর্ঘকালব্যাপী নানাভাবে লালিত হচ্ছিল, তাকে তিনি একাধিক গল্প-উপন্যাসের আকারে রূপ দিয়েছিলেন। নাটকের মাধ্যমে সমস্যাটিকে কতখানি ফুটিয়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে সম্ভবত কবির কৌতূহল ছিল। বাঁশরী নাটকে কবি সেই পরীক্ষাই করেছেন।

কবির শেষ জীবনের উপন্যাসগুলির মধ্যে যে বিশিষ্ট ধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে, এই নাটকখানির মধ্যেও তার পরিচয় অনুপস্থিত নয়। শেষ জীবনের গল্পে ও উপন্যাসে কাহিনী বিবৃতি ও চরিত্রসৃষ্টির দিকে কবির একেবারেই নজর পড়ে নি। গল্পবিবৃতি ও চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে বিশেষ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। তত্ত্বের খাতিরে ন্যূনতম যেটুকু কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন, সেইটুকুর বেশী তিনি বলেন নি। এইজন্য এইযুগের উপন্যাসের স্বল্প-সংক্ষিপ্ত বিন্যাস ও আয়তনের কৃশতা

একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বক্তব্য প্রতিপাদনের তীক্ষ্ণতা, ঝাঁঝালো ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। অনাবশ্যকের বোঝা এড়িয়ে যেন ধনুশ্চ্যুত তীরের অগ্নিফলকটি ঋজুগতিতে অগ্রসর হয়েছে। 'বাঁশরী' নাটক সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য।

প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। এই দুটি সূত্র অবলম্বন করে নরনারীর জীবনে যে বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হয়, তিনি তাকে নানাদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি আরো স্পষ্টভাবে ও তীক্ষ্ণভাবে সমস্যাটিকে আলোচনা করেন। তিক্ততায় ও নির্মমতায় এ যুগের কথাসাহিত্য তাই বজ্রাগ্নিশিখায় চিহ্নিত। 'শেষের কবিতা' থেকেই তার সূত্রপাত বলা যায়। কিন্তু এই কাব্যোপন্যাসটি রোমান্স ও স্যাটায়ারের যুগ্মলীলাভূমি। প্রেম ও পরিণয়ের তত্ত্বটিকে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়েছে। অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে ভালোবেসেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লাবণ্য অমিতকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হয় নি, তার বদলে সে শোভনলালকে বিয়ে করেছে, যে এক সময় তার 'কাঁকণ পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে' পথের বাইরে ছিটকে পড়েছিল। কারণ লাবণ্য অমিতকে বুঝতে পেরেছে, উপলব্ধি করেছে তার শিল্পীমনের আকাঙ্ক্ষা। লাবণ্যের বুদ্ধিদীপ্ত মন অমিতের সঙ্গে তার সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণ করেছে। সে জানে যে অমিত তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে তার মানসীকে, বিবাহ পরবর্তী জীবনে প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে' শিল্পী অমিতের মানসী-স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হবে। প্রেম ও বিবাহ এ দুয়ের পার্থক্য লাবণ্যের কাছে স্পষ্ট। তাই লাবণ্য স্পষ্টই বুঝেছে: "কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনে করেন। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গড়ে তুলেছেন।...বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" রিয়ালিস্ট লাবণ্য 'রোমান্সের পরমহংস' অমিতকে তার নিরুদ্দেশ কল্লাভিসারের পথে মুক্তি দিয়েছে।

'শেষের কবিতা'র পরে ও 'বাঁশরী'র আগে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি খণ্ডোপন্যাস লিখেছেন, তাদের বক্তব্য ও সমস্যা প্রায় একজাতীয়। 'দুইবোন'-এর সমস্যা 'মালঞ্চে' নির্মম ট্রাজেডির দীপ্তিতে দুঃসহ-সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'বাঁশরী' নাটকে যে সমস্যা বড়ো হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে 'শেষের কবিতা'-র সম্পর্ক নিকটতর

ও নিগূঢ়। শুধু প্রেম-পরিণয় তত্ত্বই নয়, তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কবি যে কৌতুক-কটাক্ষ করেছেন তাও উপভোগ্য। 'শেষের কবিতা' উপন্যাস ও 'বাঁশরী' নাটক ঐ দুটি উপকরণকে শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে। উপকরণ এক হলেও উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষের কবিতায় স্যাটায়ারের অংশটুকু রোমান্স ও গীতিধর্মিতার জ্যোতির্মণ্ডলীতে অনেকখানি আচ্ছন্ন। এখানকার তত্ত্বটির স্বরূপও তাই তীক্ষ্ণ হলেও তিক্ত নয়। কিন্তু বাঁশরী-নাটকে রোমান্সের সেই সূক্ষ্ম বাতাবরণটি নেই, কবি যেন সেই কল্পলোকের উত্তরীয়টিকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে ফেলেছেন, নগ্ন ও নিরাবরণ মূর্তি তত্ত্বটির ধাতব কাঠিন্যকে নির্মম ঔজ্জ্বল্যে রূপ দিয়েছে। সেইজন্যই কবি নাটকের মাধ্যম অবলম্বন করেছেন।

২

'শেষের কবিতা'য় কবি আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত তীব্র মধুর মন্তব্য করেছিলেন, 'বাঁশরী' নাটকে তাকে তীব্রতর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ক্ষিতীশ ভৌমিক এখানে আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি—'গল্প লেখায় খ্যাতনামা', বাঁশরীর ভাষায় 'নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু।' কিন্তু ক্ষিতীশ অমিত রায় নয়, তার চরিত্রের মধ্যে স্বল্পতম ব্যক্তিত্বেরও আভাস পাওয়া যায় না—সে বাঁশরীর হাতের পুতুল মাত্র। চরিত্র ও আচার-আচরণে তার কোনো অসাধারণত্ব নেই, নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে যে অমিত রায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার সামান্যতম ছায়াও ক্ষিতীশ চরিত্রে নেই। মনে হয় কবি এখানে মশা মারতে কামান দেগেছেন। কবির তীক্ষ্ণশর এই ব্যক্তিত্বহীন 'মিডিওকার' ব্যক্তিটির উপর বর্ষিত হয়েছে—কবি যেন অযোগ্য প্রতিনিধির উপর তাঁর শক্তির অপব্যয় করেছেন। আধুনিক সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করতে হলে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকেই গ্রহণ করতে হতো—তা হলে কবির বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি অধিকতর উপভোগ্য হতো। কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ মানুষটির মুখ দিয়ে যখন কথার ফুলঝুরি বর্ষিত হয়, তখন একটি তীব্র অসামঞ্জস্য রসবোধকে পীড়িত করে। চরিত্র-পরিকল্পনার সঙ্গে সংলাপের কোনো মিল হয় নি।

আসল কথা, ক্ষিতীশ চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু দ্বিধার আভাস আছে। ক্ষিতীশ চরিত্রে শোভনলাল ও অমিত রায়ের মিশেল আছে মনে হয়। হঠাৎ দেখলে তাকে শোভনলালের কথা মনে হতে পারে, কিন্তু পরিমার্জিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে খানিকটা অমিত রায়ের আদল পাওয়া যায়। লাবণ্য অমিতের সঙ্গে বিয়ে না

করে শেষকালে শোভনলালকেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছে। বাঁশরীও সোমশঙ্করকে না পেয়ে এক সময় ক্ষিতীশকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। অবশ্য ক্ষিতীশের ভূমিকা শোভনলালের চেয়ে প্রশস্ততর। বাঁশরী চরিত্রকে ফোটানোর জন্য এই চরিত্রের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ক্ষিতীশকে সামনে রেখেই বাঁশরী তার বাগ্‌বিভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছে। এর জন্য ক্ষিতীশ জাতীয় চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

ক্ষিতীশকে কেন দ্বিতীয় অমিত রায় করা হয় নি, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। শেষের কবিতার বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অমিত ও লাবণ্য—দুজনেরই ভূমিকা সমানভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। 'বাঁশরী' নাটকের গতিপ্রকৃতির কেন্দ্রে বাঁশরী চরিত্র। ঝড়ো মেঘের মতো তার বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ আবির্ভাব নাটকের ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আর কোনো চরিত্র যেন দাঁড়ানোরও সুযোগ পায় না, বাঁশরীর প্রবল বাক্যপ্রবাহে তারা ভেসে যায়। লাবণ্য ও বাঁশরীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। লাবণ্যের বুদ্ধির দীপ্তি দাহতে পরিণত হয় নি, প্রেম ও রোমান্সের সঙ্গে এই দীপ্তির সমন্বয়েই তার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য। বাঁশরী চরিত্রে এই ভারসাম্য নেই—তার বুদ্ধির ক্ষুরধার দীপ্তি ও সুচতুর বাগবৈদগ্ধ্য তিক্ততায় ও বিদ্রূপে শানিতোজ্জ্বল। ক্ষিতীশ কোনোমতেই এই বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। অবশ্য ক্ষিতীশের জায়গায় অমিত রায় থাকলে কী হতো তা জোর করে বলা যায় না।

ক্ষিতীশকে বাঁশরী টেনে এনেছে বিলিতি বাঙালি মহলের ফ্যাশনেব্‌ল পাড়ায়—উদ্দেশ্য, ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। ক্ষিতীশ তথা আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে বাঁশরীর অভিযোগ এই যে তাদের সত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই! তাই সে ক্ষিতীশকে বলেছে: "বানিয়ে তোলা লেখা তোমার, বই পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে, তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।...আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখ যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাঁচ্চা করে লিখতে শেখ।" সত্যমূল্য না দিয়ে যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসর জমিয়ে তুলতে চান, তাঁদের হাতে বাস্তব হয় বিকৃত, অথচ তাঁরাই বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যের আধুনিকতার জয়গান করেন। বাঁশরীর একাধিক উক্তির মধ্যে কবির বক্তব্য নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে:

"ক্ষিতীশ বাবু ন্যাচারল হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানে জানা নেই,

দগ্‌দগে রঙ লাগিয়ে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে দেখে দয়া হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহা গহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয় অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী?"

*　　　*　　　*

"প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর! সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোঙরামিকে নয়। লেখো, লেখো, দেরি করো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃদপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চম্‌কে উঠে দেখুক এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো!"

'শেষের কবিতা' রচনার বছর দুই আগে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' (বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রবন্ধটিকে অবলম্বন করে সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক কবির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। সেদিনের তর্কবিতর্কের ঝাঁজালো সুর বাঁশরী নাটকের অন্তরাত্মা রচনা করেছে। কবির দু'একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে; "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানির যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।" (সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে) এই প্রবন্ধ লেখার দশ-বার বছর পরে কবি রিয়ালিজম্ সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়।...বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে।" (সাহিত্যের স্বরূপ) সত্যমূল্য না দিয়ে রিয়ালিজমের ধুয়া তোলার মধ্যে যে কতখানি মিথ্যাচার থাকে, কবি তা তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। রিয়ালিজমের এই ধরনের ধ্বজাধারীরা আসলে সস্তা রোমান্সেরই চর্চা করেন।

৩

বাঁশরী নাটকের কেন্দ্রমূলে বাঁশরীর চরিত্র। বাঁশরী চরিত্রের পরিকল্পনা ও মূলতত্ত্ব আলোচনার আগে অন্যান্য চরিত্র আলোচনা করা দরকার। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যে ক'টি চরিত্রের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় তারা প্রায় একই ছাঁচে গড়া। ক্ষিতীশ ভৌমিককে যারা ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে তুলেছে সেই শচীন-তারক-সতীশ-লীলা-অর্চনার দলও ব্যঙ্গের তুলিতেই আঁকা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক সাহিত্যিকদের বাড়াবাড়ির দিকটা, যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তেমনি 'বিলিতিমার্কা নব্য বাঙালি'কেও বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। তাদের আচার-আচরণও ভব্যতা ও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। এই দু'দলের মধ্যে ঘটকালি করেছে বাঁশরী। শচীনের ভাষায়: "হাই ব্রো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন শিলিগুড়ি এর মধ্যে উনি রেললাইন পাতছেন।" প্রকৃতপক্ষে বাঁশরী নাটকে কবি এই দুই সম্প্রদায়েরই ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। অতি আধুনিক সাহিত্যিক 'হাইব্রো', আর ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়টি হলো 'ফিলিস্টাইন'।

সুষমা সেনদের বাগানের পার্টি থেকেই কাহিনীর শুরু। সুষমাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর অনেকখানি অংশ গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাকে নাটকের চরিত্র হিসেবে কদাচিৎই দেখা যায়—তা ছাড়া কখনো সে নাটকের পুরোভাগে আসে নি। সুষমার রূপের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং—"দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত! রঙ যাকে বলে কনক গৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।" বাঁশরীর মুখেই শোনা যায়, সুষমা পুরন্দরকে ভালোবেসেছিল, তার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নাটকে নেই। সুষমাকে একটি নির্জীব কাঠের পুতুল বলে মনে হয়। পুরন্দরের আইডিয়ার যূপকাষ্ঠে তার এই আত্মবলিদানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঁশরী বলেছে: "প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতে চায় উল্টো মন্ত্রে।" নাটকে সন্ন্যাসীর জাদু প্রত্যক্ষ, কিন্তু প্রকৃতির জাদু একেবারেই তার শক্তি হারিয়েছে। সুষমা চরিত্রকে যদি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সজীব করে তুলতেন, তা হলে কবির প্রেম-পরিণয় তত্ত্বটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারত।

পুরন্দরকে কবি অসাধারণ চরিত্র করে তুলতে চেয়েছেন। তার পিতৃদত্ত নামের সন্ধান কেউ জানে না, সকলেই তাকে 'পুরন্দর সন্ন্যাসী' বলেই জানে। "কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে তাকে গারো পাহাড়ে ভালুক

শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেককাল ছিল।" পান-ভোজন সম্পর্কেও তার বাছ-বিচার আছে বলে মনে হয় না। কখনো গ্রেটইস্টারনে গিয়ে ডাক্তার উইলকক্সকে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়ায়; কখনো রোশেনাবাদের নবাবের মেয়ের বিয়েতে মোগলাই সাজে সজ্জিত হয়; কখনো বা নবাব সাহেবের দলের হয়ে পোলো খেলে; কখনো বা আবার কাশীতে গিয়ে প্রাচ্যদর্শন অধ্যাপনা করে, আবার এই বিচিত্র মানুষটি 'তরুণ সমাজে বিনা মাইনেয় মাস্টারি করে।' আবার বাঁশরীর মুখে শোনা যায় যে এক ডাকঘর-বিবর্জিত দেশে সে তরুণ-তাপস-সঙ্ঘ নামে এক সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে।

পুরন্দর চরিত্রকে রহস্যময় করে তোলার জন্যই কবি তার বিচিত্র পরিচয় দিয়েছেন। এই কৌশলটি তিনি একাধিক জায়গায় প্রকাশ করেছেন। নানা আপাতবিরোধী নেশা ও পেশার জটিল জাল বিস্তৃত করে তিনি এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে সর্বপ্রথম তিনি এই কৌশলটি অবলম্বন করেছেন। জংশন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে যে ব্যক্তি বিচিত্র কাহিনী বলেছেন, তিনি যথার্থই অসামান্য। বেশভূষা দেখে তাকে পশ্চিম দেশীয় মুসলমান বলে ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু এহো বাহ্য—"লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান বেদ ও পার্সিভাষায় আমাদের কোনরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।" বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করে কবি গল্প-কথকের চরিত্রটিকে 'অসামান্য' করে তুলেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পাংশটির ভূমিকা হিসেবে গল্পকথকের রহস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু বাঁশরী তো ক্ষুধিত পাষাণের মতো রহস্য-রোমাঞ্চঘেরা অতীতদিনের স্বপ্নপ্রয়াণ কাহিনী নয়! তবু কেন কবি পুরন্দর চরিত্র রচনায় একই কৌশল অবলম্বন করেছেন? এই প্রসঙ্গ আলোচনার আগে রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরন্দরের যে আর একজন সহযাত্রী আছে তারও উল্লেখ প্রয়োজন। সে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অসাধারণ পুরুষ—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার অবাধ অধিকার। গোটা য়ুরোপ ভ্রমণ করেছে—উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব বিদ্যায় তার সমান দক্ষতা; জর্মান ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ডাক্তারী পাশ করেছে; জুজুৎসুবিদ্যা তার আয়ত্ত; গীতা আওড়াতেও বাধে না। ইন্দ্রনাথ পুরন্দরের মতোই সর্বজ্ঞ।

পুরন্দর ও ইন্দ্রনাথ দুজনের মধ্যেই গুরুগিরির ভাব আছে। তাদের আদর্শবাদের দুরূহ ব্রত ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগের বহু উর্ধ্বে। ইন্দ্রনাথের কাছে এলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সে দেশের কাছে বাগদত্তা, সংসার ধর্ম সে পালন করবে না। পুরন্দর ও সুষমা-সোমশঙ্করের মিলন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে, তা প্রণিধানযোগ্য : "ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ—এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।" বাঁশরীর প্রতি সোমশঙ্করের ভালোবাসা ও পুরন্দরের প্রতি সুষমার অনুরাগ সন্ন্যাসীর আইডিয়ার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়েছে। পুরন্দরের অসাধারণত্বের কথা অপরের মুখেই যা শোনা যায়, নাটকে কখনো তা দেখানো হয়নি। বিচিত্র কিংবদন্তীর আড়ালে পুরন্দর চরিত্রটিকে ঢেকে রাখা হয়েছে। তার যতটুকু অংশ প্রকাশিত, তা নাটকখানির উপর প্রভাব বিস্তার করলেও, আন্তরিক হয়ে ওঠে নি।

"শম্ভুগড়ের রাজা সোমশঙ্করও দেহে-মনে বিচিত্র। তাকে দেখলে মনে হয় টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো তিনশো বছর পেরিয়ে।" মধ্যযুগীয় বেশভূষা আচার-আচরণ বাঁশরীর কল্যাণেই অনেকটা আধুনিক হয়েছে। সোমশঙ্কর আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, সংযত—উচ্ছ্বাস ও আবেগের আতিশয্য তার চরিত্রে অনুপস্থিত। এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে কবি অ-বাঙালীর কথা ভেবেছেন। দেহে-মনে বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে গিয়ে গোরাকে আইরিশ নায়ক করে সৃষ্টি করেছেন, সোহিনীকে করেছেন পাঞ্জাবী মেয়ে। সোমশঙ্করের মহিমাগম্ভীর আভিজাত্য ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীদের কেতা-দুরস্ত লঘুচপল জীবনের মধ্যে এমন তীব্র বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে, তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে সতীশ-শৈলর সংক্ষিপ্ত দৃশ্যটি (দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শেষার্ধ) কৌতুকে-মাধুর্যে সমুজ্জ্বল। শৈল চরিত্রটি যেন এই সমাজের মধ্যে একটি প্রবল ব্যতিক্রম। 'বাঁশরী' নাটকের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতৃপ্তি ও তিক্ততা যে তপ্ত হাওয়ার ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করেছে শৈল চরিত্রটিকে তা যেন স্পর্শ করতে পারে না। মমতায় ও স্নিগ্ধতায় সে নিজেই একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করেছে। ক্ষিতীশ যখন এই দলের পাল্লায় পড়ে চারিদিক থেকে বাক্যবাণে জর্জরিত হচ্ছিল, তখন একমাত্র শৈলই তার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। অতি-আধুনিক প্রেয়সীদের রাজ্যে শৈলই বোধহয় একমাত্র গৃহিনীসত্তা। শৈল তাই

সতীশকে বলেছে: "তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে! আমরা যা শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুশি হয় না কেন?" 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'—এ তত্ত্বটি শৈলের কাছে খুব তৃপ্তিদায়ক নয়। শৈল কবির দুই নারী তত্ত্বের 'মায়ের জাতে'র মেয়ে।

৪

'বাঁশরী' নাটকের প্রাণকেন্দ্র বাঁশরী চরিত্র। সমস্ত নাটকের মর্মমূলে তার ব্যক্তিত্বের আগ্নেয় ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ব্যঙ্গ-পরিহাসে তিক্ততায়-দীর্ঘশ্বাসে মর্মবেদনায় এই চরিত্রটি সমস্ত নাটকে এক তীব্রগতির সঞ্চার করেছে। বিদীর্ণ আগ্নেয় গিরির গলিত লাভাস্রোত যেন অগ্নিকটাক্ষে নাটকটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নাটকটি আরম্ভ হয়েছে বিদ্রূপের সুরে, কিন্তু শেষ হয়েছে অশ্রুগম্ভীর মহিমায়। নাটকের এই রূপান্তরের মূলেও বাঁশরী চরিত্রের স্বরূপ। যে বাঁশরী শ্লেষচতুর কণ্ঠের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে নাটকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে, সেই বাঁশরীই নাটকের শেষদৃশ্যে অবরুদ্ধ বেদনায় সীরিয়াস হয়ে উঠেছে—তার সমস্ত বিদ্রোহ পুরন্দরের পায়ে লুণ্ঠিত সশ্রদ্ধ প্রণামে পরিণত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'বাঁশরী' নাটকে কবি প্রেম-পরিণয় তত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন। প্রেম ও পরিণয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি, এই চিরন্তন প্রশ্নটি বহুবার রবীন্দ্রচিত্তে আন্দোলিত হয়েছে। সম্ভবত, 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার কাল থেকেই এই প্রশ্নটিকে তিনি নানাভাবে বিচার করেছেন। প্রিয়া গৃহিনীতে পরিবর্তিত হলে প্রেমের পূর্বতন রূপটি অব্যাহত থাকে কি না? কারণ প্রণয়িনী ও গৃহিনীর ভূমিকা স্বতন্ত্র। গৃহলক্ষ্মীকে বিবাহের মন্ত্রে বরণ করতে হয়, বিবাহ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক। কিন্তু প্রেম মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, তাঁকে বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। প্রেমের এই সীমাহীন রহস্যরসকে কি গৃহজীবনের সীমার মধ্যে আস্বাদন করা সম্ভব নয়? প্রেয়সীকে গৃহিণীতে পরিণত করলে কি প্রেমের পূর্বমহিমা থাকে? অসীম প্রেমানুভূতিকে বিবাহের সীমায় আবদ্ধ করার কি কোনো উপায়ই নেই? প্রেম ও বিবাহের সমন্বয় সাধন করা জীবনের দিক থেকে কতখানি সম্ভব? নারী ও পুরুষ—এই দুপক্ষের এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য আছে কি না? প্রেম ও পরিণয়ের বিচিত্র সমস্যা রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাদিক থেকে আলোচিত হয়েছে।

বাঁশরী সোমশঙ্করের মধ্যযুগীয় আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিমার্জিত

করে অনেকখানি আধুনিক করে তুলেছে। পুরন্দর সোমশঙ্করকে বাঁশরীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন 'ব্রাহ্মসমাজের আঙটি বদলের সভায়'। এদিকে সুষমা পুরন্দরকে ভালোবাসে, কিন্তু সোমশঙ্করের সঙ্গে সুষমার বিয়ে হলো। বাঁশরীর সঙ্গে সোমশঙ্করের মিলনের প্রধান অন্তরায় হলেন সন্ন্যাসী পুরন্দর। সোমশঙ্করকে তিনি যে কঠিন ব্রতে দীক্ষিত করেছেন, পাছে সে ব্রতভঙ্গ হয়, এইজন্যই সন্ন্যাসী বাঁশরীর কাছ থেকে সোমশঙ্করকে দূরে সরিয়ে নিলেন। সুষমার সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহের কারণ সোমশঙ্করই পুরন্দরকে শুনিয়েছে: "এতদিন তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, 'আমারই' পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে"।

কিন্তু কবি যে সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, তার সমাধান কোথায়? সন্ন্যাসী পুরন্দরের আইডিয়ালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সোমশঙ্কর-সুষমার ব্রতধর্মী বিবাহ কতদিন তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ পরিক্রমা করতে পারবে? প্রেম ও পরিণয়ের সমন্বয় সম্ভব নয়, তাই কি কবি প্রেমহীন বিবাহকে আদর্শের প্রলেপ দিয়ে এক উন্নত ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে কবি 'শেষের কবিতা'র মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য অমিত বলেছে—"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে-ভালাবাসা, সে রইলো দীঘি' সে ঘরে আনবার নয়,—আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" অমিত প্রেমের কল্পলোকে বিচরণ করে—তাই সে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়ক্ষেত্রেই রোমান্স ঘটাতে চায়। রোমান্সের জগতে 'তোলাজল' ও 'দীঘি'র মধ্যে পার্থক্য না থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে আছে।—বাস্তব জগতে জীবনকে এমন কৃত্রিম ভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু লাবণ্যের এ বিষয়ে কোন মোহ ছিল না। তাই তারপক্ষে অমিতকে ভালবেসেও শোভনলালের গলায় বরমাল্য দেওয়া সম্ভব হলো। লাবণ্য জানে যে 'প্রত্যহের ম্লানস্পর্শে' অমিতের একদিন মোহভঙ্গ হবে—রোমান্সের ইন্দ্রধনু বাস্তাবের প্রখর সূর্যালোকে কোথায় মিলিয়ে যাবে। তাই অমিতের উদ্দেশ্যে অপরিবর্তন অর্ঘ্য রেখে 'পরিবর্তনের স্রোতে' ভেসে চলা তার পক্ষে সম্ভব হলো।

বাঁশরী ক্ষিতিশকে তীক্ষ্ম ভাষায় শুনিয়েছে: "তোমরা আবার রিয়ালিস্ট"। রিয়ালিস্ট মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি!

পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাই নে। রঙ্ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব! ভাল কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের। এথীনা! মিনার্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়ালিস্ট, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ, পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা মিনার্ভা।"

বাঁশরী ঝাঁঝালো ভাষায় মেয়েদের বাস্তবদৃষ্টিকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে আর কোন মেয়ে সে ভাবে বিশ্লেষণ করেনি। কিন্তু মূলত লাবণ্যের সঙ্গে বাঁশরীর কোন পার্থক্য নেই। বাঁশরী চরিত্রের তিক্ততা ও ঝাঁঝালো অভিব্যক্তি লাবণ্য চরিত্রে অনুপস্থিত হলেও জীবন সম্পর্কে দুজনের সিদ্ধান্ত একই। লাবণ্যও রিয়ালিস্ট—প্রখর বাস্তববুদ্ধির সাহায্যে সে বুঝেছে যে, অমিত জাতীয় 'রোমান্সের পরমহংস'দের সঙ্গে ঘর বাঁধা সম্ভব নয়। অমিত লাবণ্যের কাছে বিবাহোত্তর জীবনের যে ছবি এঁকেছে, তা মোহরঞ্জিত ও রোমান্টিক। এমন পুরুষকে কোন মেয়েই বরমাল্য দিতে স্বীকৃত নয়, আর লাবণ্যের মতো বুদ্ধিমতী মেয়েদের তো কোন কথাই নেই। সে জানে যে অমিত শুধু বাক্যবিলাসী—এই বাক্‌শিল্প দিয়েই সে একটি জগৎ রচনা করেছে। লাবণ্য এ কথাও জানে যে, তার যে সত্তাকে অমিত রচনা করেছে, বিবাহোত্তর জীবনে প্রত্যহের ধূলিস্পর্শে তার রঙ্ ফিকে হয়ে যাবে। অমিতের সে স্বপ্ন যে লাবণ্যেরই বিজয়িনী সত্তা। তাই সে তাকে ধূলিলুণ্ঠিত করতে রাজী নয় প্রেম ও বিবাহ—কোনটিকেই সে অস্বীকার করেনি, কিন্তু তার সতর্ক বিচারশক্তি ও জীবন সম্পর্কিত ভারসাম্যময় দৃষ্টি এই দুই বিপরীত জগৎকে এক করার চেষ্টা করেনি।

নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা হলো সুষমা সোমশঙ্করের বিবাহ। এই নাটকে বিবাহের বর্ণনা আছে; কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনকে অনুমান করাও খুব দুরূহ নয়। সোমশঙ্করকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার পিছনে সুষমার কোনো হৃদয়াবেগের তাগিদ ছিল না। নিতান্ত যন্ত্রের মতো সে পুরন্দরের আদেশ পালন করেছে। সোমশঙ্কর পুরন্দরকে এই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে: "এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।" কিন্তু

এই যে আইডিয়ালিজম, তা কতদিন তরুণ-তরুণীর প্রেমহীন মিলনের যান্ত্রিকতাকে ভুলিয়ে রাখবে? বাঁশরী এই আইডিয়া-সর্বস্ব বিবাহের অন্তঃসারশূন্যতাকে তীক্ষ্ণতম ভাষায় ব্যঙ্গ করেছে: "সেইজন্য সজীব নয় তোমার আইডিয়া সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, তুমি জানো না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার, পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে।" কবি যেমন আইডিয়াকে ভালবাসার সঙ্কেত দিলেন, তেমনি বাঁশরীর সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহ না দিয়ে তাদের মোহ ভঙ্গের তীব্রতম আঘাত থেকে উদ্ধার করলেন।

৫

প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বৈচিত্র্যকে বাঁশরী অনন্য সাধারণ প্রত্যয় ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছে। সোমশঙ্করের ব্রত বজায় রেখে বাঁশরীর সঙ্গে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। কারণ বাঁশরী চরিত্র এই ব্রতপালনের নির্মমতম প্রতিবাদ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাঁশরী অতিমাত্রায় ক্রিটিক্যাল। জীবনকে বুদ্ধির ছুরি দিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তার প্রতিটি শিরা-উপশিরাকে সে দেখতে অভ্যস্ত। এই জাতীয় জীবনদৃষ্টিই তাকে সংশয়াতুর করে তুলেছে। সাদা চোখেই সে জগৎটাকে দেখতে অভ্যস্ত। তার পক্ষে একটি অশরীরী আইডিয়ার সেবা করা সম্ভব নয়। এই জাতীয় চরিত্রের পক্ষে তথা-কথিত সংসারধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। বাঁশরীর এই মোহমুক্ত পাকা রিয়ালিজম ও সংশয়কণ্টকিত মন তাকে দুঃখ দিয়েছে। সে এই দুঃখকে বহন করেছে, কিন্তু সুলভ সহজ বিবাহবন্ধনের মধ্যে সে আত্মসমর্পণ করে নি।

কিন্তু বাঁশরীর এ বেদনারও একটি ইতিহাস আছে। সোমশঙ্করের প্রেমে তার আত্মপরিচয় ঘটেছিল। অতি সংক্ষিপ্ত আতিশয্যহীন একটি উক্তির মধ্যে বাঁশরীর সেই বেদনার নীলকান্ত মণিখণ্ডটি গাঁথা হয়ে আছে: "আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণ রঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে, তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল। বাস্, দুই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দুজনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।"

বাঁশরী এই উক্তির সঙ্গে লাবণ্যের শেষ চিঠির কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে:

"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়,
হে বন্ধু বিদায়।"

কিন্তু বাঁশরীর উক্তির মধ্যে লাবণ্যের কাব্যমাধুর্য মণ্ডিত বিদায়-সম্ভাষণ অনুপস্থিত! বরং সেখানে বেদনাকে গোপন করে প্রেমের দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলার একটি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। বাঁশরী চরিত্রের এই ইতিহাসটুকু জানা থাকলে তার অন্তর্জ্বালা, স্তম্ভিত বেদনা, তিক্ততা ও হাহাকারের একটি সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করা যায়! সুষমা পুরন্দরের সম্পর্কটি আলোচনা করতে গিয়ে বাঁশরী নারী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছে তার অননুকরণীয় ভাষায়:

"চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালবাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ, সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাটফর্মে নামে সেই গরীবের জন্য থার্ডক্লাস্, বড়ো জোর ইণ্টারমীডিয়েট্। সেলুন গাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপোশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে উঠল মধ্য গগনে, দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল একটা শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখো নি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড়!"

* * *

"...মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।"

বাঁশরীর এই বিশ্লেষণটি শুধু সুষমা সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, পুরন্দরের ব্যক্তিত্ব ও ঔদাসীন্য সম্ভবত তার মনের উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু কবি 'সাইকোলজির অতি সূক্ষ্ম মহলের কুলুপ দেওয়া ঘর'-এর 'নিষিদ্ধ দরজা' ইচ্ছা করেই খোলেন নি। কারণ তা হলে নাটকটি জটিল হয়ে উঠত, লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে বাঁশরী দৃপ্তা ভুজঙ্গিনীর মত দাঁড়িয়েছে। সোমশঙ্করকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই কি তার একমাত্র কারণ? সম্ভবত সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে তার আর একটি অভিযোগও আছে। সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য তাকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছে। কারণ বাঁশরী যে জাতীয় মেয়ে, তার পক্ষে প্রেমের লাঞ্ছনার চেয়ে ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনা আরো বড়ো। সন্ন্যাসী তার সেই স্পর্ধিত সমুচ্চ ব্যক্তিত্বকেই

নির্মমতম আঘাত হেনেছে। রবীন্দ্রনাথ বাঁশরী চরিত্রের এই সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াটি নিপুণ রেখায় এঁকেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বাঁশরী পুরন্দরের কথোপকথনের মধ্যে কবি প্রেম-ভালোবাসার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। পুরন্দর বলেছে: "ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।" প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা তত্ত্ব বা আইডিয়ার দিক থেকে সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে এই দুয়ের সীমারেখাকে সুস্পষ্ট করে তোলা যায় কি? কিন্তু বাঁশরীর তীক্ষ্ম যুক্তির বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীও নূতন যুক্তি দিতে পারে নি—শুধু তার ব্রত যে সবচেয়ে বড়ো, সেই কথাই উল্লেখ করেছে। সন্দেহ হয়, যে ব্রতের কথা বলতে গিয়ে এই অসাধারণ মানুষটি তার সামান্যতম যুক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, তা কি আসলে একটি বিশেষ ধরনের মোহ নয়? সন্ন্যাসীর বড়ো তার আইডিয়া—এই আইডিয়াই তার সৃষ্টি। কিন্তু রিয়ালিস্ট বাঁশরী—শুধু বাঁশরীই বা কেন, কোনো মেয়েই আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিতে রাজী নয়। বাঁশরী শেষবারের মতো সুষমাকে সতর্ক করে দিয়েছে: "আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস্—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।" আইডিয়া ও রিয়্যালের এই দ্বন্দ্বে সোমশঙ্করের ব্রত ভঙ্গ হতো—তাই সন্ন্যাসী নবীন ব্রতচারীকে বাঁশরীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল।

শেষ দৃশ্যে বাঁশরীর অবরুদ্ধ বেদনা মেঘমন্থর আকাশের মতো বজ্রবিদ্যুতের নির্মম রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষিতীশকে ক্ষণিক খেয়ালে বিবাহের সম্মতি দিয়েই সোমশঙ্করের প্রেমের আশ্বাস পেয়ে আবার তা ফিরিয়ে নিয়েছে। বাঁশরীর এই দোলাচলচিত্ততা তার অন্তর্জ্বালার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। তীক্ষ্মতম কৌতুকে, নির্মম পরিহাসে, নির্মোহ জীবন বিশ্লেষণে, অবিচলিত প্রত্যয়ে, কঠিন বেদনার গোপন লালনে বাঁশরী অনন্যা। দেবযানী ও সোহিনী চরিত্রের সঙ্গে তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, স্পর্ধিত দুঃসাহস ও দুঃসহ অন্তর্জ্বালার খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বাঁশরী চরিত্রের পরিণাম চরিত্রানুযায়ী হয় নি। সোমশঙ্করের কাছে সে ক্ষত্রিয়ের মতো ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়েই পরিতৃপ্ত হয়েছে,—সন্ন্যাসীর পায়েও তখন তার স্পর্ধিত শির নত হয়েছে। এই তুচ্ছ পরিণাম বাঁশরী চরিত্রের উপযুক্ত

নয়। বেদনাহত হৃদয়ের বহ্নিদীপ্তির মধ্যে যদি নাটকের উপসংহার হতো, তা হলে বাঁশরীর চরিত্রটি অধিকতর মহিমা লাভ করতো। কারণ গৃহ-দীপের স্নিগ্ধতা বাঁশরীর নয়—ধূমকেতুর মতো অসহ্য আত্মরতির আগুনে দগ্ধ হওয়াই তার যথার্থ জীবন-পরিণাম। ভীরু আত্মনিবেদনের নম্রতা তার চরিত্রের যথোপযুক্ত পরিণাম নয়।

রবীন্দ্রজননী সারদা দেবী : দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের জননী সারদা দেবীর (১৮২৬-১৮৭৫) কোনও জীবনী রচিত হয়নি। তবে তাঁর পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রকন্যাদের বিভিন্ন স্মৃতিমূলক রচনায় যে সব টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি আছে সেগুলির সমাহারে তাঁর মোটামুটি একখানি চিত্র গড়ে তোলা অসম্ভব হয় না।

১৮৩৪-এর ফাল্গুন মাসে ছয় সাত বছর বয়সে সারদা দেবী দ্বারকানাথের পুত্রবধূ-রূপে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে 'পিরালী' পরিচয় থাকায় খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি গ্রাম থেকে কন্যা আনয়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সারদা দেবীর বাবাও রামনারায়ণ চৌধুরীও পিরালী শাখাশ্রিত ছিলেন।

সারদাদেবী পনেরোটি সন্তানের জননী হয়েও সুচারুরূপে এই বৃহৎ ধনী পরিবারের সকল কর্তব্য পালন করেছেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্তঃপুরে লেখাপড়ার চলন ছিল। সারদাদেবী এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'মাতাঠাকুরাণীও কাজকর্মের অবসরে একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্য শ্লোক তাঁর বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল। প্রায়ই বইখানি হাতে লইয়া শ্লোক-গুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোনো না কোনো দাদার ডাক পড়িত।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

'পৃথিবীসুদ্ধ লোক কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি। ...মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়াছে; তাই আর সকলকে বিস্মিত

করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি। তখন মনে মনে সমূহ বিপদ গণিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোন মতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন 'রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্‌না, পড়িতেই হইল।'

স্বামীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। স্বামীর অপ্রিয় কোনো কাজ তিনি কখনো করেননি। স্বামীর মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাই তাঁর ধর্ম ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০) লিখেছেন :

'মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে তিনি সর্বদাই চিন্তিত হইয়া থাকিতেন।'

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-বর্ণিত একটি তথ্য উৎকলনযোগ্য :

'বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন।...এই জন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, 'রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো'। মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।'

সৌদামিনী দেবী তাঁর মাতৃদেবীর স্বামীর প্রতি গভীর আনুগত্যের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

'পূজার সময় কোনো মতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা, গান, আমোদ যতকিছু হইত, তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে যোগ দিতেন না। কাকীমারা আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।'

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনেও তিনি সঙ্গিনী হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৪২-১৯২৩ সহধর্মিনীজ্ঞানদা-নন্দিনী (১৮৫২-১৯৪১) লিখেছেন:

'আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত। মহর্ষি থাকলে তিনিই উপাসনা করতেন। তখন মাও গিয়ে বসতেন।'

সারদা দেবী শাশুড়ী রূপে পুত্রবধূদের খুব ভালোবাসতেন, আদর যত্ন করেছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখছেন:

আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ী, ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পরে শাশুড়ী-মা আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। আমরা মেয়েরা বউরা সকলেই ঠিক তাঁর কথা মত চলতুম। আমি বড্ড রোগা ছিলুম তাই তিনি আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর তাঁর সেই সুন্দর চাঁপাকলির মত হাত ভরে দিয়ে খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি রেলিঙের ধারে গিয়ে বমি করব:

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের (১৮৪৫-১৯১৫) সহধর্মিনী প্রফুল্লময়ী দেবীও তাঁর শাশুড়ী সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। প্রফুল্লময়ী দেবী বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭০-৯৯) জননী। তিনি সারদাদেবী সম্পর্কে লিখেছেন:

'[বিবাহের পর] বাড়ীর ফটকের সামনে গাড়ীখানি থামিল সেই সময় আমার শাশুড়ী জলের ধারা দিয়া পান-সন্দেশ মুখের মধ্যে দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দোতলায় আনিয়া আমাদের দুজনকে মসলন্দের উপর বসান হইল এবং সেইখানেই বিবাহের নানারকম অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইল। বিবাহের আটদিন পরে যখন বাপের বাড়ি যাই, সেইদিন শাশুড়ী নিজে গহনা পরাইয়া আমাকে সাজাইয়া দিলেন। তাঁর নিজের একটি চুণী মুক্তোর নথ ছিল সেইটি আমার নাকে পরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেটি এত ভারি ছিল যে পরিতে গিয়া আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। [বলেন্দ্রনাথের জন্মের পর] আট দিনের দিন আমার শাশুড়ী ছেলের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য বাড়ীর যত দাসদাসী ছিল সকলকেই তেল দিয়া এক একটি কাঁসার বাটি দান করেন। শাশুড়ী বলুকে বড় ভালোবাসিতেন।'

বলু যখন ছোট ছিল, তখন আমার শ্বশুরের চলার নকল করিত। আমার শাশুড়ী তাই দেখিতে খুব ভালবাসিতেন এবং ডাকিয়া আনিয়া দেখিতেন।...আমার

শাশুড়ীর মৃত্যুতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। শাশুড়ীর মত শাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁহার মতন সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মে মতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কেহ যদি তাঁহার সাক্ষাতে পুত্র কন্যাদের প্রশংসা করিত, তখন তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁহার অহঙ্কার জাগে। এই সময়ে আমাদের বাড়ীতে পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর যখন পূজার দালানে বসিয়া উপাসনা করিতেন তখন তিনিও অধিকাংশ সময় তাঁহার পাশে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। তাহা ছাড়াও জপ করিতে দেখিয়াছি। অত বড়ো বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহারই উপরে ছিল। তিনি প্রত্যেককে সমান ভাবে আদরযত্নে অতি নিপুণ ভাবে সকলের অভাব দুঃখ দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোনো বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। অত বড়োলোকের পুত্রবধূ ও গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মনে কোনরকম জাঁক বা বিলাসিতার ছায়া স্থান করিতে পারে নাই। যতদূর সম্ভব সাদাসিদা ধরণের সাজ পোষাক পরিতেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার দেহের সৌন্দর্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত।'

আত্মীয়-পরিজনদের তিনি কেমন যত্ন করে খাওয়াতেন, আদর যত্ন করতেন তাঁর একটি মোহন পরিচয় দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ :

'আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তা দিদিমার সে ছবি, ভিতর দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারি সবুজ রঙের, পঙ্খের কাজ করা মেঝে, কার্পেট পাতা, এক পাশে একটি পিদিম জ্বলছে—বালুচরী শাড়ি পরে, সাদা চুলে লাল সিঁদুর টক্‌টক্ করছে—কর্তা দিদিমা বসে আছেন তক্তপোশে। রামলাল শিখিয়ে দিত, আমরা কর্তা দিদিমাকে পেন্নাম করে পাশে দাঁড়াতুম; তিনি বলতেন, আয় বোস্ বোস্। কর্তা দিদিমা রামলালের কাছে সব তন্ন তন্ন করে বাড়ির খবর নিতেন। তিনি ডাকতেন, ও বউমা, ওদের এখানেই আমার সামনে জায়গা করে দিতে বলো।...কর্তা দিদিমা কাছে বসে বলতেন, বউমা, ছেলেদের আরো খানকয়েক লুচি গরম গরম এনে দাও, আরো মিষ্টি দাও। এই রকম সব বলে খাওয়াতেন, বড়োদের মতো আদর যত্ন করে। আমরা খাওয়া দাওয়া করে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে আসতেম।"

এই ভরা সুখের সাজানো সংসার রেখে একদিন সারদা দেবী স্বর্গলোকে চলে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'কর্তা দিদিমা আঙুল মটকে মারা যান। বড়ো পিসিমার ছোটো মেয়ে, সে তখন বাচ্ছা, কর্তা দিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে কেমন করে মটকে যায়। সে আর সারে না, আঙুলে আঙ্গুল হাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জ্বর হতে লাগল। কর্তা দিদিমা যান-যান অবস্থা। কর্তা দাদামহাশয় ছিলেন বাইরে—কর্তা দিদিমা বলতেন, তোরা ভাবিসনে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না, তোরা নিশ্চিন্ত থাক। কর্তা দাদামশায় তখন ডালহৌসি পাহাড়ে···অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন সময়ে কর্তা দাদামহাশয় এসে উপস্থিত। খবর শুনে সোজা কর্তা দিদিমার ঘরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, কর্তা দিদিমা হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

"যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কতরাত্রি জানিনা, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বউঠাকুরানী (কাদম্বরী দেবী) তাড়াতাড়ি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গনে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।'

সৌদামিনী দেবী প্রদত্ত বর্ণনাটি অবনীন্দ্রনাথ কথিত বর্ণনাটির সঙ্গে মিলে যায় :

'যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে ক্ষণে ক্ষণে মা চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন "বসতে আসন দাও।" পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, 'আমি তবে চললেম।' আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ

শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুলচন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম'।

মাতৃদেবীর তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিশীথ-স্বপ্নে একবার মায়ের দেখা পেয়েছিলেন, সেই স্মৃতি তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষায় বিবৃত করেছেন:

'আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বাল্যকালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে— আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন "তুমি এসেছ!" এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।'

রবীন্দ্র জননী সারদা দেবীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হল। কবি নিজে মাতৃবন্দনা'য় লিখেছেন:

'হে জননী ফুরাবেনা তোমার যে দান
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সেতো তব আশীর্বাদ॥'

এর চেয়ে বড়ো প্রণাম আর কী হতে পারে?

উল্লেখপঞ্জী: ১: স্বর্ণকুমারী দেবী—আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার, প্রদীপ, ১৩০৬ ভাদ্র। ২: সৌদামিনী দেবী—পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ কার্তিক। ৩: ইন্দিরা দেবী—৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন। ৪: প্রফুল্লময়ী দেবী—আমাদের কথা, প্রবাসী ১৩২৭ বৈশাখ। ৫: ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬: জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ। ৭: সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত—'আগমনী' ১৩২৬।

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী : ভবানী সেন

সামাজিক পটভূমিকা :

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সম্পূর্ণ মহাযুগ। কবিগুরুর জন্মকালটি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি মহাসন্ধিক্ষণ। ১৮৫৭ সালের জনবিদ্রোহ যে আগুন জ্বেলেছিল তা তখন নির্বাপিত, কিন্তু তার স্মৃতি তখনও জাগরূক। জাতীয় জাগরণের জন্য ভারতীয় জনমনের মর্মস্থলে তখন যে অস্পষ্ট রূপরেখা রচিত হচ্ছিল, নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তা ভরপুর, পুরাতনের সংগে নূতনের বোঝাপড়া তখন প্রত্যাসন্ন। ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক প্রগতি কোন্ পথ ধরে চলবে, কোন্ পথে হবে নূতন জাতি-সৃষ্টি এই আত্মচিন্তা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তারপর একশ' বছর পরে আজ দেখা গিয়েছে নূতন আত্মচিন্তা,—স্বাধীন ভারত কোন্ পথ ধ'রে এগোবে। মাঝখানে পড়ে রইলো যে একশ' বছরের ইতিহাস তার প্রতিটি অধ্যায় কবিগুরুর বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমাজের নবীনতম মহাজাতিরূপে উদয়ের পথে সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে মহাকবির গীতিকাব্য তাকে সর্বদা সজীব ক'রে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন যখন সুরু হয়, বাংলায় তখন নূতন চেতনা, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রসোপলব্ধি এবং নূতন গণঅভিযান ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করছে। ইতিহাস সুরু করে দিয়েছে "আধুনিক" যুগের সৃষ্টির কাজ।

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ও কালীপ্রসন্ন, টেকচাঁদ ও অক্ষয়কুমার ইতিপূর্বেই বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নবযুগের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন, সমাজ-সংস্কারকেরা উদ্যমে ও কর্মপ্রবাহে মধ্যযুগীয় সামাজিকতাকে আঘাত করেছেন, তুলে ধরেছেন নূতন সমাজের প্রগতিশীল লক্ষ্যকে; তারই পাশাপাশি উপর্য্যুপরি কৃষকবিদ্রোহ থেকেও তখন জন্ম নিয়েছিল নূতন সমাজের নূতন

ভাবজগৎ। সে যুগের নীলবিদ্রোহ এবং একাধিক প্রজাবিদ্রোহ প্রতীক ওই ভাব-সম্পদ্ হয়ে পড়তো বন্ধ্যা।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, এই ত্রিশ বছর ধ'রে ভারতে পুরাতনের সংগে নূতনের যে তীব্র সংগ্রাম চলে তারই ভেতর দিয়ে তখন জন্মগ্রহণ করছিল এক সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি, ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলন হলো তারই সহজাত শক্তি; তারই পুরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এক ইতিহাস। এই আবির্ভাব আকস্মিক নয়, অলৌকিক নয়; প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সমাকূল এক ঐতিহাসিক মহাযানে রবীন্দ্রসৃষ্টির এই সমারোহময় উদ্বোধন যেমন প্রত্যাশিত, তেমনই স্বাভাবিক। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র একটি যুগ।

রবীন্দ্রযুগ হলো বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের উত্থান এবং অবসান,—এই তুইটি যুগের সমষ্টি, তাঁর সৃষ্টিশীল সাধনা ছিল ইতিহাসের একটি নয় তুইটি বিশিষ্ট যুগে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মানুষ তখন যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে মহাকালের যাত্রাপথ অনুসরণ ক'রে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান্ শিল্পী, সৃষ্টিশীল মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো যুগের সমগ্র সত্বাকে প্রতিফলিত করা। তাই সেই যুগের সমস্ত সত্বা, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত ধারা তাঁর বিপুল এবং ব্যাপক সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান। বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃতির ওপর মানুষের জয়যাত্রা যখন সুরু হয়ে গেছে, অথচ সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত বিজয়োল্লাসে বহু জাতির স্বতন্ত্র সত্বা যখন বিলুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সৃষ্টির কাজ সুরু করেন, আর যেদিন এই মহান্ শিল্পীর সৃষ্টির ওপর যবনিকা পড়লো সেদিন সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষ সংকট সমুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ইতিহাসের তুটো যুগ দেখে গেছেন। সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে ধনিকসভ্যতা যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, আবার ধনিক-সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রথম ভিত্তি যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—এই তুটো যুগ ধ'রেই রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্প সৃষ্টি করেছেন এবং যথাসম্ভব অংশ গ্রহণ করেছেন জাতীয় জীবনের নানাবিধ প্রগতিশীল আয়োজনে। তিনি দেখেছেন বৃটেনে ধনতন্ত্রের উদীয়মান সৃষ্টিশীল অবদান, তিনি দেখেছেন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অভিযান, তিনি দেখেছেন সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির বহু অভ্যুত্থান; তুই তুটো সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ, সোভিয়েট রাশিয়ার

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট—এ সবই ছিল তাঁর সৃষ্টির উপাদান। ইতিহাসের এই দ্বন্দ্বসমাকুল আবর্তন দেখাবার মত দৃষ্টি তাঁর ছিল, ছিল অনুভব করার মত প্রাণ এবং সেই অনুভূতি প্রকাশ করার শক্তি। তাই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব, যার মূল্য ও সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবার নয়, ইতিহাসের রথচক্রতলে যা কখনও পিষ্ট হবে না, চির-অম্লান যার মাধুর্য যুগযুগান্ত ধ'রে মানুষের অন্তরাত্মাকে বলদীপ্ত করতে সক্ষম।

ধনিকসভ্যতার সৃষ্টিশীল পর্বের প্রদোষকালে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি সুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্তে; তাই তাঁর সংস্কৃতিতে পাই দুই সভ্যতারই ঐতিহাসিক মর্মবাণী, তাই তাঁর সংস্কৃতি সর্বদা সৃষ্টিশীল, সর্বদা বৈচিত্রময় এবং সর্বদা যুগসীমা অতিক্রান্ত। মহান শিল্পীর সৃষ্টিতে এ' দুই যুগের নৈতিক বাণীই শুধু নয় দ্বন্দ্ব সমূহও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে কিছু লেখা কিম্বা কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। একদিকে নিছক স্তোকবাক্যে তাঁর সৃষ্টিশীলতায় অবমাননা এবং অপর দিকে অপরিণত সমালোচনা দ্বারা তাঁর মূল্য উপলব্ধির অক্ষমতা—প্রতিপদে এই দুই রকম ভুলেরই সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :

রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন ভাববাদী সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়। গীতালি, মহুয়া এবং পূরবীতে পাই ভাববাদী চিন্তাধারার চরমোৎকর্ষ, বাস্তবধর্মবর্জিত নিষ্কর্ষিত প্রেমের গীতিকাব্য। ভাববাদী কবিদের মধ্যে এমন একটি সুর থাকে যা মানুষকে বাস্তব সংগ্রামে বিমুখ ক'রে তোলে, পলায়নের মনোবৃত্তি যোগায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগ সে জাতের নয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নত করবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়, তা কোন বস্তুবাদী অস্বীকার করে না, বা বস্তুবাদের সঙ্গে সেই আদর্শবাদের কোন বিরোধিতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদের দিক থেকে হলেও সেই আদর্শপরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছেন। বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায় স্পর্শকাতর, তাই 'নৈবেদ্য'র মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আদর্শবাদকে ভাববাদের দৈন্য থেকে মুক্ত করে সুস্থ সামাজিক আদর্শের অনুকূলে রূপায়িত করেছেন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে

আমার নয়," "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা," "যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"—এই সমস্ত ঘোষণাই কবির ভাবাদর্শের বাস্তবানুগত দিক, যা নূতন জাতীয় চরিত্র স্বষ্টির উপাদান। ভাববাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের এবং প্রগতির যে বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। বলাকার মত মহাকাশে বিচরণ করতে করতে মাটির টানে মর্তে নেমে এসেছেন বারংবার, আবার মর্তের পঙ্কিলতায় অতিষ্ঠ হয়ে আকাশে উড়ে গেছেন কতবার। 'ভাববাদ' মানুষকে জীবনসংগ্রামে নির্লিপ্ত ও নৈরাশ্যবাদী করে দেয়, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ-স্বষ্টি গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য সেই অবসাদের সুর থেকে মুক্ত। প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি বাস্তব জগৎ থেকে অবিছিন্ন করে নিয়ে তার নিষ্কর্ষিত রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের মধ্যে জীবনবাদের বিরোধী কোন সুর নেই, যদিও ভাববাদের সঙ্গে জীবন্ত সত্যের বিরোধিতাই চিরন্তন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ভাববাদ যদি জীবন্ত সত্যের বিরোধীই হবে তা হলে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে ভাববাদের আশ্রয় থেকে জীবনের মহাসত্যকেই রূপ দিতে পারলেন, কেমন করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো ভাববাদের উর্ধ্বে উঠে, যে সত্য বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে উজ্জীবিত করা? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে তিনি ছিলেন মহান্ শিল্পী এবং মহান্ শিল্পীর স্বষ্টি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে সত্য তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল এমন একটি সত্যানুসন্ধানী আবেগ যা তাঁকে তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, অতিক্রম করে নিয়ে গেছে তাঁকে সেই ভাববাদী দর্শনের সীমা থেকে—যা রূপকে মনে করে ভাবের ছায়া মাত্র, ভাবকেই মনে করে আসল সত্বা। উপনিষদের প্রতি কবির আস্থা তাঁকে সেই ভাববাদের আকাশে বিচরণ করালেও, শিল্পস্বষ্টির মাধ্যমে কবির অবচেতন মন আবিষ্কার করেছে—"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" বলাবাহুল্য, এই অনুভূতি, ভাবের সঙ্গে এই আত্মীয়তাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনটিকে জীবন্ত সত্যের সংস্পর্শে রেখে দিত। বস্তু-বাদ না হলেও, ঠিক ভাববাদও নয়, এ দর্শন হলো সর্বাস্তিবাদ তথা বৌদ্ধ-বাস্তবতার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি, গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—

সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হতে পারবে।"

—(রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯৪)

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং এই দর্শনই তাঁকে পরিচালনা করেছে শিল্পসৃষ্টির কাজে। তাঁর এই জীবনদর্শনের ভিতরই ভাববাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্ব-ই রাবিন্দ্রিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এই জীবনদর্শন অনুসরণ করেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিক্রম করার সময় নিত্য নব যুগের উপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারাকেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্বসমাকুল এই ভাবধারাই আবার তাঁর সত্যসন্ধানে সমস্যা সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের জটিল রাজপথের মোড়ে মোড়ে। শুধু তত্বের সাহায্যে যখনই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে গেছেন তখনই ভুল করেছেন, ভুল শুধরেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। ভুলের এই সংশোধনই তাঁর মহত্ব।

সামন্তবাদের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনিক সভ্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু ধনিক সভ্যতার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও তাকে প্রপীড়িত করেছে, এ দ্বন্দ্বের সমাধান ছিল তাঁর অজ্ঞাত। সামন্ত-সমাজের কুসংস্কার ও ব্যক্তিপীড়নের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানানুগতা ও ব্যক্তিত্ববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থগৃধ্নুতা ও যন্ত্রসর্বস্বতা ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই সমাজেরও সমস্ত ভড়ং তিনি ধরে ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন মানুষের প্রতি মানুষের নির্যাতন এবং ব্যক্তিমনের নিষ্পেষণ, "মুক্তধারা"র বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন নিষ্ফল আক্রোষে। কিন্তু তিনি সমাধান খুঁজছেন অতীত সমাজের অতীত ব্যবস্থার মধ্যে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ভ্রমণ করে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের নূতন সৃষ্টিশীলতা তাঁর চোখে ধরা পড়ে, কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের। শেষ জীবনে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে কোথায় ছিল ফাঁক, ধরে ফেলেন যে শুধু "এপাড়ায়" ঘুরেছেন "ওপাড়ার" সঙ্গে আত্মীয়তা করা হয়নি। তাই আহ্বান জানালেন নূতন যুগের কবিকে —"যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোগশয্যায় শুয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার জয় কামনা করেছেন। "সভ্যতার সংকটে" ঘোষণা করেছেন নূতন যুগের নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্পর্কে তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা, কারণ "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের সংগ্রাম এবং "আধুনিক" সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত করার কাজে হাত দেন। কাব্যের ভিতর তাঁর জীবন-দর্শনের অধ্যাত্মবাদী দিক মূর্ত হয়ে উঠলেও, উপন্যাসে তিনি অনেক বেশী বাস্তব। 'চোখের বালিতে' বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি-আঁকলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষকে' তা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে গেল। প্রকৃতির-সংগে প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্ট হয় তার ঘূর্ণিপাকে এক মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, সংসারের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যায় চুরমার হয়ে। প্রেমের সংগে বিবাহের যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে, সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে তার সমাধান নেই। সমাজ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু সেই সমাজ ছাড়া নূতন কোন সমাজের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, তাই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খোঁজেন এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেই আদর্শনীতির আশ্রয়ে। অথচ সে আদর্শ মানুষের মত হাওয়ায় ভরা নয়, তার মধ্যে আছে বাংলার সামাজিক জীবনের সম্ভাব্য বাস্তব।

"যোগাযোগে" কবির দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মে পরিচালিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কঠোর বাস্তবে কুমুর আদর্শিকতা ছত্রছান হয়ে গেল, চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলো তার। বিবাহের অধিকার ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যেতে হলো স্বামীর সংসার ছেড়ে, এই হলো তার প্রথম বিদ্রোহ। কিন্তু আবার তাকে যেচে ফিরে আসতে হলো সেই সংসারে অপমানের পসরা মাথায় করে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে সামাজিক নীতিবোধ চিরস্থায়ী নয়, যুগে যুগে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবু বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বার এইযে বিরোধ তার যে কোন সমাধান নেই প্রচলিত সমাজের মধ্যে কবি তা বুঝলেন, কিন্তু নূতন সমাজের ইংগিত এই সমাজেরই গর্ভে যতক্ষণ না জন্মগ্রহণ করে ততক্ষণ কবির কাছে প্রশ্নটি থেকে যায় সমাধানের অসাধ্য। তাই তিনি প্রতিভার খেলা খেলতে বসলেন "শেষের কবিতায়"। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ তার সামঞ্জস্য ঘটালেন এমন এক উচ্চাঙ্গের আদর্শ দিয়ে, যা সুন্দর হলেও অবাস্তব, অথচ শিল্পসৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সামাজিক সমস্যার যে সমাধানটি তিনি দিলেন তা একটি অলীক কল্পনা। এ থেকেই বোঝা যায় যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও বাস্তবকে অতিক্রম করে যেতে পারে না; রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই তার এক অকাট্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার

মহত্ব এই যে তিনি এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নূতনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। উদাত্তস্বরে ঘোষণা করেছেন—

"নব লেখা আসি দর্পভরে……উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, নবীনের রথযাত্রা লাগি।"

সমাজ তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ :

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে ইতিহাসের গতিশীলতা, পুরাতনের গর্ভে নূতনের অভ্যুদয় এবং সমাজ-ব্যবস্থার অনিত্যতা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এই নীতিদ্বারা প্রভাবিত। এই দৃষ্টি ছিল বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজের আত্মবিরোধ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। রোমাঁ রলাঁর ষষ্ঠীতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত রচনায় কবি লিখলেন—

"আমেরিকায় অবস্থান কালে যন্ত্রসংঘসমূহ (organisation) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (Mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল…যে ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্ত লোলুপ ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি ব্যবসায়ের* দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ! নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বিভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার আচরণ ও বংশ গরিমায় ভদ্র।"

—রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

আমেরিকা ঘুরে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে ধরা পড়লেও এর কারণস্বরূপ শ্রেণীগত শোষণ-পদ্ধতির তত্ত্ব তখনও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল; তাই তিনি মনে করেছিলেন যে এর কারণ হ'লো "জড়পৌত্তলিকতার প্রভাব।" কিন্তু এ ভুল তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে। সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ঐ একই যন্ত্রের নূতন ভূমিকা; যন্ত্রের হাতে মানুষ নয়, মানুষের হাতে যন্ত্র। এখানে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে আমেরিকায় "যন্ত্র পৌত্তলিকতার" মূলে আছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণ। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখলেন—

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।...কেবল মাত্র এই কারণেই এদেশে জন-সাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" এর আগে কমিউনিষ্ট মতবাদ বা সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে বসে বলশেভিক মতবাদ সম্পর্কে ধনিকদের কাগজে অনেক অপপ্রচার তিনি পড়েছেন, তাঁর মন তা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু তাঁর মুক্তমন সোভিয়েট রাশিয়ার "ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে লিখেছিলেন—সোভিয়েট রাশিয়ায় না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

সোভিয়েট সমাজের মর্মস্থল লক্ষ্য করে কবি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"

যে মহাকবি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন আরম্ভ করেছিলেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, তিনি যে এই ভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন কুণ্ঠাহীন মনে, তার কারণ তাঁর জীবনদর্শনের মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদই ছিল তাঁর ভাববাদ ও বস্তুবাদের, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের এবং ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রের সমস্ত দ্বন্দ্বের সেতুস্বরূপ। তাই "এপাড়ায়" অবাধে বিচরণ করেও যখনই "ওপাড়ার" সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয় নি একটুও।

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের মহিমাই উপলব্ধি করেননি, আবিষ্কার করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মহাসত্য। তিনি লিখলেন—

"এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কতলোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

"একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যর তাড়নায়। সেদিন সেখানকার

পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিঁকলো না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।"

—রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৯

এই মহাসত্য রবীন্দ্রনাথ যখন উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখনও তাঁর অনেক পিছনে পড়ে। আজও ঐ মহাসত্য স্বীকার করতে তাঁদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী নেতাদেরও সংস্কারে বাধে। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কারমুক্ত করেছিল তাঁর মানবতাবাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ :

এই মানবতাবাদের তাগিদেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়েছেন। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতিচর্চার প্রতি বিমুখ। হিজলী বন্দীশালায় গুলিচালনার প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক জনসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই সভার সভাপতি। রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোভাব এই সভায় নিজেই তিনি ব্যক্ত করে বলেন—

"প্রথমে বলে রাখা ভালো আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।"

—রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫

সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার স্ব-ভাবসিদ্ধ "মনুষ্যত্বের অবমাননা" দ্বারা বারবার কবি-গুরুকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নামিয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। সেদিনকার দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজ-নীতিকে তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, স্বদেশী-মেলার মারফৎ সহুরে রাজনীতি-গুলিকে গ্রাম্য জনতার সংস্পর্শে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী।

তিনি তখন ভাবতেন যে রাষ্ট্রের মালিক যেই হোক না কেন, সমাজের মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি আত্মকর্তৃত্ব। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল গ্রাম্য-সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ; আধুনিক যুগে ধনতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা যে অবাস্তব এবং অসম্ভব, তা তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তবু তাঁর নিজস্ব আদর্শের বাস্তব সুফল হয়েছিল এই যে দেশের মধ্যে জাতি গঠনের জন্য গঠনমূলক কাজের নীতি জাতীয় গণজাগরণের উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। জাতীর গণজাগরণের কোন আভাষ দেখলেই তাঁর মন নেচে উঠতো, বেরিয়ে আসতেন তিনি তাঁর কাব্যসাধনার মন্দির থেকে, রাজনীতির কলরবের মধ্যে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন জাতীয় গণজাগরণের কাজে,—"জাতীয়তা" যাহাতে জনমনের একটি সত্বা হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রচেষ্টার। রাখী-বন্ধনের গান গেয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন নূতন উদ্দীপনা, স্বদেশ-ভক্তির নূতন চেতনা এলো জনমনের গানের মাধ্যমে।

এই স্রোতের জোয়ারে ভেসে এলো বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন এবং সন্ত্রাস বাদী বিপ্লবী দল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দুটোরই বিরোধী। সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে স্বদেশী জবরদস্তিও তিনি পছন্দ করতেন না। ভাববাদ সুলভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জবর-দস্তিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন, কার বিরুদ্ধে কার জবরদস্তি সে প্রশ্ন তুলতেন না।

ভারতের স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে এ তত্ত্ব নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামাননি এবং এ বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল প্রধানতঃ নেতিবাচক। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যেখানেই ফাঁকি দেখেছেন অথবা দেখেছেন বিকৃতি. তারস্বরে তার প্রতিবাদ করেছেন। নব জাতীয়তার শক্তি যাতেই অনুভব করেছেন, তাকে অভিনন্দন জানাতে কখনও দ্বিধা বোধ করেননি। সন্ত্রাসবাদ যে নিস্ফল সে সত্য সহজেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ তা ছিল গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাগ্রত জনতা তার শক্তি প্রয়োগ করবে কি ভাবে—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। তাই ১৯১৯-২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীর আন্দোলন জেগে উঠলো, তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দু-হাত বাড়িয়ে,—যেন তিনি এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি, বিলাতি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনই তাঁর সমর্থন পায়নি। ১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর ৬৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল। দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল।......আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি। এখন শাসন কর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করতে। কেননা তাদের পরশাসন তন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলছে, যে-ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎ সমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।"

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব ও জাতীয় স্বাধীনতার অদম্য আকাঙখা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সম্মিলিত কর্মশক্তিকে তিনি কত বড় স্থান দিতেন তারও আভাষ এতে পাওয়া যায়। জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনী শক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল, যদিও পথের সন্ধান তিনি রাজনীতি নেতাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান, সমাজ-তন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পরিত্যাগ করে ফাসিজ্ ম-এর রাস্তা ধরে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে জেগে ওঠে ফাসিষ্টদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। মানবসভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ প্রগতির শিবিরেই তাঁর নিজস্থান নির্বাচিত করেছিলেন। এদিক থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান। তখন মুসোলিনি তাঁকে দিয়ে ফাসিষ্ট মতবাদের স্বপক্ষে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তত্ত্বের দিক থেকে অবচ্ছিন্ন ভাববাদের সাহায্যে তিনি প্রথমটা ফাসিজ্ ম্ এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই তিনি ইটালির জনসভায় ফাসিষ্টদের সাজানোগোছানো জনসমাবেশ দেখে মুগ্ধ হন, প্রশংসা করেন ইটালির বৈষয়িক উন্নতির। ফাসিষ্ট বর্বরতার স্বরূপ তখনও তাঁর অপরিব্যক্ত ছিল। মহর্ষি রোঁমা রঁলা এ বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দেন। রোঁমা রঁলার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তিনি তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেন এবং ফাসিষ্ট বিরোধী শিবিরকে সমর্থন জানান অকুণ্ঠিত মনে। মানবতাবাদই তাঁকে সাহায্য করে

আধুনিক বিশ্বের এই বৃহত্তম সংকটে সঠিক শিবির নির্বাচনে। ১৯২৬ সালের ২০শে জুলাই এনড্রুজের নিকট লিখিত এক পত্রে মানবতার প্রতি তাঁর স্পর্শকাতর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফাসিজমকে তিনি প্রচণ্ড ধিক্কারে ধিক্কৃত করেন। ইংলণ্ডের ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ানে এ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর থেকে তাঁর সত্যসাধনার অন্যতম লক্ষ্যও হয়ে দাড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, ফাসিজম্ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ।

জাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচি চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের হামলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে নোগুচি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীব্র তিরস্কার। নোগুচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ পত্র প্রগতি-শিবিরের একটি অবিস্মরণীয় দলিল। এমনি তাঁর একখানি দলিল হল, মিস্ র‍্যাথবোনের নিকট লিখিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কারবাণী।

১৯৩০ সাল থেকে কবির মনে জাগছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক অপরাজেয় গণসংগ্রামের স্বপ্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক নির্লিপ্ততা তখন থেকেই কেটে গেছে। তাঁর এই নূতন ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় রাশিয়ার চিঠিতে। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া সফরের শেষে ভারত থেকে চিঠি পান আইন অমান্য আন্দোলন এবং পুলিশী নির্যাতনের। জবাবে তিনি লেখেন—

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে। কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণা দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেই দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো এখনও অনেক বাকি আছে—তার

কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।"

রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৮৫

কবিগুরুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করুন "ঘরে বাইরেতে" তাঁর যে ইংগিত আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিছক সংস্কার পন্থী গঠনমূলক কাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বের। কবি বদলেছেন বিস্ময়কর ভাবে, ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গণবিপ্লবের সঠিক মূর্তি স্বচক্ষে দেখে। বয়স যত বেড়েছে কবির মন ততই তরুণ হয়ে উঠেছে।

মৃত্যু শয্যায় শুয়েও তাই তিনি কামনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েটের জয়। হিটলারের বর্বর অভিযান যে পরাস্ত হবেই এবং সোভিয়েটের জয়ই যে আনবে বিশ্বের কল্যাণ সে কথা তিনি বুঝে গেছেন এবং বলে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্তে। তাঁর আকাঙ্খা আজ মহাসত্যে পরিণত হয়েছে, তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিশ্ব প্রগতির সঙ্গে যে এগিয়ে চলেছিলেন—এই খানেই তাঁর মহত্ব। এই অভিনবত্বের জন্যই তাঁর জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে একটি সমগ্র যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়।